মাসুদ রানা

রত্নদ্বীপ

কুউউ

দুটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলাপিডিএফ এর পরিবেশনা



সেবা প্রকাশনী

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

রত্নদ্বীপ

তেত্রিশ কোটি টাকার হাই কোয়ালিটি
পাকিস্তানী এমারেল্ড নিয়ে উধাও হয়ে গেল
অস্ট্রেলিয়াগামী ফ্রেটার Triton ভারত মহাসাগরে।
দুর্ধর্ষ এক জলদস্যুদলের নিষ্ঠুর চক্রান্তের মধ্যে পড়ে
হাবুডুবু খেল রানা অনেক। তারপর জটিল এক জাল পাতল
সে সাতুলাগির ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি আবর্তে।

কুউউ!

লক্করমার্কা এক ট্রুপ ট্রেন চলেছে পোর্ট হাম্বোল্ডের উদ্দেশে।
ইউ এস ক্যাভালরির কর্নেল রুজভেল্টের নেতৃত্বে।
রিজ সিটিতে জুয়া খেলতে গিয়ে ধরা পড়ল রানা।
হাত বেঁধে ওকেও তোলা হলো সেই ট্রেনে। একঘেয়ে,
ক্লান্তিকর, দীর্ঘ যাত্রা। হঠাৎ করেই ট্রেনে বিচিত্র সব ঘটনা
ঘটতে শুরু করল।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

রত্নদ্বীপ ও কুউউ

সেবা (মাসুদ রানা)

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

রত্নদ্বীপ

কুউউ!

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 7618 4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮
চতুর্থ প্রকাশ ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
RATNODWEEP
COUP
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

ছত্রিশ টাকা

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে * অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন শেষ চাল *বিগব্যাঙ *অপারেশন বসনিয়া।

রত্নদ্বীপ

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৬৮

এক

ধীরে ধীরে দু'হাত মাথার উপর তুলল মাসুদ রানা।

আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলবার জন্যে নয়—রেডিও রূমে ঢুকেই ঠিক চার হাত দূরে সোজা তার বুকের দিকে তাক করে ধরা ল্যুগার পিস্তলটা দেখে। ভয়ে।

রেডিও অপারেটারের টেবিলের উপর রাখা পিস্তল ধরা হাতটা স্থির, নিষ্কম্প। টেবিল ল্যাম্পটা এদিকে ফেরানো, তাই পিস্তল ধরা হাতের কাঁজি পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু লোকটির চেহারা দেখা যাচ্ছে না ভালমত। আবছা একটা ছায়ামূর্তি যেন বসে আছে চেয়ারে, ঠাহর করা যায়। মাথাটা একটু কাত হয়ে আছে একদিকে। নিষ্পলক চোখের সাদা অংশে ম্লান আলোর সামান্য প্রতিফলন।

পিস্তলটার উপর ফিরে এল রানার দৃষ্টি। একচুলও নড়েনি। লোলুপ দৃষ্টিতে রানার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করছে যেন সেটা। নাইন মিলিমিটার ক্যালিবারের হাই ভেলোসিটি স্টীল কেস্‌ড্ বুলেট লোকটির একটি আঙুলের ইশারায় রানার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে যাবে, রেডিও রূমের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ডেক ছাড়িয়ে চলে যাবে আরও দুইশো গজ, তারপর ক্লান্ত অবসন্ন রক্তাক্ত দেহে টুপ করে তলিয়ে যাবে অন্ধকার সমুদ্রের অতলে। এত কাছে থেকে মিস হওয়ার কোন উপায় নেই। কাজেই কোন চালাকি নয়। নিজেকে যতখানি সম্ভব শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোক বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা দরকার।

একটি কথাও বলল না পিস্তলধারী। নড়ল না একচুলও। দু'পাটি দাঁত দেখতে পাচ্ছে রানা এখন। পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে রানার দিকে। অশুভ একটা ছায়া পড়ল রানার মনের উপর। বুঝল, মৃত্যুর ঠিক সামনা সামনি দাঁড়িয়ে আছে সে এখন। রানার পরিচয় নিশ্চয়ই অজানা নেই লোকটির। নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোকই যদি হবে তাহলে রাত্রির অন্ধকারে পানির তলা দিয়ে সাঁতার কেটে এই জাহাজে এসে উঠবে কেন সে? চুপি চুপি চোরের মত রেডিও রূমে এসে ঢুকবেই বা কেন?

অতএব? মৃত্যু? হত্যা করা হবে ওকেও আর দু'জনের মত?

হাসি, পিস্তল, পলকহীন দৃষ্টি, মাথাটা একটু কাত করে রাখার ভঙ্গি—সবটা মিলে কেমন যেন অস্বাভাবিক ও ভয়ঙ্কর একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে অপরিসর এই কেবিনটার মধ্যে। কোথায় যেন একটু ভুল আছে। মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছে রানা। অবাস্তব, ভৌতিক লাগছে ওর কাছে লোকটার নীরব উপস্থিতি।

শিরশির করে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত উঠে এল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাড়ের কাছে।

'কোন ভুল হচ্ছে না তো?' যতটা সম্ভব কোমল কণ্ঠে বলল রানা। সহজ হবার চেষ্টা করছে সে। 'আমি তো আপনার শত্রু না-ও হতে পারি। হয়তো একই দলের প্লেয়ার আমরা, সেম সাইড হতে চলেছে?' কথাগুলো মজার শোনাল না। কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রানার। ঢোক গিলল সে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে একটা টুলের দিকে ইঙ্গিত করে আবার বলল, 'বসতে পারি? আমার বক্তব্য না শুনেই একটা কিছু করে বসা বোধহয় ঠিক হবে না। কথা দিচ্ছি, কোন রকম কৌশলের চেষ্টা করব না। দুই হাত মাথার উপর তুলেই রাখব।'

কোন ফল হলো না এত কথায়। একটুও ম্লান হলো না হাসিটা, দৃষ্টিটা তেমনি স্থির, পিস্তলধরা হাতটা তেমনি অবিচল। একটা অযৌক্তিক রাগের মৃদু উত্তাপ অনুভব করল রানা এবার নিজের ভিতরে। কিন্তু সামলে নিল। ঠোঁটে হাসি টেনে এনে ধীরে ধীরে এগোল সে টুলটার দিকে। পিস্তলধারীর দিকে মুখ করে রয়েছে সে সর্বক্ষণ। হাসতে হাসতে গাল ব্যথা হয়ে গেল ওর। তাড়াতাড়ি এগোতে সাহস হচ্ছে না। পাছে ভুল বুঝে গুলি করে বসে লোকটা। দুই হাত মাথার উপর তুলে রেখে ধীরে ধীরে বসল রানা টুলের উপর। এতক্ষণে আবার শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল আরম্ভ হলো ওর। নিজের অজান্তেই দম বন্ধ করে রেখেছিল সে, প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল পিস্তলের গর্জন।

পিস্তলটা তেমনি স্থির হয়ে রয়েছে। ব্যারেলটা রানার হৃৎপিণ্ডকে অনুসরণ করেনি! ঠিক যেদিকটায় তাক করা ছিল সেদিকেই ধরা আছে শক্ত হাতে।

চিতাবাঘের মত লাফ দিল রানা। খপ্ করে ধরে ফেলল পিস্তল ধরা হাতটা। জুডো হোল্ডে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে পিস্তলটা—কিন্তু পারল না। পাথরের মত শক্ত ঠাণ্ডা হাতটা এঁটে বসে আছে পিস্তলের বাঁটের উপর। মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছিল রানা ঠিকই। অনেক, অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে লোকটা। রিগর মরটিসের দরুন আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরে আছে এমনভাবে পিস্তলটাকে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। কালো পর্দা টেনে ঢেকে দিল কাঁচের জানালা দুটো। তারপর নিঃশব্দে রেডিও রুমের দরজা বন্ধ করে মাথার উপরের উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দিল।

রাশেদ। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের লেফটেন্যান্ট রাশেদ। বাইরে থেকে কোন ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল বের করেও যখন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তখন আঘাতটা নিশ্চয়ই পিছন দিক থেকে এসেছিল। ঠিক। চেয়ারের পিছনে এসেই দেখতে পেল রানা ছুরির হাতল। বেতের চেয়ার ভেদ করে আমূল বিঁধে আছে ছুরিটা রাশেদের পিঠে। ছুরিটা টেনে বের করবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু এল না সেটা। আটকে গেছে কোন হাড়ের গায়ে। দ্বিতীয়বার আর চেষ্টা করল না সে খুব সম্ভব হত্যাকারী

নিজেও অনেক চেষ্টা করেছে ওটা বের করবার জন্যে। না পেরে এই অবস্থাতেই ফেলে রেখে গেছে। এবং সেইজন্যেই আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই গড়িয়ে পড়ে যায়নি লাশটা চেয়ার থেকে, আটকে রয়েছে বসবার ভঙ্গিতে যেমন ছিল তেমনি। চোখদুটো বিস্ফারিত, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে মৃত্যুযন্ত্রণায়।

ডান পায়ের সাথে বাঁধা প্লাস্টিক খাপের মধ্যে থেকে ওর একমাত্র অস্ত্র তিন ইঞ্চি ব্লেডের ছুরিটা বের করে হাতে নিল রানা। রেডিও অপারেটারের কেবিনের বন্ধ দরজার দিকে চাইল একবার। ওর ভিতরে নেই তো কেউ? পকেট থেকে ছোট্ট একটা পেন্সিল টর্চ বের করে বাম হাতে নিল রানা, তারপর ওভারহেড লাইট ও টেবিল ল্যাম্পের সুইচ অফ করে দিল।

দু'মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। পাথরের মূর্তির মত। ধীরে ধীরে অন্ধকারটা সহ্য হয়ে গেল চোখে। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। না, কোথাও কোন অস্পষ্টতম শব্দও হচ্ছে না। আশেপাশে কেউ থাকলে সামান্য নড়াচড়ার শব্দ, কাপড়ের খশ খশ, কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ—কিছু না কিছু বোঝা যেতই। ধীরে ধীরে পাশের কেবিনে ঢুকবার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা বারো ইঞ্চি ফাঁক করতেই আধমিনিট পার হয়ে গেল। আর একটু খুলতে যেতেই দরজার কজায় কড়ড় করে সামান্য শব্দ হলো। ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। কানের পাশে বোম ফুটিয়েছে যেন কেউ এমন জোর মনে হলো শব্দটা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। ধুপ ধাপ, ধুপ ধাপ, হার্টবিট চলেছে বুকের ভিতরে; কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না।

কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ভিতরে যদি কেউ রানার অপেক্ষায় থেকে থাকে তাহলে বড় ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু রানার হাতে অত সময় নেই। আর দেরি করা যায় না। কাত হয়ে বারো ইঞ্চি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ঢুকে এল সে ঘরের মধ্যে। বাম হাতটা যতদূর সম্ভব বাম পাশে লম্বা করে দিয়ে টিপে দিল পেন্সিল টর্চের সুইচ। কারণ, এইভাবে ধরলে কেউ যদি আলো দেখে গুলি করে তাহলে গুলিটা মিস হতে বাধ্য।

কিন্তু কেউ গুলি করল না। কেউ ঝাঁপিয়েও পড়ল না রানার উপর। ঘরের মধ্যে যে লোকটি আছে তারপক্ষে এদুটোর একটিও করা সম্ভব ছিল না। বাঙ্কের উপর এমন বিদঘুটে ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে যে এক সেকেন্ডেই বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। পিঠের দিকটায় এক জায়গায় লাল হয়ে গেছে শার্টটা। টর্চের আলো দ্রুত ঘুরে এল একবার কেবিনের চারপাশে। আর কেউ নেই। মৃতদেহটার মুখ না দেখেও চিনতে পারল ওকে রানা পরিষ্কার। খলিল গযনভি। মাত্র সাতদিন আগে কমোডোর জুলফিকারের বাংলোয় ডিনার খেয়েছে ওরা একসাথে। খলিল, রাশেদ, কমোডোর জুলফিকার এবং রানা।

তীক্ষ্ণ অনুশোচনার ছুরি বিঁধল রানার বুকে। এদের এই অবস্থার জন্যে কে দায়ী? সে নয়? এই সম্পূর্ণ প্ল্যানটা তো তারই তৈরি। সিংহহৃদয় দুঃসাহসী কমোডোর জুলফিকার পর্যন্ত আঁতকে উঠেছিলেন প্ল্যান শুনে, কিন্তু রানার বিচার বুদ্ধির উপর গভীর আস্থা থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয়েছিল তাঁকে।

আমিই হত্যা করেছি এদের! আমারই কথায় বিশ্বাস করে ওরা এতবড় ঝুঁকি; এতবড় বিপদকে পরোয়া করেনি, ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিনা দ্বিধায়। কি ফল হলো? অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারল ওদের মাসুদ রানা? অথচ দিব্বি বেঁচে আছে সে নিজে।

এখন আত্মধিক্কারে কোন লাভ নেই, বুঝল রানা। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকে। ঠিক এমনি নিষ্ঠুর ভাবে কঠোর হাতে নির্মূল করতে হবে শত্রুপক্ষকে। এবং তাই করতে হলে প্রথমে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এখানে ওর করণীয় আর কিছুই নেই। যা জানবার দরকার ছিল জেনেছে সে। জাহাজটা Triton তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন দ্রুত ফিরে যেতে হবে ওর নিজেদের ইয়ট কর্ণফুলীতে।

নিঃশব্দে রেডিও-কেবিনের বাইরের দিকের দরজাটা খুলল রানা। কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করল আবার। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ ভেঙে পড়ছে জাহাজের গায়ে, বাতাসের বেগ একটু বৃদ্ধি পেয়েছে—চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাচ্ছে এখন, জোয়ারের টানে নোঙরের মৃদু ধাতব শব্দ কানে আসছে, বহুদূর থেকে কোন জাহাজের বাঁশীর শব্দ ভেসে এল। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা একত্রীভূত হয়েছে ওর শ্রবণেন্দ্রিয়ে এসে। কই, অস্বাভাবিক কিছুই তো কানে আসছে না। তবে কি এখানে ওর উপস্থিতি টের পায়নি ওরা? কিন্তু তবু নড়ল না রানা। ধীরে ধীরে এই শব্দগুলোকে আর শব্দ মনে হলো না রানার কাছে। আরও কিছু শুনতে চেষ্টা করছে সে। কারও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, কাপড়ের খশ খশ, ডেকের উপর কারও সাবধানী পায়ের শব্দ। নাহ্। যদি কেউ থেকেও থাকে, অতি সাবধানী সে, পাথরের মূর্তির মত নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে সে রানার জন্যে। কিন্তু আর দেরি করা যায় না। নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল রানা ডেকের উপর।

পিছন থেকে এল আক্রমণটা। রানাকে বিন্দুমাত্র সতর্ক হওয়ার সুযোগ না দিয়েই। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী দুটো হাত পিছন থেকে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরল রানার গলা। কোন মানুষের গায়ে যে এত প্রচণ্ড শক্তি থাকতে পারে কল্পনাতেও ছিল না রানার। মুহূর্তের মধ্যে জাহাজটা যেন ভয়ানক রকম দুলে উঠল চোখের সামনে।

আতঙ্কের প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে যেতেই অনেকটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদে পিছন দিকে লাথি চালাল রানা ডান পায়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল এসব কৌশল মুখস্থ আছে আক্রমণকারীর। ডান পায়ের কাফ মাস্‌লের উপর প্রচণ্ড এক লাথি পড়ল। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল রানার মুখ। পা-টা ভেঙে

গেছে বলে মনে হলো না রানার, মনে হলো হাঁটুর নিচ থেকে বাকি পা-টুকু কেউ যেন কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। লোকটার বাম পা ওর বাম পায়ের গোড়ালির কাছে অনুভব করেই প্রাণপণ শক্তিতে মাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। বিদ্যুৎগতিতে সরে গেল পা-টা। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। হাত দুটো আরও চেপে বসছে ওর গলার উপর। কপালের দু'পাশের রগ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোটের নিচে পরা স্কুবা স্যুটের রবারের গলাবন্ধ না থাকলে এতক্ষণে জ্ঞান হারাত সে। দ্রুত করা দরকার কিছু একটা।

চট্ করে দুই হাত গলার কাছে তুলল রানা। হ্যাঁচকা টানে আক্রমণকারীর দুই হাতের কড়ে আঙুল দুটো ভেঙে দেবে বলে। কিন্তু হায়! এই কৌশলটাও জানা আছে লোকটার। দুই হাত মুঠো করে রেখেছে সে। চোখের সামনে লাল, নীল, হলুদ রঙ দুলছে রানার। ভোঁ ভোঁ করছে দুই কান।

ঝট্ করে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল রানা। গলার উপরের বজ্র কঠিন চাপ শিথিল হলো না একটুও। পা দুটো আরও একটু পিছনে সরিয়ে নিল আক্রমণকারী। ও ভেবেছে নিচু হয়ে ওর পা ধরবার চেষ্টা করবে রানা। ওর শরীরের অর্ধেক ভার এখন রানার ঘাড়ের উপর। ভারসাম্য টলটলায়মান।

আচম্বিতে একপাশে ফিরল রানা। দু'জনেরই পিঠ এখন সমুদ্রের দিকে। এবার আক্রমণকারীকে কিছুই বুঝবার সুযোগ না দিয়ে প্রাণপণে ধাক্কা দিল সে পিছন দিকে। এক পা, দুই পা, তিন পা। প্রচণ্ড বেগে ঠেলে নিয়ে এসে ডেকের ধার ঘেরা শিকলের উপর চিৎ করে ফেলল রানা আক্রমণকারীকে।

এই প্রচণ্ড আঘাতে যে কোন লোকের মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ার কথা। কিন্তু অস্পষ্টতম গোঙানিও বের হলো না লোকটার মুখ থেকে। কিন্তু রানার গলা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে শিকল ধরতে বাধ্য হলো সে। নইলে শিকল টপকে একসাথে পানিতে গিয়ে পড়বে দু'জনই। আরেক হাতে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল সে রানাকে।

এক ঝট্কায় হাত ছাড়িয়ে সরে গেল রানা। ঘুরে দাঁড়াল আক্রমণকারীর দিকে মুখ করে। মাথাটা ঘুরছে এখনও, ডান পা-টা ভাঁজ হয়ে যেতে চাইছে সামনের দিকে। কিন্তু তবু একটু আশ্চর্য না হয়ে পারল না সে। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আক্রমণকারী। আবছা দেখা যাচ্ছে ওকে তারার আলোয়। প্রকাণ্ড চেহারার কোন দৈত্য নয়। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে রানারই সমান হবে লোকটা। বরং দুই এক ইঞ্চি কমই হবে। অথচ আশ্চর্য শক্তি ওর গায়ে। ওর হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায়···

ছুরিটা চলে এল রানার ডান হাতে। শুধু ছুরি দিয়ে কাজ হবে না, অপ্রত্যাশিত কিছু করতে হবে। দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথায়।

ধীর স্থির পদক্ষেপে এগোল আক্রমণকারী। রানার পা-দুটোর আক্রমণ বাঁচিয়ে একপাশ থেকে এগোচ্ছে সে ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে। আবার রানার কণ্ঠনালী ধরতে চেষ্টা করবে বোধহয়। বেশ খানিকটা কাছে আসবার

সুযোগ দিল রানা। হাতটা যখন ইঞ্চি দশেকের মধ্যে এসে গেছে ঠিক তখনই ছুরি চালাল সে। চটাশ করে বাড়ি খেল দুটো হাত। ছুরিটা আক্রমণকারীর হাতের তালু ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

মাত্র তিনটে গালিতেই রানার চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে দিল আক্রমণকারী। দ্রুত পিছিয়ে গেল দুই পা। জামায় ঘষল হাতটা, চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করল জখমের পরিমাণ, তারপর পরিষ্কার ইংরেজীতে বলল, 'ছুরিও আছে দেখছি। তা ওটা ফেলে দাও বাছা নইলে পিটিয়ে লাশ করে ফেলব।' রানার মধ্যে ছুরিটা ফেলে দেয়ার কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে গলা উঁচু করে ডাকল, 'ক্যাপ্টেন ইমরান!'

'আরে চুপ চুপ!' ধমকে উঠল চিলের মত তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর গজ বিশেক দূর থেকে। 'চুপ করো, গাধা। ব্যাটা টের পেয়ে গেলেই সাবধান...'

'সাবধান হয়ে আর লাভ নেই, ক্যাপ্টেন। ধরে ফেলেছি। ছুরিটা কেড়ে নিচ্ছি...'

'ধরেছ? গুড্!' খুশি হয়ে উঠল চিল কণ্ঠস্বরটা। 'কিন্তু দেখো, মেরে ফেলো না আবার। এটাকে জ্যান্ত চাই আমি, মিসির।' গলাটা আরেক পর্দা তুলে বলল, 'কায়েস, দাউদ, গ্রান্ট, জলদি! ব্রিজের দিকে এগোও। অয়্যারলেস অফিস!'

হাতের তালু থেকে মুখ দিয়ে রক্ত চুষছিল মিসির। এবার এগিয়ে এল আবার। কিন্তু প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছে রানা এতক্ষণে। এক পা সামনে এগোল সে-ও তারপর হঠাৎ পেন্সিল টর্চটা জেলে ধরল লোকটার চোখের সামনে। এক সেকেন্ড। রানা জানত উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ায় এক সেকেন্ড কিছুই দেখতে পাবে না মিসির। এবং এক সেকেন্ডই যথেষ্ট। প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মারল সে মিসিরের তলপেট লক্ষ্য করে। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল মিসিরের দেহটা, সামনের দিকে ঝুঁকে এল দেহের উপরের অংশ। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের পিছনে পড়ল কারাতের কোপ। ডেড শট খাওয়া ঘুঘুর মত ধুপ করে পড়ল লোকটা ডেকের উপর। জ্ঞান আছে কি নেই দেখবার জন্যে অপেক্ষা করল না রানা। এক্ষুণি এসে পড়বে সবাই।

রেডিও রুমটা ছাড়িয়ে একটা লাইফর‍্যাফট বেয়ে উপরে উঠেই শুয়ে পড়ল রানা ডেকের উপর। স্পষ্ট দেখতে পেল ছুটে আসছে কয়েকজন লোক। দু'জনের হাতে টর্চ। গোপনীয়তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতেই কয়েকটা উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠেছে জাহাজের মধ্যে। উপর দিকে চাইলেই দেখে ফেলবে লোকগুলো। ডেকের সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করল রানার। পরিষ্কার বুঝতে পারল মিডশিপ আর ফোর ডেকের এই আলোর প্লাবন ভেদ করে জাহাজের পেছন দিকটায় পৌঁছোনো প্রায় অসম্ভব।

কমপ্যানিয়ন ওয়ে ধরে রেডিও রুমের সামনে এসে পৌঁছুতেই আঁতকে উঠল ওরা মিসিরের অবস্থা দেখে। নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত কণ্ঠে কিছু আলাপ করছিল, এমন সময় ক্যাপ্টেন ইমরানের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া

গেল।

'চুপ করো তোমরা। কায়েস, টমিগানটা সাথে আছে?'

'আছে, ক্যাপ্টেন।' গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল কায়েস।

'পিছনে চলে যাও। এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা সবাই ফোকাসলে গিয়ে ওখান থেকে পিছনে রওনা হব। তাড়িয়ে নিয়ে আসব ব্যাটাকে তোমার দিকে। সারেন্ডার না করলে পায়ে গুলি করবে। জ্যান্ত চাই!'

'যদি পানিতে লাফিয়ে পড়ে?' জিজ্ঞেস করল কায়েস।

'শেষ করে দেবে।'

কণ্ঠতালু শুকিয়ে এল রানার। বড়জোর একমিনিট সময় আছে হাতে। রেডিও রুমের ছাত থেকে বুকে হেঁটে সরে এল সে খানিকটা। তারপর সাবধানে হুইল হাউসের দিকে এগোল। ফোকাসলের দিক থেকে ক্যাপ্টেন ইমরানের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মনে মনে প্ল্যান ঠিক করে ফেলল রানা। কোন কৌশলে ওদের মনোযোগ জাহাজের বাম দিকে সরিয়ে দিতে পারলে যে রশিটা বেয়ে উঠেছিল সেটা বেয়েই নেমে যেতে পারবে সে জাহাজের ডান দিকে।

হুইল হাউসেই পেয়ে গেল রানা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো। হাত ছয়েক লম্বা একটা রশি, আর বিশ সের আন্দাজ ওজনের হাতলওয়ালা একটা শক্ত কাঠের বাক্স। দড়িটা বেঁধে নিল সে হাতলে। তারপর স্কুবা স্যুটের ওপরে পরা কোট-প্যান্ট খুলে একটা প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে ভরে বেঁধে নিল সেটা কোমরে।

স্কুবা স্যুটের ওপর এই কোট-প্যান্ট পরা দরকার ছিল। নইলে মাতারাম বন্দরের সবার সন্দেহ উৎপাদন হত বিকেলবেলা স্কুবা পরে রাবারের ডিঙিতে করে কাউকে খোলা সমুদ্রের দিকে রওনা হতে দেখলে। এ নিয়ে বলাবলিও করত সবাই। তাছাড়া Triton-এর ডেকেও ধরা পড়ে যেত সে যদি স্কুবা স্যুটের ওপর আর কিছু পরা না থাকত। এখন আর দরকার নেই এই কোট-প্যান্টের। ধরা সে পড়েই গেছে।

সামনের দিকে ঝুঁকে যতটা সম্ভব নিচু হয়ে সাবধানে হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে ব্রিজে চলে এল রানা। বাক্সটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল জাহাজের বামপাশে বাইরের দিকে। তারপর রশির একমাথা ধরে দোলাতে আরম্ভ করল বাক্সটাকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

ক্রমেই দোল বাড়ছে। সার্চ-পার্টির কথাবার্তা কানে আসছে, এসে পড়বে এক্ষুণি। পেছনের দিকে ফেলতে হবে বাক্সটা। শেষ দোলটায় কব্জির সমস্ত জোর প্রয়োগ করল রানা, তারপর রশিটা ছেড়ে দিয়েই লাফিয়ে সরে এল পিছনে।

এমনও তো হতে পারে বাক্সটা পানিতে ডুবল না? কিংবা দড়িটুকু ডোবার আগেই কেউ টর্চ ফেলে দেখে ফেলল? তাহলে? পরিষ্কার বুঝে ফেলবে ওরা

রানার কৌশল। কিন্তু থাক। যা হবার হবে এসব ভেবে এখন লাভ নেই।

ঝপাৎ করে ভারী কিছু পানিতে পড়ার শব্দ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই কায়েসের গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল।

'পানিতে লাফিয়ে পড়েছে, ক্যাপ্টেন! ব্রিজের কাছে, স্টারবোর্ড সাইড। টর্চ লাগবে, টর্চ!'

রানা বুঝল পেছনে যেতে-যেতে আবছামত কিছু দেখতে পেয়েছে হঠাৎ কায়েসের সতর্ক চোখ, পরমুহূর্তেই ঝপাৎ শব্দটা কানে যেতেই যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে। এখন একটা টর্চ হলেই হাতের সুখ মিটিয়ে নেয়া যায়।

ধুপধাপ পা ফেলে দৌড়ে চলে এল সবাই সামনে থেকে ব্রিজের কাছে। রানার পায়ের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন ইমরান।

'দেখা যাচ্ছে?' ক্যাপ্টেনের চিল-চিৎকার কানে এল রানার।

'না, ওঠেনি এখনও।'

'উঠবে এক্ষুণি। দাউদ, দুইজন লোক নিয়ে বোটে চলে যাও, চক্কর দেবে। গ্রান্ট, গ্রেনেডের বাক্স নিয়ে এসো। মিসির, ব্রিজে চলে যাও। সার্চ লাইট!'

আর থাকা যায় না। দ্রুতপায়ে হুইল হাউসের মধ্যে দিয়ে পোর্ট উইং-এ চলে এল রানা, সড়সড় করে নেমে এল একটা সিঁড়ি বেয়ে, তারপর ছুটল সামনের দিকে। সামনেটা নির্জন। সবাই এখন অন্যদিকে ব্যস্ত।

পোর্ট সাইডের নোঙরের শিকল বেয়ে অর্ধেক নামতেই টমিগানের শব্দ এল রানার কানে। নিশ্চয়ই ভেসে উঠেছে বাক্সটা—গুলি চালাচ্ছে কায়েস। ভালই। যতক্ষণ বাক্সটা ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতে পারে ততই মঙ্গল। নেমে এল রানা পানিতে।

Triton-এর রাডার পোস্টের মাথায় বেঁধে রেখে গিয়েছিল রানা ওর অ্যাকুয়ালাঙ ও ফ্লিপার। যথাস্থানেই আছে ওগুলো। ডুব দেয়ার আগেই শুনতে পেল রানা ইঞ্জিনের শব্দ। বোট স্টার্ট দিয়েছে দাউদ। কিন্তু এখন আর চিন্তা নেই। তলিয়ে গেল সে ভারত মহাসাগরে। অনেক পথ যেতে হবে তাকে।

•

আধঘণ্টা পর পৌঁছুল রানা পাহাড়টার কাছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে Triton-কে। সবগুলো বাতি জ্বেলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা সমুদ্রের বুকে।

রাবারের ডিঙিটার রশি খুলে দিয়ে উঠে বসল রানা সেটার উপর। মাইলখানেক দাঁড় বাইতে হবে। তারপর নিশ্চিন্তে আউট বোর্ড ইঞ্জিনটা স্টার্ট দেয়া যাবে। তারপর আরও দশ মাইল গেলে পৌঁছুবে সে লম্বক দ্বীপের মাতারাম বন্দরে নোঙর করা ইয়ট কর্ণফুলীতে।

দুই

'কে? ফিরে এলেন নাকি, স্যার?' চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। অন্ধকারে ঠিক দেখতে পেল না, কিন্তু চিনতে পারল, নেভাল ফোর্সের সাব লেফটেন্যান্ট ওজন আলীর কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ।' জবাব দিল রানা। গলার স্বর লক্ষ্য করে আন্দাজের উপর ছুঁড়ে দিল রশিটা। খপ্ করে উপর থেকে সেটা ধরে ফেলল ওজন আলী।

'ওদিকের খবর কি, স্যার?'

'বলছি। পরে। আগে ডিঙিটা তুলে ফেলতে হবে ওপরে।' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল ডিঙির উপর। ডান পা-টা টনটন করে উঠল ব্যথায়, ভর দেয়া যাচ্ছে না; অনেক কষ্টে উঠে পড়ল সে ডেকের উপর। আবার বলল, 'জলদি হাত লাগাও। অল্পক্ষণের মধ্যেই মেহমান আশা করছি।'

'সেরেছে।' আঁতকে উঠল ওজন আলী। 'তার মানে গুবলেট হয়ে গেছে কোথাও। খবরটা শুনলেই হার্টফেল করবে কমোডোর।'

দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে কালো মেঘ এসে ছেয়ে ফেলেছে আকাশটা বেশ অনেকক্ষণ হলো। বৃষ্টি নেমেছে এখন বড় বড় ফোঁটায়। ডিঙিটা তুলে ফেলল ওরা দু'জন ডেকের উপর। তারপর ধরাধরি করে নিয়ে এল ফোর ডেকে। ইঞ্জিনটা খুলে আলাদা করতে করতে রানা বলল, 'গোটা দুই ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ নিয়ে এসো তো, ওজন আলী, তারপর চটপট নোঙর তুলে ফেলো।'

'আমরা ভাগছি তাহলে?'

'ভাগতে পারলে বেঁচে যেতাম, ওজন আলী। কিন্তু ভাগছি না। নোঙরের সাথে এগুলো বেঁধে আবার নামিয়ে দেব নিচে। সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করতে হবে আমাদের।'

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আন্দাজের উপর ভর করে সব কাজ করতে হচ্ছে। তাই রাবারের ডিঙিটা বাতাস বের করে দিয়ে ভাঁজ করে ইঞ্জিনটা একটা ব্যাগে, আর স্কুবা স্যুট, অ্যাকুয়ালাঙ, ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ি, রিস্টকম্পাস ইত্যাদি খুলে আরেকটা ব্যাগে ভরে অ্যাঙ্কর চেনের সাথে বেঁধে চল্লিশ ফ্যাদম পানির নিচে নামিয়ে দিতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। নিচে নেমে যখন সেলুনে এসে ঢুকল তখন অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে রানার শরীর। পেছন পেছন এল ওজন আলী। দরজা বন্ধ করে প্রথমেই জানালাগুলোতে ভেলভেটের ভারী কার্টেন টেনে দিল সে, তারপর একটা টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল।

'আপনার গলায় দাগ কিসের? লাল হয়ে আছে!' এগিয়ে এল ওজন আলী। গোলগাল সুখী চেহারাটা উদ্বিগ্ন।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছছিল রানা, চট্ করে আয়নার দিকে চেয়ে দেখল

সত্যিই লাল হয়ে আছে গ... া। ডান পা-টাও ঘুরিয়ে দেখে নিল একবার। বলল, 'পেছন থেকে আক্রমণ করেছিল। ভয়ঙ্কর শক্তি লোকটার গায়ে। কাফ মাস্‌লটাও জমিয়ে দিয়েছে লাথি মেরে। ওই বোতল থেকে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢালো তো। তারপর একটু ম্যাসেজ করে দিতে হবে। মেহমানরা এসে খোঁড়াতে দেখলে বুঝে ফেলবে।'

'মেহমান আসবেই আপনি ঠিক জানেন?' ব্র্যান্ডি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল ওজন আলী।

'জানি। আমি তো ভাবছিলাম এখানে পৌঁছেই দেখব ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি যে সাধারণ চোর ছ্যাঁচোড় নই সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি ওদের আছে। দুইয়ে দুইয়ে চার যোগ করে নিয়ে সোজা চলে আসবে ওরা এখানে।'

'অতএব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকা দরকার।'

'উঁহুঁ। আমরা মেরিন বায়োলজিস্ট। মিনিস্ট্রি অভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফিশারিজের নিযুক্ত নিরীহ মেরিন বায়োলজিস্ট। পিস্তল কাকে বলে চিনিই না। আমাদের পিস্তল থাকবে না।'

'তাহলে? ঠেকাব কি করে ওদের?'

'সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে। দশ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ব আমরা।'

রানাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ডান পা-টা দক্ষ হাতে ম্যাসেজ করতে আরম্ভ করল ওজন আলী। বলল, 'ঠিক আছে। আপনি বস্‌, যা বলবেন তাই হবে। কিন্তু কি দেখে এত উত্তেজিত হয়ে ফিরে এসেছেন বুঝতে পারছি না।'

'খবর খুবই খারাপ, ওজন আলী। কমোডোরের কানে গেলে সেই মুহূর্তে তোমার বস্‌গিরি থেকে আমাকে খারিজ করে দেবে। যাক, যা ঘটেছে বলছি। সাউলান দ্বীপে পৌঁছে পাহাড়ের আড়ালে থেকে সন্ধেটা পার করলাম। তারপর দাঁড় বেয়ে চলে গেলাম টিউলিঙ দ্বীপে। ওখানে একটা পাথরের সঙ্গে ডিঙিটা বেঁধে রেখে পানির নিচে দিয়ে গিয়ে উঠলাম Triton-এ। জাহাজটা যে Triton তাতে কোন সন্দেহই নেই। নাম পাল্টে ফেলেছে। ফ্ল্যাগও। সুপারস্ট্রাকচারের রঙও পাল্টে ডীপ অরেঞ্জ করে ফেলেছে। কিন্তু যত যা-ই করুক ওটা Triton-ই।' আরেক ডোজ ব্র্যান্ডি ঢেলে নিল রানা। ম্যাসেজের ফলে বেশ আরাম বোধ করছে সে। 'পুরো জাহাজটায় মোট আট-দশজন লোক আছে। আমার বিশ্বাস সব ক'জনই ইহুদি। অরিজিনাল ক্রু একজনও নেই।'

'একজনও নেই?' চোখ বড় বড় করে চাইল ওজন আলী রানার মুখের দিকে।

'একজনও নেই। জীবিত বা মৃত একজন ক্রুও চোখে পড়েনি আমার। আমি মনে করেছিলাম আমার উপস্থিতি কাক-পক্ষীও টের পায়নি। আবছা অন্ধকারে ওদের একজনের পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম ব্রিজের দিকে। কি যেন

বলল ও আমাকে, আমিও আবছা মত একটা উত্তর আউড়ে চলে গেলাম সামনে। তখন বুঝতে পারিনি, ওরা প্রস্তুত হয়েই ছিল অনাহূত অতিথির জন্যে। আফটার অ্যাকোমোডেশনের কাছে আসতেই একটা কেবিনে টেলিফোনের রিসিভার ওঠাবার শব্দ শুনলাম। কেউ বলছে ফাতনা নড়ছে স্যার, বড় মাছ এসেছে টোপের কাছে। বুঝলাম ধরা পড়তে চলেছি। লুকিয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণ পরেই খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হলো। ওরা যেদিকে যায় আমি তার উল্টোদিকের কেবিনগুলো পরীক্ষা করতে থাকি। সব কটা অফিসারস্ কেবিন দেখেছি। কেউ নেই। কিন্তু বেশির ভাগ ঘরেই ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়ে গেছে। দু'একটা কেবিনে রক্তের দাগও আছে। শেষ পর্যন্ত রেডিও রুমে ঢুকে রাশেদ এবং খলিল গযনভিকে পেলাম।'

'রাশেদ, খলিলকে পেয়েছেন তাহলে, স্যার…' আশার আলো জ্বলে উঠল ওজন আলীর দুই চোখে।

'পেয়েছি, কিন্তু মরা।' বলল রানা। ওজন আলীর উৎসাহী দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে গেল মুহূর্তে। 'ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে ওদের দু'জনকেই। আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল বের করেছিল রাশেদ, কিন্তু আক্রমণটা এসেছিল পেছন দিক থেকে, আকস্মিকভাবে। ভয়ঙ্কর লোক এরা, ওজন আলী। ডেডিকেটেড লোক। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সব করতে পারে।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করল ওজন আলী। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস দাঁড়িয়ে গেছে, স্যার। এক্ষুণি কমোডোরকে জানানো দরকার। Triton-কে যখন খুঁজে পাওয়া গেছে তখন ওঁকে জানিয়ে দিলেই আমাদের ঘাড় থেকে বোঝা নেমে গিয়ে…'

'পাগল হয়েছ? ওরা এসে যদি আমাদের কানে এয়ারফোন লাগানো অবস্থায় পায় তাহলে আমাদের অবস্থা কল্পনা করতে পারো?' বাধা দিয়ে বলল রানা।

'খুন করবে।' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ওজন আলী। 'কিন্তু এত নিশ্চিত হচ্ছেন কেন যে ওরা আসবেই?'

'কারণ আসতে ওদেরকে হবেই। আমাকে খুঁজে বের করে মুখ বন্ধ করতে না পারলে ওদের সমূহ বিপদ।'

'তাহলে এক কাজ করা যাক, আমি পাহারা দিই, আপনি কমোডোরকে কন্ট্যাক্ট করেন, স্যার। খবরটা ওঁকে এক্ষুণি জানানো দরকার।'

'কোন্ খবরটা?'

'Triton-এর খবর।' একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ওজন আলী। 'জাহাজটা যখন স্পট করা গেছে, কমোডোর ইচ্ছে করলেই ইন্দোনেশিয়ান কোন নেভি বোটকে ওটার পিছনে লাগিয়ে দিতে পারবেন। আমরা জানি ঠিক কোন জায়গায় জাহাজটা…'

'জানতাম!' শুধরে দিল রানা। 'আমি জাহাজ থেকে পালিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নোঙর তুলে ফেলা হয়েছে Triton-এর। কাল সকাল হতে হতে

একশো মাইল চলে যেতে পারে খোলা সমুদ্রের যে কোন দিকে।'

'তার মানে হাতে পেয়েও ধরতে পারলাম না?' তেতে উঠল ওজন আলী। 'এয়ার সার্চ...'

'ওয়েদার ফোরকাস্ট শোনোনি? এয়ার সার্চের ব্যবস্থা করতে করতে এত দূরে সরে যাবে ওরা যে বিশ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে খুঁজতে হবে ওদের। তুমুল ঝড়বৃষ্টি আসছে। এর মধ্যে ওদের খুঁজে বের করা এককথায় অসম্ভব। কাজেই শুধু শুধু মাথা খারাপ না করে এসো শুয়ে পড়া যাক।'

ভোর সাড়ে চারটার দিকে এল ওরা। এমন শান্তশিষ্ট ভদ্র ছদ্মবেশে স্বাভাবিকভাবে এল যে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওদের পরিচয় সম্পর্কে রানাও নিশ্চিত হতে পারল না।

দমাদম দরজা পিটছিল ওজন আলী, আর চিৎকার করে ডাকছিল, 'উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, স্যার!'

জেগেই ছিল রানা। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি সে। ঘুমজড়িত বিরক্ত কণ্ঠে ধমক দিল, 'কি চাই? কি হয়েছে, ওজন আলী? ডাকাত পড়েছে, না ভূতের ভয় লাগছে?'

'আর বলবেন না স্যার, পুলিস এসেছে।'

'কি বললে?' চমকে উঠে বসল রানা। 'পুলিস! রাত চারটায় পুলিস? কি চায় শালারা?'

'উনি আমার সঙ্গেই অপেক্ষা করছেন। একটু কষ্ট করে বেরোতে হবে, স্যার।'

এবার তড়াক করে খাট থেকে নেমে পড়ল রানা। বলল, 'সোজা নিজের কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ো, ওজন আলী। আর কোনদিন রাতের বেলায় গাঁজায় দম দিতে পারবে না—এটা অফিশিয়াল অর্ডার। যাও, ভাগো!'

'আল্লার কসম বলছি স্যার, গাঁজা খাইনি। আপনি একটু বাইরে এসেই দেখুন, উনি তো আমার সঙ্গেই রয়েছেন।'

আধ মিনিট গজর গজর করল রানা। তারপর উঠে গিয়ে দরজাটা ফাঁক করল আধ ইঞ্চি। সত্যি সত্যি পুলিস দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল রানার চোখ। বলল, 'কিছু মনে করবেন না সার্জেন্ট, আপনি সেলুনে গিয়ে বসুন, আমি আসছি এক্ষুণি।'

দুই মিনিটের মধ্যেই জামা-কাপড় পরে গলায় একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা কেবিন থেকে। চারজন অপরিচিত লোক বসে আছে সেলুনে—দু'জন পুলিস আর দু'জন কাস্টমস অফিসার। মাঝবয়সী প্রকাণ্ডদেহী পুলিস অফিসারটা উঠে দাঁড়াল রানাকে দেখে। বলল, 'আপনিই কি এই ইয়টের মালিক?'

বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল রানা সার্জেন্টের চোখের দিকে। বলল, 'আশ্চর্য! এই কথা জানবার জন্যে কি রাত সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে তুলেছেন

আমাদের? কি চান আপনারা? ওয়ারেন্ট কোথায় আপনাদের?' বসে পড়ল রানা একটা চেয়ারে। সার্জেন্টও বসল।

বিব্রত, বিনয়ী ভঙ্গিতে কথা বলে উঠল ওজন আলীর পাশে বসা স্মার্ট চেহারার কাস্টমস অফিসার, 'আমরা খুবই দুঃখিত, মিস্টার। কিন্তু ওর কোন দোষ নেই। ব্যাপারটা আসলে কাস্টমসের। এ বেচারাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে এসেছি আমরাই।'

রানা ওকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সোজা পুলিস সার্জেন্টের দিকে চেয়ে বলল, 'কল্পনা করুন, লম্বক দ্বীপের মাতারাম বন্দরের একটা ইয়টে ঘুমিয়ে আছেন আপনি—রাত সাড়ে চারটা। এমন সময় চারজন অপরিচিত লোক ইয়টে উঠে এলে আপনার পক্ষে কি ভাবা স্বাভাবিক?' হাত বাড়াল রানা সামনে। 'আইডেন্টিটি কার্ড দেখি?'

'আইডেন্টিটি কার্ড!' বলে কি লোকটা! অবাক হলো সার্জেন্ট রানার অর্বাচীনসুলভ কথা শুনে। 'আমার আবার আইডেন্টিটি কার্ড কিসের? আমি সার্জেন্ট আহমেদ সুদীরু। মাতারাম পুলিস স্টেশনের চার্জে আছি গত দশ বছর ধরে। যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখুন, সবাই চেনে আমাকে।' সার্জেন্টের আহত কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল দশ বছরে এই প্রথম এমন উদ্ভট প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে সে। মাথা ঝাঁকিয়ে ওজন আলীর অন্য পাশে বসা পুলিসের লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'কনস্টেবল ফজল সুদীরু।'

'আপনার ছেলে নিশ্চয়ই?' রানা আগেই লক্ষ করেছিল এদের চেহারার সাদৃশ্য। 'বেশ। ভাল। আর আপনারা কাস্টমসের লোক। গুড। এখন ঝটপট্ বলে ফেলুন কি চাই আপনাদের। ইয়ট সার্চ করতে চাইবেন মনে হচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছেন।' বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল কাস্টমস অফিসার। 'আশা করি আপনাদের সহযোগিতা পাব। আসলে ব্যাপারটা রুটিন চেক। এখানকার সব কটা ইয়টেই আমরা সার্চ করছি...'

'কেন?'

'সিঙ্গারাজা মিলিটারি ক্যাম্প থেকে দুই হাজার রাইফেল আর প্রচুর গুলিগোলা লুট হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে লঞ্চে করে পাচার করা হয়েছে লুটের মাল। পূর্বদিকে এসেছে ওরা। কাজেই...'

'খুঁজে দেখতে চান আমরাই সেই ডাকাত কিনা?' বলল রানা।

'আমি দুঃখিত।' একটুও দুঃখিত মনে হলো না লোকটাকে। 'সত্যিই আন্তরিক দুঃখিত আমি। এই নিয়ে তেরোটা ইয়ট চেক করেছি আমরা আশেপাশের। রুটিন চেক। বিশেষভাবে আপনাদের সন্দেহ করবার কোন কারণ ঘটেনি।'

এক সেকেন্ডে মনস্থির করে ফেলল রানা। এরা যদি শত্রুপক্ষ হয়ও এদের ঠেকাবার কোন উপায় নেই। সার্চ করতে দেয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

'ঠিক আছে। সার্চ করুন। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকব।'

কাস্টমস অফিসার সার্জেন্ট সুদীরুকে মুখ খুলবার উপক্রম করতে দেখেই

বলে উঠল, 'বেশ তো, থাকবেন আপনি আমাদের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনিই কি এই ইয়টের মালিক?'

ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল রানা। তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'ফ্ল্যাগের দিকে একনজর চাইলেই বুঝতে পারতেন এটা পাকিস্তান সরকারের ইয়ট।' চট করে চাইল সার্জেন্ট সুদীরু কাস্টমস অফিসারের চোখের দিকে। একটু যেন বিব্রত মনে হলো তাকে। 'মিনিস্ট্রি অভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফিশারিজের এটা একটি ফ্লোটিং ল্যাবরেটরি। আমরা দু'জন ম্যারিন বায়োলজিস্ট। জাকার্তা, ঢাকা কিংবা করাচীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই নিঃসন্দেহ হতে পারবেন আপনারা। গত বিশ দিন ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন...'

'তার বোধহয় আর দরকার হবে না। এবার আপনার নামটা বলুন। হাতে সময় নেই, দয়া করে সংক্ষেপে সারুন।'

'মারা।'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কাস্টমস অফিসার ও পুলিস সার্জেন্ট। হেসে ফেলেছিল ওজন আলী। ওরা বুঝল সংক্ষেপ করতে বলায় টিটকারি করেছে রানা। কাস্টমসের লোকটা বলল, 'আপনাদের কাগজপত্র দেখান।'

কাগজপত্র নিয়ে এল ওজন আলী। ওদের নামগুলো জোরেজোরে উচ্চারণ করে পড়ল অফিসার। তারপর সঙ্গের মোটাসোটা কাস্টমস অফিসারের হাতে সেগুলো দিয়ে বলল, 'সোয়েতোনো হুইল হাউসে চলে যাও। ঘর অন্ধকার করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এগুলোর ফটো তুলে নিয়ে এসে এইখানে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে। নিন, চলুন মিস্টার মাসুদ রানা, কাজ শুরু করা যাক।'

সোয়েতোনোর বাচ্চা হুইল হাউসের দিকে এগোচ্ছে দেখে রানা বলল, 'কেন, এখানে ফটো তোলা যায় না?'

'না। অন্ধকার দরকার।' থেমে দাঁড়িয়ে কথাটা বলেই এগিয়ে গেল সোয়েতোনো হুইল হাউসের দিকে।

তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা ইয়টের অর্ধেকটা। কি খুঁজছে বুঝতে পারল না রানা। ইঞ্জিনরুমেই ব্যয় করল ওরা বিশ মিনিট। সার দিয়ে রাখা অনেকগুলো লেড অ্যাসিড ব্যাটারি দৃষ্টি আকর্ষণ করল কাস্টমস অফিসারের। একশো হর্স পাওয়ারের দুই দুইটা ডিজেল, ডিজেল জেনারেটর, রেডিও জেনারেটর, হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার পাম্পস, সেন্ট্রাল হিটিং প্ল্যান্ট, প্রকাণ্ড তেল এবং পানির ট্যাঙ্ক পরীক্ষা শেষ করে ব্যাটারির কথা জিজ্ঞেস করল সে, 'এত ব্যাটারি কেন?'

'এত দেখলেন কোথায়? রাডার, রেডিও, সেন্ট্রাল হিটিং, অটোমেটিক স্টিয়ারিং, উইন্ডগ্লাস, তারপর ডিঙির জন্যে পাওয়ার উইঞ্চ, এই সবের জন্যেই তো ব্যাটারি দরকার। তাছাড়াও নেভিগেশন লাইট ইকো সাউন্ডার...'

'ব্যস ব্যস ব্যস ব্যস!' আর্তনাদ করে উঠল কাস্টমস অফিসার। 'চলুন আগে বাড়া যাক।'

ইয়টের বাকি অংশটুকু দু'মিনিটেই দেখা শেষ হয়ে গেল। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করে চলে গেল ওরা।

'আশ্চর্য!' বলল রানা।

ওজন আলী এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। জিজ্ঞেস করল, 'কি আশ্চর্য, স্যার?'

'ওই কাস্টমস অফিসার দুটোর কথা ভাবছি।'

'কি ভাবছেন, স্যার? তেরোটা ইয়ট সার্চ করার পরেও ওদের কড়া ইস্ত্রির স্যুট দেখে?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র পাট ভাঙা হয়েছে ওদের কাপড়গুলোর।'

'পুলিস সার্জেন্টটাকে কিন্তু আমার নকল মনে হলো না।'

চিন্তান্বিত কণ্ঠে রানা বলল, 'তাই ভাবছি। আমার যদ্দূর বিশ্বাস বোকা বানানো হয়েছে ওকে। আচ্ছা, ওজন আলী, ক্যামেরাটা কোথায় গেল? যাবার সময় দু'জনেরই হাত খালি দেখলাম যেন? ফেলে যায়নি তো ওটা?'

হুইল হাউসের দিকে এগোল ওরা। টেবিলের উপর চামড়ার ব্যাগটা দেখতে পেল ওরা। ব্যাগটা খুলতেই দুটো স্ক্রু ড্রাইভার আর একখানা ছোট সাইজের হাতুড়ি পাওয়া গেল। ক্যামেরা নেই।

এক মিনিটের মধ্যেই R.T.D/D.F. সেটের ফেস প্লেটের স্ক্রু ক'টা খুলে ফেলল ওজন আলী। ঢাকনিটা নামিয়ে রাখল নিচে। ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে পাঁচ সেকেন্ড দেখল সে, তারপর পাঁচ সেকেন্ড রানার চোখের দিকে চেয়ে থেকে ফেস প্লেটটা জায়গা মত বসিয়ে স্ক্রু টাইট দিতে আরম্ভ করল।

জিজ্ঞেস না করেই বুঝতে পারল রানা ট্রান্সমিটার শেষ করে দিয়ে গেছে ওরা।

'তোমার হাতে রক্ত কিসের, ওজন আলী? হাত কেটে ফেলেছ কোথাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না তো!' নিজের রক্ত মাখা হাত দুটো চোখের সামনে তুলে ধরল ওজন আলী। 'আরে! রক্ত এল কোত্থেকে?'

ইউনিফর্ম পরা অ্যাসিস্ট্যান্ট কাস্টমস অফিসারকে মোটা দেখাচ্ছিল, কিন্তু আসলে কাপড়ের তলায় লৌহকঠিন পেশী রয়েছে। গ্লাভস পরে ছিল সে সর্বক্ষণ। এরই হাতের তালু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছিল রানা ছুরি মেরে। মিসির।

সেলুনে ফিরে এল ওরা। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওজন আলীর চেহারা।

'কিন্তু, স্যার, আমাদের খতম করে দিলেই তো সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। অন্তত আপনাকে তো মেরে রেখে যাওয়া উচিত ছিল ওদের।'

'তুমি হলে তাই করতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরা করেনি

তার দুটো কারণ আছে। পুলিসের সামনে এটা করা বুদ্ধিমানের কাজ হত না।'

'কিন্তু পুলিস তো ওরাই এনেছে। কেন?'

'পুলিস হচ্ছে সন্দেহের অতীত। ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস দেখলে আমরা কিছুতেই আক্রমণ করে বসতে সাহস পাব না।'

'সম্ভব। দ্বিতীয় কারণ, স্যার?'

'ওরা মস্তবড় একটা ঝুঁকি নিয়েছে। মিসিরের মুখের উপর টর্চ ধরেছিলাম আমি। ওকে চিনতে পারি কিনা তারও পরীক্ষা হয়ে গেল। আসলে ঠিক জায়গামত লাথি মারার জন্যে আমার চোখ অন্যত্র ব্যস্ত ছিল। চেহারাটা চিনে রাখতে পারিনি।'

স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল ওজন আলীর মুখে। 'ওকে দেখেই আপনার আঁতকে ওঠা উচিত ছিল। তা যখন ওঠেননি তখন আমাদের নিশ্চয়ই হিসেব থেকে বাদ দিয়েছে ব্যাটারা? এখন অন্যান্য ইয়টে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরা নিশ্চিন্ত।'

'ঠিক উল্টো।' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমাদের ওরা ঠিকই চিনেছে। এবার পিস্তলগুলো বের করে ফেলতে পারো ওজন আলী। আবার আসবে ওরা।'

ভীত চকিত দৃষ্টিতে চাইল ওজন আলী রানার মুখের দিকে।

'কিন্তু··· কিন্তু ট্রান্সমিটার ভেঙে রেখে গেল কেন, স্যার? যাতে অয়্যারলেসে কারও সাহায্য চাইতে না পারি? আশপাশের সবক'টা ইয়টের ট্রান্সমিটারগুলোও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'ঠিক বলেছ। আজ সকালে সমস্ত মাতারাম বন্দরে চালু ট্রান্সমিটার থাকবে কেবল একটা। আমাদেরটা।'

'আর এটাকেও নষ্ট করে দেয়ার আগেই সব খবর কমোডোরের কানে পৌঁছুনো উচিত। আপনি এক্ষুণি কন্ট্যাক্ট করুন স্যার, আমি পাহারায় আছি।'

বিশেষভাবে তৈরি ইয়ট কর্ণফুলীর ইঞ্জিনের খাপ দুটো, প্রপেলার শ্যাফ্‌ট দুটো—কিন্তু ইঞ্জিন একটা। চারটে স্ক্রু খুলে ঢাকনি তুলতেই দেখা গেল V H. F. ফ্রীকোয়েন্সির একখানা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার। কানে এয়ার-ফোন লাগিয়ে সেটটা অন করে দিল রানা। আরেকটা সুইচ টিপতেই কল-আপ আরম্ভ হলো। রানার ওয়ালথারটা ওর পকেটে গুঁজে দিয়ে একখানা ল্যুগার নিয়ে চলে গেল ওজন আলী নিঃশব্দ পায়ে।

ওয়ার্নিং লাইট এল। ম্যাজিক আই কন্ট্রোলটা অ্যাডজাস্ট করে নিতেই কমোডোর জুলফিকারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা পরিষ্কার। প্রথমেই কোড ওয়ার্ডে নিজের পরিচয় ও অবস্থান জানিয়ে সংক্ষেপে আজকের ঘটনার রিপোর্ট দিল রানা। কয়েক সেকেন্ড কথা সরল না কমোডোরের মুখে। রানা পরিষ্কার বুঝতে পারল হাঁ হয়ে আছে কমোডোরের মুখ, চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।

'ওটা ট্রাইটন? আর ইউ শিওর?'

'ড্যাম শিওর, স্যার।'

'লোকেশন?'

'ওয়ান এইটিন পয়েন্ট ফোর-ফাইভ—এইট পয়েন্ট টু-ওয়ান।'

'রাশেদ-খলিল চুপ কেন?'

'আর কোনদিনই কথা বলবে না ওরা।'

প্রায় আধ মিনিট চুপ করে থাকলেন কমোডোর। রানা জানে, ওরা দু'জন কতটা প্রিয়পাত্র ছিল ওঁর।

'হ্যালো।'

'লাইনে আছি স্যার, বলুন।'

'ফিরে এসো তুমি, রানা। রাশেদ-খলিল শেষ, জাহাজটা কোথায় গেছে খবর নেই, একটু আগেই বললে চিনে ফেলেছে ওরা তোমাদের। ওজন আলীকে ইয়ট নিয়ে ফিরে আসতে বলো, রানা। তুমি প্লেনে করে সোজা করাচী চলে এসো। দশটার সময় আমার অফিসে আমার সাথে দেখা করবে। আই রিপিট—ফিরে এসো তুমি, রানা।'

'অসম্ভব, স্যার!'

'মানে!' খরখর করে উঠল কমোডোরের গলা।

'মানে এখন আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।'

'কি বলতে চাইছ, রানা?'

'আমি দুঃখিত, স্যার। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। এর শেষ না দেখে আমি এক পা-ও নড়ব না এখান থেকে।'

'জানো, আমি…'

'আপনি ঢাকার সাথে যোগাযোগ করুন, স্যার।'

'সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে, রানা। এখন তোমাদের কিছু একটা ঘটলে আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে, তা জানো?'

'গোলমাল যা হবার হয়েছে, স্যার। আমি যদি ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব গ্রহণ করি…'

'বেশ। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি কিছু করতে না পারো…'

'আটচল্লিশ ঘণ্টা, স্যার। প্লীজ!'

'ঠিক আছে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোন তথ্য যোগাড় করতে না পারো তাহলে সোজা ফেরত চলে আসবে। দুপুরে আর রাতে রিপোর্ট করবে। ওভার।'

ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। কানেকশন কেটে দিয়েছেন কমোডোর জুলফিকার। হেডফোনটা নামিয়ে রাখল রানা।

তিন

ঘুমোতে যাবার আগে Sirrus-এর সবকটা বাতি জ্বালা দেখে কিছুটা আঁচ করেছিল রানা। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই নিঃসন্দেহ হওয়া গেল।

'এই যে কর্ণফুলীওয়ালা। কে আছেন? এই যে শোনেন! (সিদ্ধি খেয়ে ঘুমিয়েছে নাকি ব্যাটারা!) এই যে কর্ণফুলীওয়ালা!' ইয়টের গায়ে দমাদম পেটাচ্ছে আর চিৎকার করছে কে যেন।

অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে মেশিনগানের মত একটানা অবিশ্রাম তিরিশ সেকেন্ড গালিবর্ষণ করল মাসুদ রানা লোকটার উদ্দেশে। তারপর ধীরেসুস্থে জামাকাপড় পরে নিল। স্কার্ফটা পেঁচিয়ে নিল গলায়। এদিকে ইয়ট ভেঙে ফেলবার উপক্রম করেছে লোকটা। মরুক শালা!

বাইরে বেরিয়েই একটু অবাক হলো রানা। পৃথিবীর চেহারাটা পাল্টে গেছে একেবারে। অনেক বেড়েছে বাতাসের বেগ, তেরছা হয়ে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে ডেকের ওপর—পড়েই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে লাফিয়ে উঠছে আধহাত। লম্বক প্রণালীর একফুট উঁচু ঢেউ এখন তিন ফুটে পরিণত হয়েছে।

কর্ণফুলীর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় সাইজের বোট। এক নজরেই চিনতে পারল রানা Sirrus-এর টেন্ডার। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন ঝকঝকে ড্রেস পরা নাবিক। একটু দূরে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল একজন খাটোমত মোটাসোটা লোক, রানাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল।

'যাক, কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেছে তাহলে! আশ্চর্য লোক আপনি, মশাই। ভিজে যে একেবারে চুপসে গেছি!' বিরক্ত কর্কশ কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আপনার ইয়টে একটু আসতে পারি?' অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই রেলিং টপকে চলে এল লোকটা এপারে। রানাকে ঠেলে ঢুকে এল হুইল হাউসে।

বেঁটেখাট হলেও শক্তপোক্ত দেহের বাঁধুনি লোকটার। মুখের চেহারাটা কঠোর। চুলগুলো ক্রু-কাট করা। বয়স পঞ্চাশ কিংবা পঞ্চান্ন। ঘন কালো ভুরুজোড়া কুঁচকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল লোকটা রানাকে।

'দেরির জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার খান। মাঝ রাত্তিরে কাস্টমসের লোক এসে...'

'মিস্টার খান?' আরও কুঁচকে গেল লোকটার ভুরুজোড়া। 'আপনি চেনেন আমাকে?'

'আপনাকে কে না চেনে বলুন?' বলল রানা। 'দেশে স্বনামধন্য কোটিপতি ব্যবসায়ী তো আর টাকায় ষোলোটা করে পাওয়া যায় না। আপনার বহু ছবি পত্রিকায় দেখেছি আমি।'

একটু যেন খুশি হলো Sirrus-এর মালিক ওসমান খান। বলল,

'কাস্টমস? রাতের বেলা? ইয়টে উঠতেই দেয়া উচিত হয়নি। অসহ্য! কিসের জন্যে এসেছিল?'

'চোরাই রাইফেল আছে কিনা দেখতে এসেছিল সিঙ্গারাজা থেকে নাকি...'

'আরে রাখেন, রাখেন। গর্দভ সব! আপনার নামটা কি?'

মিথ্যে কথা এসে গিয়েছিল রানার জিভের ডগায়, সামলে নিয়ে বলল, 'মাসুদ রানা। ম্যারিন বায়োলজিস্ট।'

'বেশ, বেশ। আমারও এই সাবজেক্টে ইন্টারেস্ট আছে। যাক, কাজের কথায় আসি। আমার করাচী শেয়ার মার্কেটের দালালকে একটা খবর দেয়া দরকার এক্ষুণি। নইলে লাখ পাঁচেক টাকা লস হয়ে যাবে। আপনার রেডিও-ট্রান্সমিটারটা একটু ব্যবহার করতে পারি?'

অবাক হয়ে যাবার ভান করল রানা। বলল, 'নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু...কিন্তু, আপনার ট্রান্সমিটার? মানে Sirrus-এর...'

'আমারটা নষ্ট হয়ে গেছে। আউট অভ অর্ডার।' বলেই এগোল ওসমান খান ট্রান্সমিটারের দিকে।

'আপনার কাজ হয়ে গেলেই আমাকে ডাকবেন। আমি ততক্ষণে মুখ হাতটা ধুয়ে নিই। সেলুনে অপেক্ষা করব আমি আপনার জন্যে।' বলে চলে এল রানা হুইল হাউস থেকে। রানা জানে, কাজ হয়ে যাবার অনেক আগেই ডাকাডাকি আরম্ভ হবে আবার। সোজা নিজের কেবিনে এসে বাথরুমে ঢুকল সে। দু'মিনিট পর সেলুনে গিয়ে দেখল বসে আছে ওসমান খান গম্ভীর মুখে।

'আপনার রেডিওটাও নষ্ট হয়ে আছে, মিস্টার মাসুদ রানা।'

অনাবিল হাসি হাসল রানা। বলল, 'ঠিকই আছে। আমাদের ট্রান্সমিটারটা অপারেট করতে একটু কৌশল দরকার। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি...'

'আমি বলছি ওটা নষ্ট।' কর্কশ কণ্ঠে বলল ওসমান খান।

'আশ্চর্য! রীতিমত ভাল দেখলাম...'

'গত রাতে তো? আজকে চলুন না, নিজেই দেখুন একবার চেষ্টা করে।'

চেষ্টা করে দেখল রানা। নীরব। খটাখট সুইচ টিপল। কোন সাড়াশব্দ নেই।

'কারেন্ট পাচ্ছে না বোধহয়?' বলল রানা। 'পাওয়ার লাইনটা আমি চেক করে দেখি।'

'ফেস-প্লেটটা সরিয়ে একবার ভেতরে দেখবেন দয়া করে?'

বিস্মিত হবার ভান করল রানা। অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ ওসমান খানের চোখের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, মিস্টার খান? কি বোঝাতে চাইছেন আপনি?'

'নিজের চোখেই দেখবেন।' গম্ভীর ওসমান খানের কণ্ঠ।

ফেস-প্লেট খুলে ফেলল রানা। ভিতরের দৃশ্য দেখে ঠিক যেমন যেমন মুখভঙ্গি হওয়া দরকার তাই অভিনয় করে দেখাল ওসমান খানকে। তারপর বলল, 'আপনি জানতেন। এরকমই একটা কিছু আশা করেছিলেন আপনি,

মিস্টার খান। আপনি জানলেন কি করে?'

'এখনও বুঝতে পারছেন না কি করে জানলাম?'

'ওহ্। বুঝেছি। আপনার ট্রান্সমিটারের নিশ্চয়ই ঠিক এই একই অবস্থা হয়েছে? আপনার ইয়টেও গিয়েছিল কাস্টমস অফিসার?'

'কেবল আমারটায় নয়, pioneer-এও গিয়েছিল ওরা। ওখান থেকেই আসছি আমি।'

'আশ্চর্য! কিন্তু কেন? পাগল নাকি লোকগুলো?'

'পাগল? সেয়ানা পাগল। আমি জানি—আমার প্রথম স্ত্রী…' হঠাৎ থেমে মাথা ঝাঁকাল ওসমান খান, তারপর এই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলল, 'মাথা খারাপ লোক হলে অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক, উদ্দেশ্যহীন, আবোল-তাবোল কাজ করবে, কিন্তু এদের কাজটা আর যাই হোক, উদ্দেশ্যহীন নয়। রীতিমত প্ল্যান করা এদের কার্যকলাপ। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম আমাকে কমিউনিকেট করা থেকে কেউ বিরত রাখতে চায়। কিন্তু যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে, এভাবে কারও পক্ষে আমার কোন ক্ষতি করা সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।'

'আপনি না বললেন, পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে যদি…'

'বানিয়ে বলেছিলাম।' বাধা দিয়ে বলল ওসমান খান। 'আপনাদের ট্রান্সমিটারটা আসলে দেখতে এসেছি আমি। নাহ্। যতই ভাবছি ততই বুঝতে পারছি আমি ওদের টার্গেট নই। এই মাতারাম বন্দরে X চাইছে কারও সঙ্গে অয়্যারলেসে যোগাযোগ রক্ষা করতে, এবং Y চাইছে X যেন সেটা করতে না পারে। কাজেই Y এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিরাট কিছু ঘটতে চলেছে এই সেলাত লম্বকে, মিস্টার মাসুদ রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি। ইচ্ছে করলে লিখে রাখতে পারেন কথাটা, দেখবেন ফলে যাবে।'

'পুলিসে জানিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যাচ্ছি। আহমেদের কাছেই যাচ্ছি আমি এখন।'

'আহমেদ?'

'হ্যাঁ। আহমেদ সুদীরু। মাতারাম থানার ও. সি.।'

'সে-ও তো এসেছিল কাস্টমসের লোকগুলোর সাথে।'

'কে, আহমেদ? চেহারার বর্ণনা দিন তো?' অবাক হলো ওসমান খান। রানা চেহারার বর্ণনা দিতেই মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিক। আহমেদ সুদীরুই। কিন্তু অদ্ভুত ঠেকছে ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই ওকে ঠকিয়েছে কেউ। ও এরকম নয়।'

'আপনি চেনেন ওকে?'

'খুব ভাল করে চিনি। আমি গত তিন বছরে বার দশেক এসেছি এই ইয়ট নিয়ে মাতারাম বন্দরে। প্রতিবারই বিশ পঁচিশ দিন করে থেকে গেছি। স্থানীয় অনেক লোকের সঙ্গেই পরিচয় আছে আমার। একা ছিল সে?'

'ওর ছেলে ছিল সঙ্গে। কনস্টেবল। দুঃখ ভারাক্রান্ত চেহারা।'

'বুঝেছি। ফজল সুদীরু। ওর দুঃখের কারণ আছে। মাস কয়েক আগে ওর ছোট যমজ দুই ভাই মারা গেছে নৌকাডুবিতে। মাছ ধরতে বেরিয়েছিল, আর ফেরেনি। ষোলো বছর বয়স। খুব করুণ ব্যাপার। বুড়োর প্রাণ বড় শক্ত—ওকে দেখলে বোঝাই যায় না। আমি ওদের দু'জনকেই চিনতাম, খুব বিনয়ী ছেলে ছিল।' যেন অনেকটা আপন মনে বলছিল কথাগুলো ওসমান খান। হঠাৎ সচকিত হয়ে ফিরে এল বাস্তবে। 'নাহ্, চলি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। অনেক রূঢ় ব্যবহার হয়তো করেছি। মাফ করে দেবেন। আপনারা দু'জন আছেন এই ইয়টে বললেন না? আজ রাতে আসুন না আমার ইয়টে, একসাথে ডিনার খাওয়া যাক? বোটটা পাঠিয়ে দেব। দু'জনই আসবেন, কেমন?' সম্মতি বা উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই চলে গেল ধনকুবের ওসমান খান। যে যত বড়ই হোক ওসমান খানের নিমন্ত্রণ কেউ অস্বীকার করতে পারে না—ভাল করেই জানা আছে তার।

'বুঝতে পেরেছি।' রানাকে দেখেই কথা বলে উঠল আহমেদ সুদীরু। 'আপনিও এসেছেন ভাঙা ট্রান্সমিটার সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে। ওসমান সাহেব এসেছিলেন আধঘন্টা আগে, Pioneer-এর ক্যাপ্টেন এইমাত্র গেলেন। প্রচুর কথা শুনিয়ে গেছেন ওঁরা। বলুন, আপনার কথাও শুনতে হবে।'

'আমি অল্পকথার মানুষ, সার্জেন্ট।' বলল রানা। 'কিন্তু সেই কাস্টমস অফিসারদের পেলে কেবল মুখের কথায় ছাড়তাম না। কোথায় গেছে ওরা?'

'আমাদের বাপ-বেটাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, কেন এই কাণ্ডটা করতে গেল ওরা বুঝতে পারছি না কিছুতেই।'

'আমিও না।' বলল রানা।

'যাক, এখন কি করতে বলেন? কর্ণফুলীতে যেতে পারি আমি, নোটবই ভর্তি করে ফেলতে পারি রিপোর্ট লিখে। তাতে কি লাভ হবে কিছু?'

'আমাদের কোন লাভ হবে না। কিন্তু ওসমান খান যদি এই ব্যাপারটা আরও সিরিয়াসভাবে গ্রহণ করেন তাহলে আপনার ক্ষতি হতে পারে।'

'তার মানে?'

'কোটিপতির খেয়াল খুশির কি কোন নিশ্চয়তা আছে, সার্জেন্ট? ক্ষমতাশালী লোক এই ওসমান খান। তাঁর এক কথায় জাকার্তা থেকে ছুটে আসবে পুলিস বাহিনী। আপনার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে এই লোক ইচ্ছে করলে।'

'কি যে বলেন, মিস্টার!' হাসল পুলিস সার্জেন্ট। 'পারেন, স্বীকার করি, কিন্তু সে ইচ্ছে ওঁর হবে না কখনও। ওঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানান লোকে নানান কথা বলে থাকে, কিন্তু তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না। ওঁর মত দয়ালু আর পরোপকারী মানুষ খুব কমই আছে। মাতারামে ওঁর বিরুদ্ধে এই ধরনের কথা কেউ বলবে না।'

'ওর বিরুদ্ধে কিছু বলছি না আমি। আপনি বুঝেছেন…'

'ওই দেখুন।' রানার কথায় কান না দিয়ে নিজের কথাই বলে চলল সার্জেন্ট। আঙুল তুলে দেখাল জানালা দিয়ে বাইরে। 'মাতারামের টাউন হল। তৈরি করে দিয়েছেন ওসমান খান। ওই যে স্কুল দেখা যাচ্ছে, ওসমান খান বানিয়ে দিয়েছেন। বহু টাকা খরচ করে বোটইয়ার্ড তৈরি করে দিচ্ছেন উনি মাতারামের বেকার যুবকদের জন্যে। সবগুলোই চ্যারিটি। এ-ছাড়াও বুড়োদের জন্যে ক্লাবঘর...'

'বুঝলাম, অঢেল টাকা ঢেলে উনি আপনাদের কৃতার্থ করে দিয়েছেন। আমাকে একটা নতুন ট্রান্সমিটার কিনে দিলে আমিও কৃতার্থ হয়ে থাকতাম। কিন্তু সেরকম ইচ্ছে ওর আছে বলে মনে হচ্ছে না—আপাতত এর কি ব্যবস্থা করা যায়?'

'আমার বিশেষ কিছুই করবার নেই, মিস্টার মাসুদ রানা। তবে আমি চোখ কান খোলা রাখব। কিছু করতে পারলে খবর পাবেন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এল রানা। থানায় যাবার ইচ্ছে ছিল না ওর। কিন্তু না গেলে অস্বাভাবিক ঠেকত সবার চোখে, তাই গিয়েছিল। কিন্তু আহমেদ সুদীরুর কয়েকটা কথায় নতুন চিন্তার সূত্র পেয়ে গেছে রানা। ভাগ্যিস এসেছিল সে থানায়। সমস্ত ছক পাল্টে গিয়েছে। আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে ব্যাপারগুলোকে।

দুপুরের রিসেপশনটা ভাল হলো না। কিন্তু খবর পাওয়া গেল কয়েকটা।

প্রথমেই কমোডোর জুলফিকার জানালেন, Triton-এর সব ক'জন নাবিককেই পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে শুধু দু'জন সামান্য আহত হয়েছে, বাকি সবাই বহাল তবিয়তেই আছে। এবার পাওয়া গেছে ওদের কোকোজ আয়ল্যান্ডে। আগের দুইবারের মতই একটা নির্জন জায়গায় দু'দিন আটকে রাখা হয়েছিল নাবিকদের, প্রচুর খাবার দাবারেরও ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় রাত পোহাতেই দেখা গেছে গার্ড চারজন উধাও। করাচীর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছে ওরা। এবারও সেই একই উপায়ে জাহাজ আটক করা হয়েছিল। ডুবন্ত নৌকা, পুলিস লঞ্চ, মুমূর্ষু রোগী, সব একই রকম, নতুনের মধ্যে সমুদ্রে তেল ছড়িয়ে দিয়ে দুর্বল ডিসট্রেস সিগন্যাল দেখানোর কৌশলটা যোগ হয়েছে মাত্র। জাহাজে উঠেই পিস্তল বের করেছে মুমূর্ষু রোগীরা, তারপর সব ক'জন নাবিকের চোখ বেঁধে ফেলা হয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আরেকটা নাম না জানা জাহাজ কিংবা ইয়ট এসে ভিড়েছে Triton-এর গায়ে। রাতের বেলা চোখ বাঁধা অবস্থায় তাতে করে নিয়ে এসে কোকোজ দ্বীপে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। চারজন গার্ড পাহারা দিয়েছে দু'দিন, তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে।

রানা ওসমান খানের কথা জানাল। নাম শুনেই চিনতে পারলেন কমোডোর। রাতে ডিনারের দাওয়াতের কথা বলল, ওসমান খান সম্পর্কে আহমেদ সুদীরুর কথাগুলো বলল। তারপর নিজের সন্দেহের কথা বলতেই

আঁতকে উঠলেন কমোডোর জুলফিকার।

'খেপে গেলে নাকি, রানা? ওসমান খানের মত একজন লোক··· ছি, ছি···'

'আমি আমার সন্দেহের কথা বললাম কেবল।'

'আরে রাখো তোমার সন্দেহ। তোমার প্ল্যানমত কাজ করতে গিয়ে আজ আমাদের কি অবস্থা হয়েছে একটু ভেবে দেখো। ট্রাইটন গেছে, রাশেদ-খলিল গেছে, আরও কি যে খোয়াতে যাচ্ছি জানি না। আর তাছাড়া ওসমান আমার বাল্যবন্ধু। ওর বর্তমান স্ত্রীকেও চিনি ভালমত। ইন্দোনেশিয়ান। অ্যাকট্রেস ছিল। আশ্চর্য! তুমি এসব কথা ভাবতে পারলে কি করে? ওসমানের মত একজন লোক ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করবে···অসম্ভব।'

'আপনি ভুল বুঝেছেন, স্যার। তাঁকে তো আমি সন্দেহ করছি না। তেমন কোন কারণ এখনও ঘটেনি।'

'তাই বলো।' যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন কমোডোর। 'তাহলে ডিনার-ফিনারে সময় নষ্ট করা কেন? তোমার আটচল্লিশ ঘণ্টার কয়ঘণ্টা পার হয়ে গেছে খেয়াল আছে?'

'আছে, স্যার। কিন্তু তবু একবার যেতে চাই Sirrus-এ। ভাঙা ট্রান্সমিটার নিজ চোখে দেখতে চাই আমি।'

'কেন?'

'এমনি। খেয়াল।'

'ঠিক আছে।' একটু যেন কঠোর শোনাল কমোডোর জুলফিকারের কণ্ঠস্বর। 'খেয়াল খুশিমত যা ইচ্ছে করে বেড়াও। সময় চেয়েছিলে, কতটা সময় দিয়েছি খেয়াল রেখো। রাখি তাহলে।'

'আরেকটা ব্যাপার আছে, স্যার। ইন্দোনেশিয়ান ইন্টেলিজেন্সব্যুরোর সাহায্যে কয়েকটা খবর জেনে দিতে হবে, স্যার আমাকে।'

'কি খবর? কি ব্যাপার?'

রানা বুঝিয়ে বলল। হুঁ-হাঁ করলেন কমোডোর। কিন্তু রানা যখন বলল খবরটা আজই বিকেল ছ'টার সময় চাই, তখন খেপে উঠলেন তিনি।

'পাগল হয়েছ তুমি, রানা? পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের হেড অফিস জাকার্তায়, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর হেড অফিস জাকার্তায়, যে সব নিউজপেপারের কাটিং রেফারেন্স চাও তার সব ক'টার হেড অফিস জাকার্তায়—এখান থেকে বসে এতসব খবর জানানো সোজা কথা মনে করেছ? কাল পাবে।'

'কাল হলে চলবে না, স্যার। আজই ছ'টার মধ্যে না পেলে আরও কয়েকজন খুন হয়ে যাবে মাতারামের। এরা প্রফেশনাল, এক এক ঘণ্টা এদের কাছে লাখ টাকা। তাছাড়া আপনি নিজে চেষ্টা করলে ছ'ঘণ্টার মধ্যে এই ইনফরমেশন যোগাড় করতে পারবেন না কেন আমি তো বুঝতে পারছি না, স্যার। পুরো অ্যাসাইনমেন্টটাই আপনার···'

'হয়েছে হয়েছে। পাবে তুমি ইনফরমেশন। কিন্তু এই ব্যাপারে কেন তুমি এত জোর দিচ্ছ, বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা ছাড়ি, ওভার।'

দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুম দিল রানা। আগামী দু'দিনে ঘুমোবার সুযোগ পাবে কিনা কে জানে? সুযোগ যখন পাওয়া গেছে গতরাতের ঘুমটা অন্তত পুষিয়ে নেয়া উচিত। শরীর-মন চাঙা থাকলে বুদ্ধিটাও সতেজ থাকে। ওজন আলী গল্প জমাবার চেষ্টা করেছিল, ভাগিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঠিক পৌনে ছ'টার সময় ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে চলে এল সে ইঞ্জিনরুমে। লক্ষ করল বৃষ্টির বেগ বেড়েছে. সেই সাথে বাতাসও। অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশ সন্ধে হবার আগেই। টেলিস্কোপিক রেডিওমাস্ট ব্যবহার করল রানা; পরিষ্কার করাচী ধরা গেল তার ফলে।

প্রথমেই কংগ্রাচুলেশন দিয়ে শুরু করলেন ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ কমোডোর জুলফিকার।

'ঠিক পথেই চলেছ তুমি, রানা। আশ্চর্য! পোস্ট অফিস সেভিংস বুক ট্রেস করে দেখা গেছে ওদের দু'জনের নামেই দেড় হাজার করে আছে। তুলে নেয়া হয়নি। ইনসিওরেন্সের গত প্রিমিয়ামটাও দেয়া হয়েছে।' উত্তেজনায় গলার স্বর এক পর্দা উঁচু হয়ে গেছে কমোডোরের। 'এবং অদ্ভুত অ্যাক্সিডেন্ট, মৃত্যু আর নিখোঁজ সম্পর্কে পত্রিকার যে খবর চেয়েছিলে সে ব্যাপারে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে গেছে। আশ্চর্য কয়েকটা খবর জানা গেছে তার ফলে। এ বছর সেলাতে লম্বকের কাছাকাছি পরপর তিনটে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। গত ৭ এপ্রিল তালিওয়াঙ থেকে একটা বড় সাইজের সামুদ্রিক জেলে বোট দশজন স্থানীয় লোক নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। মাছ ধরে বিকেল নাগাদ ফেরার কথা ছিল সেটার—আজ পর্যন্ত কোন্ খবর নেই। জেলেদেরও খুঁজে পাওয়া যায়নি কোথাও…'

'আবহাওয়া কি রকম ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি এই কথা জিজ্ঞেস করবে, আমি জানতাম। মিটিয়রলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে জানা গেছে আকাশ ছিল পরিষ্কার, সমুদ্র ছিল শান্ত, বাতাস ফোর্স ওয়ান। অর্থাৎ এককথায় চমৎকার আবহাওয়া।' একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন কমোডোর। 'যাক, মে মাসের ১২ তারিখে একটা ইয়ট খোয়া গিয়েছিল রিন্দজানি থেকে। দিন পনেরো পরে হঠাৎ ভাঙাচোরা অবস্থায় পাওয়া গেল ওটাকে লেতি দ্বীপের কাছে। একজন ক্রুকেও জীবিত বা মৃত পাওয়া যায়নি। এবং তৃতীয় ঘটনা ঘটেছে মাত্র পাঁচ দিন আগে, অর্থাৎ জুনের ফিফ্‌টিন্‌থে। প্রকাণ্ড একটা ফিশিং-বোট—বলস্টার। নোঙর করা ছিল—কে বা কারা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।'

'কোথা থেকে খোয়া গেছে এই ফিশিং বোটটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মাতারাম।'

রানাকে চমকে দেয়ার জন্যে নাটকীয়ভাবে শুধু নামটা উচ্চারণ করলেন

কমোডোর। সত্যিই চমকে উঠল রানা। তাহলে...তাহলে কি সত্যিই...

'তারিখগুলো খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই এর মানে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না তোমাকে, রানা?'

'না স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি!' বলল রানা। '৭ এপ্রিল তালিওয়াঙ থেকে বোটটা হারিয়ে যাওয়ার ঠিক তিনদিন পরই অস্ট্রেলিয়াগামী এস. এস. পিন্টো অদৃশ্য হয়ে যায় ভারত মহাসাগরে। ১২ মে রিন্দজানি থেকে ইয়টটা খোয়া যাওয়ার তিনদিন পরই অস্ট্রেলিয়ার ফ্রী-ম্যান্টল থেকে রওনা হওয়া স্বর্ণবাহী জাহাজ এম-ভি-ইভনিং স্টার অদৃশ্য হয়ে যায় চিরতরে। আর ১৫ জুনে মাতারাম বন্দর থেকে ফিশিং বোট লবস্টার উধাও হওয়ার ঠিক তিন দিনের মধ্যেই গায়েব হয়ে গেছে করাচী থেকে সিডনিগামী ফ্রেটার ট্রাইটন। এতগুলো ঘটনাকে আর যাই হোক দৈব সংযোগ বলা যায় না। দৈবেরও মাত্রা আছে। এই সবগুলোকে কোইন্সিডেন্স বলা যায় না।'

'এখন কি করা যায় বলো তো?' কমোডোরের স্থির বিশ্বাস, একটা কিছু বুদ্ধি বের করে ফেলবেই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এই বুদ্ধিমান ছোকরাটা। এর উপর নিশ্চিন্তে যদি নির্ভর করা না-ই যেত তাহলে তিনি মেজর জেনারেল রাহাত খানের হাতে-পায়ে ধরে একে দিন কতকের জন্যে চেয়ে নিতেন না। অতীতে দুই দুই বার এই বাঙালী যুবকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসম সাহসের পরিচয় পেয়েছেন তিনি।

'ইন্দোনেশিয়ার সবগুলো রেডিও স্টেশন থেকে একটা খবর প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে, স্যার। পারবেন?'

'চেষ্টা করলে হয়তো অসম্ভব নাও হতে পারে। আমার কথা না শুনলেও মেজর জেনারেল রাহাত খানের কথা শুনবে। কিন্তু কি খবর প্রচার করতে চাও?'

'খবরটা হচ্ছে: লম্বক আর সুম্বাওয়া দ্বীপের কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা বিধ্বস্ত ইয়টের ডিসট্রেস সিগন্যাল পাওয়া গেছে। ঠিক লোকেশনটা বোঝা যায়নি। এখন সিগন্যাল বন্ধ—খুব সম্ভব ডুবে গেছে সেটা। সারভাইভারের খোঁজে আগামীকাল সকালে এয়ারসার্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'এরকম একটা মিথ্যা খবর আরেক দেশের রেডিওকে দিয়ে প্রচার করানো সোজা ব্যাপার নয়। তবে বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করলে সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'

'আমি ঘুরেফিরে দেখতে চাই আশেপাশের বেশ খানিকটা এলাকা। কারও যাতে সন্দেহ না জাগে তার জন্যে এই ব্রডকাস্টের দরকার।'

'কর্ণফুলীতে করে ভলান্টারি সার্ভিস দেয়ার ছলে দেখে নিতে চাইছ, এই তো?'

'না, স্যার।' মুচকি হাসল রানা। 'ইয়টে করে খোলা সমুদ্রে যাওয়া এখন অসম্ভব। আবহাওয়া সাংঘাতিক। ফোর্স সেভেন, সেই সাথে বৃষ্টি। তাছাড়া

ইয়টে করে এত বিরাট এলাকা কাভার করা যাবে না। লম্বকের দক্ষিণে সবকটা দ্বীপে যেতে চাই আমি। দরকার হলে পশ্চিমে বালি, পূর্বে সুম্বাওয়া আর উত্তরে বালাবালাঙ্গান এমন কি কাঞ্জিয়ান পর্যন্ত যেতে হতে পারে। কাজেই সাউলান দ্বীপের দক্ষিণে পাহাড়ের ধারে একটা ছোট্ট বিচে কাল ভোর পাঁচটায় অপেক্ষা করব আমি। একটা লঙ-রেঞ্জ হেলিকপ্টার পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে, স্যার।'

'অ্যাঁ!' একেবারে আসমান থেকে পড়লেন কমোডোর। 'কি বললে? হেলিকপ্টার? পাগল হলে নাকি তুমি, রানা? আমাকে যাদুকর মনে করছ নাকি? তিন তুড়ি দিলেই হেলিকপ্টার?'

'তাহলে, স্যার ফিরেই আসি, কি বলেন? কাল ভোরে রওনা হলে বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাব করাচী। ঠিক ছয়টার সময় দেখা করব, স্যার…'

'রাত বারোটায় কন্ট্যাক্ট করো, রানা। আর সুপিরিয়রের সঙ্গে মস্করা না করে আর একটু ভদ্রভাবে কথা বলবার চেষ্টা কোরো। হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা খুব সম্ভব হয়ে যাবে, হলে জানাব রাতে। আল্লাই জানে, যা করছ, বুঝেসুঝে করছ কিনা। ওভার।'

Sirrus-এ ডিনার খেতে গিয়ে নাটক দেখে ফিরল রানা ও ওজন আলী। বিনা পয়সার নাটক। কিন্তু অনেককিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে।

টেণ্ডার পাঠিয়ে দিয়েছিল ওসমান খান। Sirrus-এ গিয়ে দেখা গেল এলাহি কাণ্ড। সেলুনের বিশ বাই ত্রিশ কার্পেটটার দামই ষাট সত্তর হাজার টাকা। কারুকার্যখচিত দামী পারশিয়ান কার্টেন ঝুলছে। প্রত্যেকটি আসবাবপত্রে মালিকের অঢেল টাকা ও মার্জিত রুচির পরিচয়। নরম সোফা, চমৎকার ডিনার। একাই তিন জনের খাবার খেল ওজন আলী। যেন শেষ খানা খেয়ে নিচ্ছে। রানা বুঝল, নেভির সবাই ওকে আদর করে ভোজন আলী ডাকে কেন!

রানারা ছাড়াও আরও দুই একজন অতিথি ছিল। আশেপাশের ইয়টের মালিক ওরা। ছিমছাম ভদ্র আড়ষ্ট পরিবেশ। বেল টিপতেই ইউনিফর্ম পরা বেয়ারা হুইস্কি নিয়ে এল। রানা পরিষ্কার অনুভব করল কোথায় যেন কি একটা গোলমাল আছে।

ওসমান খানের পাশের চেয়ারটায় বসে আছে এমালি খান। ইন্দোনেশিয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিল সে তেষট্টি সালে। তারপর হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছিল অভিনয়। পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে, এখন তিরিশ ছুঁই ছুঁই করছে এমালির বয়স, কিন্তু এখনও তার জন্যে পাগল ইন্দোনেশিয়ার সিনেমা রসিক জনসাধারণ। এতবড় অভিনেত্রীর এমনভাবে নিজেকে অপচয় করার নিন্দা করে এখনও প্রবন্ধ লেখা হয় পত্রিকার সিনেমা কলামে। কিন্তু অবাক হলো রানা ভদ্রমহিলাকে সামনাসামনি দেখে। সুন্দরী নয়। চোখ পড়লেই দশ ক্যারেট ডায়মণ্ডের মত ঝিক্ করে উঠবে এমন

সৌন্দর্য এর মধ্যে নেই। কিন্তু প্রাণ আছে। অদ্ভুত একটা জ্যোতি আছে। মুখটা দেখলেই বোঝা যায়, এই মুখটা যে মনের আয়না সে মন অনেক হেসেছে, অনেক কেঁদেছে, অনেক চিন্তা করেছে, অনেক সহ্য করেছে, অনেক অনেককিছু অনুভব করেছে, উপলব্ধি করেছে। চোখ দুটো যেন হাজার বছরের পুরানো—অনেক দেখেছে এই চোখ, দেখতে দেখতে কালচে হয়ে এসেছে চোখের কোণ। অদ্ভুত সহানুভূতিশীল, ক্ষমাসুন্দর, স্নিগ্ধ, কমনীয় ভাব এর মুখে। জীবন্ত।

'বেচারিকে ইয়টে নিয়ে এসে আমি বড় কষ্ট দিচ্ছি, মিস্টার মাসুদ রানা। গত তিনমাস ধরে মাটির সঙ্গে দেখা নেই। হাঁপিয়ে উঠেছে এমালি।' বলল ওসমান খান হুইস্কির গ্লাসটা উঁচু করে। 'তোমার ধৈর্যের উদ্দেশে, ডার্লিং!' এক ঢোকে অর্ধেক গ্লাস সাবাড় করে দিল ওসমান খান।

'কি যে বলো! আমি তো বেশ আরামেই আছি।' একটু ঝাপসা, কিন্তু অদ্ভুত মিষ্টি এমালির কণ্ঠস্বর। 'শুধু শুধু তুমি আমার জন্যে এত চিন্তা করো।'

ক্রিং ক্রিং করে ওয়ার্নিং বেল বাজল রানার মনের মধ্যে। লক্ষ করো, লক্ষ করো, রানা। কিছু একটা অস্বাভাবিক আড়ষ্টতা আছে এসবের মধ্যে। চোখ-কান খোলা রাখো।

'কেন, ঠিকই তো বলেছি। প্রথম কথা, তোমার মত একজন সুন্দরী যুবতীকে আমার বয়সী বুড়োর পাশে মানায়ই না। মাসুদ রানার সঙ্গে হলে মানাত। বয়, হুইস্কি।' গ্লাস পূর্ণ করে দিল বয় তৎপরতার সঙ্গে। রানা লক্ষ করল আড়ষ্ট হয়ে গেছে এমালির দেহ। 'তার ওপর গত তিনমাস ধরে এই বুড়োর সঙ্গে ইয়টে করে ঘুরে বেড়ানো কি কম ধৈর্যের কথা? কি বলেন মাসুদ রানা, ঠিক বলিনি? আমার মধ্যে আর রস কোথায়?'

'চমৎকার ডিনারের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার খান। আমরা এবার ফিরব। আবহাওয়া যেরকম খারাপ হচ্ছে তাতে আমরা ভয় পাচ্ছি কর্ণফুলী সরে চলে যেতে পারে।' বলল রানা।

'এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন?' হতাশ হলো যেন ওসমান খান। 'কিন্তু না, আপনারা চিন্তিত হচ্ছেন যখন, তখন আপনাদের আটকে রাখা উচিত নয়।' একটা বোতাম টিপল ওসমান খান। দশ সেকেন্ডের মধ্যে ক্যাপ্টেন এসে হাজির হলো একটা দরজা দিয়ে। আগেই পরিচয় হয়েছে ওদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। ইয়টটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছে সে ওদের—চুরমার হয়ে যাওয়া রেডিও ট্রান্সমিটারটাও। 'এই যে, ক্যাপ্টেন। এঁদের দু'জনকে কর্ণফুলীতে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করে দিন এক্ষুণি। আবহাওয়ার অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন এঁরা।'

'ইয়েস, স্যার,' বলল ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু সামান্য দেরি হবে।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে চাইল ওসমান খান।

'সেই পুরানো ট্রাবল।' বলল ক্যাপ্টেন বিনীত ভঙ্গিতে।

'আবার কারবুরেটরে গোলমাল? ইশ্‌শ্‌। আপনার কথা না শুনে পেট্রল

ইঞ্জিন ফিট করে বোকামিই করেছি। যাক, ঠিক হবার সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন। আর একজনকে কর্ণফুলীর ওপর নজর রাখতে বলে দিন—যাতে সরে না যায়।'

আবার হুইস্কি ঢালা হলো গ্লাসে। চার গ্লাস ইতোমধ্যেই শেষ করে দিয়েছে ওসমান খান। নো থ্যাঙ্কস, নো থ্যাঙ্কস, করেও দু'গ্লাস খেতে হয়েছে রানাকে। সাড়ে ন'টার ওয়েদার ফোরকাস্ট শুনবার জন্যে রেডিও খুলল এমালি।

কমোডোর জুলফিকার কথা রেখেছেন। ইয়ট Vectra থেকে ডিসট্রেস সিগন্যাল পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ খবর ঘোষণা করা হলো। এয়ার সার্চের কথাও বলা হলো। মাতারাম বন্দরকে ছয় নম্বর বিপদ সঙ্কেত দেখাতে নির্দেশ দেয়া হলো। এই বিশ্রী ওয়েদারে খোলা সমুদ্রে বেরবার জন্যে অনেক গালাগালি দিল ওসমান খান Vectra-র ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে।

'পাগল,' আবার বলল ওসমান খান। 'কেবল গর্দভ নয়, আস্ত পাগল।'

'কিন্তু পাগলগুলো মারা যাচ্ছে হয়তো এখন।' বলল এমালি। 'হয়তো হাবুডুবু খাচ্ছে, হয়তো সব শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে।' অদ্ভুত শোনাল এমালির কণ্ঠস্বর। করুণা ঝরে পড়ল ওর কথাগুলোয়।

আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল ওসমান খান স্ত্রীর মুখের দিকে। তারপর হাহা করে হেসে উঠল কর্কশ কণ্ঠে। 'আহা! নারী! করুণাময়ী মা! অবশ্য মা হবার সুযোগ হয়নি ওর। কিন্তু কেঁদে উঠেছে একেবারে ওর প্রাণটা। দেখেছেন, মিস্টার মাসুদ রানা? কি অদ্ভুত স্ত্রীলোকের মন! আমার প্রথম স্ত্রী আরও কোমল ছিল। আপনি বিয়ে করেছেন?'

Pioneer-এর মালিক ইন্দোনেশিয়ান ব্যবসায়ী। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কেমন যেন উসখুস করে উঠল লোকটা এই ধরনের কথাবার্তায়।

এক চড়ে ওসমান খানের দাঁত কয়টা খসিয়ে দিতে ইচ্ছে করল রানার। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল সে। বলল, 'না। সে সুযোগ হয়নি।'

'কিন্তু বিয়ের বয়স তো হয়ে গেছে। করেননি কেন?'

সেই পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি করতে হলো রানাকে। 'কেবল আমি চাইলেই তো বিয়ে হতে পারে না, অপর পক্ষকেও চাইতে হবে। এবং ভাইস ভার্সা। আসলে যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

'হুম্।' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল ওসমান খান। বেয়ারাকে ইশারা করতেই আবার পূর্ণ হয়ে গেল গ্লাস। সেটা মাথার উপর তুলে বলল, 'আমার প্রথম স্ত্রীর স্মরণে।' তারপর ঢক্ঢক্ করে শেষ করল পুরো গ্লাস। শেষ করেই ডাকল, 'এমালি!'

'বলো।' একটু যেন আড়ষ্ট আর কঠিন দেখাচ্ছে এমালিকে।

'শোবার ঘর থেকে একটা জিনিস আনতে হবে। বিছানার...'

'স্টুয়ার্ডকে বললেই এনে দেবে।'

'না। এটা ব্যক্তিগত জিনিস। বিছানার পাশে টাঙানো ছবিটা নিয়ে এসো।'

'কি বললে।' ঝট করে সোজা হয়ে বসল এমালি, দুই হাতে আঁকড়ে ধরল চেয়ারের হাতল। কুঁচকে গিয়েছিল ভুরুজোড়া, অনেক কষ্টে স্বাভাবিক করল সেগুলোকে। ওসমান খানের হাসি হাসি মুখটা থমকে গেল, চোখদুটো কঠিন হয়ে উঠল এক সেকেন্ডের জন্যে, দৃষ্টিপথ ঝট করে সরে এল খানিকটা বাঁয়ে। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্যে। সামলে নিল ওসমান খান। সামলে নিয়েছে এমালিও। শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াচ্ছে সে এখন। ঠিক এমন সময় ঘটল ঘটনাটা। হঠাৎ কাঁধ থেকে শাড়িটা খসে পড়ল কোলে। চট করে তুলে দিল সে আবার শাড়িটা কাঁধের উপর। কিন্তু যা দেখবার দেখে নিয়েছে রানা। হাতকাটা ব্লাউজ। ব্লাউজের হাতা ঠিক যেখানটায় শেষ হয়েছে তার দুই ইঞ্চি নিচে গোল হয়ে আছে দুটো লাল দাগ। মারধরের দাগ এটা নয়, রশি দিয়ে বেঁধে রাখার চিহ্ন।

স্টুয়ার্ডকে ডাকার জন্যে একটা বোতাম টিপল ওসমান খান। মৃদুহাসি টেনে এনেছে সে ঠোঁটে। এমালি খান উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, একটি কথাও না বলে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে। হতবুদ্ধি হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল নিমন্ত্রিত ক'জন।

আধ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল এমালি। হাতে একটা ছবির ফ্রেম। গম্ভীর মুখে সেটা ওসমান খানের হাতে দিয়ে নিজের চেয়ারে বসল সে ফ্যাকাসে মুখে। শাড়িটা যাতে আর খসে যেতে না পারে সেজন্যে কোমরে গুঁজে দিয়েছে সে।

'এই আমার স্ত্রী।' উঠে দাঁড়াল ওসমান খান। একটু একটু টলছে সে। এগিয়ে এসে ছবিটা দেখাল সবাইকে। 'আমার প্রথম স্ত্রী। মারিয়া। তিরিশ বছর সংসার করেছি আমরা, মিস্টার মাসুদ রানা। বিবাহিত জীবনের সপক্ষে এই আমার একমাত্র অকাট্য প্রমাণ।'

বোবা হয়ে গেল ঘরের সব ক'জন। এটা কি করে সম্ভব! সামান্যতম ভদ্রতার বালাইও কি নেই লোকটার মধ্যে? সবার সামনে এমালিকে কি চরম অপমান করা হলো বোঝার বুদ্ধিও কি নেই লোকটার? নাকি সে পরোয়া করে না?

সত্যিই বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে যেন ওসমান খানের। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ছবিটার দিকে। টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে ওর দুই চোখ থেকে। একবিন্দু সহানুভূতি পেল না সে কারও কাছ থেকে। কিন্তু একটা ব্যাপার স্পষ্ট অনুভব করতে পারল রানা—অভিনয় নয়, ওসমানের হৃদয় মন্থন করে এসেছে এই অশ্রু। অর্থাৎ বাইরে থেকে যাই মনে হোক না কেন অদ্ভুত নিঃসঙ্গ, করুণ জীবন যাপন করছে লোকটা। প্রথম স্ত্রীই ওর জীবনের একমাত্র আনন্দ ছিল; তাকে ছাড়া আর কাউকে মন দিতে পারেনি, পারবেও না।

কিন্তু কেউ এই বৃদ্ধের দুঃখে দুঃখিত হলো না। গর্বিত ভঙ্গিতে পাথরের

মূর্তির মত বসে থাকা অপমানিত এমালির দিকে একবার চেয়েই উঠে দাঁড়াল অন্য দু'জন অতিথি। রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। কোনমতে দায়সারা গোছের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে শরীরটা তেমন সুবিধার নেই বলে চলে গেল ওরা।

নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে উদাস দৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে বসে রইল ওসমান খান। এমন কি ক্যাপ্টেন এসে যখন রানাদের ডেকে নিয়ে গেল তখনও ধ্যান ভঙ্গ হয়নি তার।

Sirrus-এর টেন্ডার কর্ণফুলীতে পৌঁছে দিল রানাদেরকে। বোটটা বেশ খানিকটা দূরে সরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। ওটা অর্ধেক রাস্তা ফিরে যেতেই সোজা এসে সেলুনে ঢুকল দু'জন।

খবরের কাগজের উপর ময়দা ছিটিয়ে কার্পেটের তলায় রাখা হয়েছিল। চারটে পায়ের ছাপ পাওয়া গেল তার উপর। ডিনারে যাওয়ার আগে যত্নের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ও আফটার কেবিন আর ইঞ্জিনরূমে যে কালো সুতো বেঁধে রাখা হয়েছিল, সব ছেঁড়া।

'দু'জন এসেছিল, স্যার।' বলল ওজন আলী। 'কোন জায়গা আর বাদ রাখেনি, স্যার, সব খুঁজেছে তন্নতন্ন করে।'

'কাজেই আমাদের তন্নতন্ন করে দেখা দরকার ওরা কি খুঁজল।' বলল রানা।

খুঁজল ওরা, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। কেন এসেছিল ওরা বোঝা গেল না কিছুতেই। যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা সিদ্ধ হয়েছে কিনা তাও টের পাওয়া গেল না।

'যাক, অন্তত কেন Sirrus-এ আমাদের ডিনার খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেটা বোঝা গেছে।' বলল রানা।

'জ্বি, স্যার।' মাথা ঝাঁকাল ওজন আলী। 'যাতে এখানকার ময়দান ফাঁকা পাওয়া যায় সেজন্যে সরানো হয়েছিল আমাদের। আর আমরা যখন ফিরে আসতে চাইলাম তখন টেন্ডারের কারবুরেটার খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণও বোঝা গেছে। ওটা তখন এখানে ছিল।'

'ঠিক বলেছ।'

'কিন্তু আরও কোন ব্যাপার আছে, স্যার।'

'কি ব্যাপার, ওজন আলী?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার। কিন্তু এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটা বের করতে না পারলে...'

'তুমি বের করার চেষ্টা করো ওজন আলী, আমি ঘুমোতে যাই। কাল ভোররাতে উঠে রওনা হতে হবে আমাকে। রাত বারোটায় কমোডোরকে কন্ট্যাক্ট করবে। Sirrus-এর প্রত্যেকটা লোকের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বলবে ওঁকে। আর ওসমান খানের প্রথম স্ত্রীর ব্যাপারেও খোঁজ নিতে বলবে। যে ডাক্তার তার চিকিৎসা করেছিল তার ব্যাপারেও। পয়েন্টগুলো লিখে দিচ্ছি

আমি—প্রত্যেকটা পয়েন্ট অত্যন্ত জরুরী।'

একটা প্যাড টেনে নিয়ে খসখস করে কি যেন লিখল রানা। কাগজটা ছিঁড়ে ওজন আলীর হাতে দিয়েই চলে এল সে নিজের কেবিনে।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল ওজন আলী, কিন্তু রানাকে আর পিছু ডাকল না সে। রানারও মনে হয়েছিল কিছু একটা বলতে চাইছে ওজন আলী। বিছানায় শুয়ে ভাবল একবার, ডেকে জিজ্ঞেস করব? তারপর ভাবল, থাক কাল জেনে নিলেই হবে।

চার

ভোর চারটের সময় রওনা হয়ে গেল রানা। এক কাপ চা বানিয়ে এনে ডেকে তুলেছে ওকে ওজন আলী। হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা গেছে জানিয়েছেন কমোডোর জুলফিকার মিড-নাইট কন্ট্যাক্টে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে কর্ণফুলী ছেড়ে চলে গেল রানা রাবারের ডিঙি নিয়ে।

সাউলানে পৌঁছেই ডিঙি ও পাম্প লুকিয়ে রাখল সে একটা পাথরের আড়ালে। তারপর তীর ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল দক্ষিণ দিকে। একে অন্ধকার, তার উপর বৃষ্টি। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজের উপর ওকে যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটতে হচ্ছে। পাঁচ মিনিটেই পাঁচটা আছাড় খেল রানা। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে ওর সর্বশরীর।

কাঁটাঝোপ আর পিচ্ছিল আঠাল মাটি থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে এগোল রানা। দুই মাইল যেতে হবে এইভাবে। ছোটখাট অসংখ্য পাহাড় আছে সাউলানে। প্রতিটা পাহাড় দেখেই মনে হচ্ছে এরপরই সেই ছোট্ট পরিষ্কার জায়গাটা। কিন্তু সেই জায়গা আর আসেই না।

মাইলখানেক চলার পরই জঙ্গলে ঢুকতে হলো রানাকে। তীর ধরে আর যাবার উপায় নেই। সামনে গাছ আছে কিনা বুঝবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া, সড়াৎ করে পিছলে পড়লে বোঝা যাবে জায়গাটা পিচ্ছিল। এত দুঃখেও হাসি পেল রানার। কী জীবন! এক সপ্তাহ আগেও কি সে কল্পনা করতে পেরেছিল যে ইন্দোনেশিয়ার এক দুর্গম অরণ্যসঙ্কুল দ্বীপে চুপচুপে ভেজা অবস্থায় পদে পদে ঠোকর খেয়ে মরতে হবে ওকে সাতদিন পর?

সিলোন থেকে ফিরেছে সে মাত্র সাতদিন আগে। অফিসের সবাই জানত রানা মারা গেছে সিলোনে এক ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনায়। রানা ভেবেছিল হঠাৎ অফিসে হাজির হয়ে চমকে দেবে সবাইকে। পি. সি. আই. চীফকে কেবল জানিয়েছিল যে সে আসছে। মেজর জেনারেল রাহাত খানকে দিয়ে ভয় ছিল না, কিন্তু কপাল খারাপ, খবরটা রিসিভ করেছিল রানার এক ভক্ত বন্ধু আলী ইমদাদ। রানার অনুরোধ সত্ত্বেও সে যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে কল্পনাও করেনি রানা। বোধহয় খুশি আর চাপতে পারেনি ব্যাটা, খবরটা ছড়িয়ে

দিয়েছে অন্যান্য এজেন্টের মধ্যে। এমন বেইজ্জত হবে জানলে আর সেদিন যেতই না সে অফিসে। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালতে বাকি রেখেছিল কেবল ওরা।

প্ল্যান ঠিক করে আটঘাট বেঁধে অপেক্ষা করছিল সব কয়টা শয়তান রানার জন্যে। নিজের কামরায় ঢুকেই রানা দেখল ওর চেয়ারে বসে আছে বদমাশ চূড়ামণি শ্রীমান সোহেল, আর টেবিলের এপাশের চেয়ার কটায় বসে আছে তিন বাঁদর —জাহেদ, সলিল আর নাসের। ধূমায়িত কফির কাপ নামিয়ে রাখছে ওদের সামনে পাজির পা-ঝাড়া নাসরীন রেহানা।

'আমার জন্যে এক কাপ।' বলল রানা হাসি চেপে।

রানা আশা করেছিল ওকে দেখেই হৈ-হৈ করে উঠবে সবাই। ছুটে এসে এক হাতে জড়িয়ে ধরবে সোহেল, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। যার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ছুটে গিয়েছিল ওরা সিলোনে, ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে এসেছিল কান্ডির দুর্ধর্ষ রাদালা (সর্দার) রঘুনাথ জয়ামান্নকে, সেই প্রিয় বন্ধুকে জলজ্যান্ত চোখের সামনে এসে হাজির হতে দেখলে ওদের মনের কি অবস্থা হবে ভাবতেই হাসি পাচ্ছিল রানার। কিন্তু এ কি! ঘাড় ফিরিয়ে নিরুৎসুক দৃষ্টিতে চাইল ওরা রানার মুখের দিকে। খেঁকিয়ে উঠল সোহেল: 'কে আপনি? কি চাই?'

'কেন, চিনতে পারছিস না? আমি রানা!'

চোখে চোখে চেয়ে কি যেন ইঙ্গিত করল ওরা নিজেদের মধ্যে, তারপর হো হো করে হেসে উঠল ঘর ফাটিয়ে। রেহানাও হাসছে। একটু সামলে নিয়ে সোহেল বলল, 'এই নিয়ে ক'জন হলো, জাহেদ?'

'তিনজন।'

'মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। হাসি মিলিয়ে গেছে ওর ঠোঁট থেকে।

'মানে আবার কি? সবাই মাসুদ রানা হতে চায়। আপনার আগে আরও দু'জন এসে গেছে। ভাল মত দুরমুশ করতেই বেরিয়ে পড়েছে আসল পরিচয়। তা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, মিস্টার মাসুদ রানা সাহেব, বসে পড়ুন ওই চেয়ারে।'

'আশ্চর্য। আমাকে চিনতে পারছিস না, সোহেল?'

'সোহেল? আপনি ওনার নাম জানলেন কি করে?' বিস্ফারিত হয়ে গেল সলিলের চোখ। 'এ যে সব শিখে পড়ে এসেছে রে বাবা! কড়া ইস্তিরি দেয়া মাল। চেহারাটাও আবার অনেকটা রানারই মত…'

'সলিল। তুইও চিনতে পারছিস না, দোস্ত?'

'ল্যাও ঠেলা! ল্যাও এখন! আমি বলে ওনার দোস্ত!' এমন আজব চিড়িয়া পেয়ে সদা হাসি-খুশি সলিল সেনের হাসি গিয়ে ঠেকল দুই কান পর্যন্ত।

'কিন্তু তোরা যে যাই বলিস, হামার খানিকটা সন্দো লাগছে, ইয়ার। ই সালা ইন্ডিয়ার মাল।' নাসের মুখ খুলল এবার। 'একদম পালিশ লাগিয়ে

ভেজেছে বানচোতকে···

'তুই চুপ কর, খোট্টার বাচ্চা।' সোহেল থামিয়ে দিল নাসেরকে। 'একজন ভদ্দোর লোক এসেছেন, ভালমন্দ দুটো কথা বলবি, না পয়লাই মুখ ছেড়ে দিলি?' এবার রানার দিকে চাইল সোহেল স্নিগ্ধ হাসি হেসে। 'আপনি তাহলে মাসুদ রানা? বেশ, বেশ। কান্ডির গোরস্থান থেকে উঠে এসেছেন নিশ্চয়ই?'

'আসলে সেই অ্যাক্সিডেন্টে মরিনি আমি···'

'তাহলে কার কবর জিয়ারত করে এলাম আমরা, স্যার? নাসরীনের দেয়া ফুল রেখে এলাম কার মাথার কাছে, বলুন? কার বদলে আমি এই চেয়ার দখল করে বসে আছি? মরিনি বললেই হলো? আলবৎ মরেছেন···'

রানা বুঝল সহজে এদের বোঝানো যাবে না। এখন একমাত্র ভরসা রাহাত খান। চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জাহেদ।

'তুই থাম সোহেল। এই লোক মাসুদ রানা কিনা পরীক্ষা করে দিচ্ছি আমি এক্ষুণি। দেখি প্যান্টটা খুলে ফেলুন তো, স্যার?'

রানার জন্য এক কাপ কফি নিয়ে আসছিল নাসরীন, খুকখুক করে হেসে ফেলায় ছলকে খানিকটা পড়ল নাসেরের পায়ে।

'আউশ্শ! মার ডালা, ইয়ার, মার ডালা!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল নাসের। 'এত হাসিস কেন রে তুই, ছোকরি? মারে ফালাবি? ইশ্শ্?' নিজের পা চেপে ধরল সে মুখ বিকৃত করে।

'খুলে ফেলুন।' আবার বলল জাহেদ একই সুরে।

'কেন!' জিজ্ঞেস করল বিস্মিত রানা।

'আপনার পেছন দিকটা দেখব। আসল মাসুদ রানার একটা তিল আছে ওখানে।' বলল জাহেদ নির্বিকার কণ্ঠে। যেন এতগুলো লোকের সামনে প্যান্ট খুলে পেছন দিক দেখানো একটা সাধারণ স্বাভাবিক কাজ। রানার মধ্যে প্যান্ট খুলবার কোন আগ্রহ দেখতে না পেয়ে আবার বলল, 'খুলে ফেলুন, নইলে সবাই মিলে চেপে ধরে জোর করে খুলব।'

এতক্ষণে ব্যাপার কিছুটা আঁচ করতে পারল রানা। ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'আয়, শালা! কে আমার প্যান্ট খুলবি আয়। কার এত বড় বুকের পাটা দেখতে চাই আমি।'

'আহাহা, চটছেন কেন, সাহেব? ও মন্দ কি বলেছে বলুন···' ফোড়ন কাটতে গিয়েছিল সলিল, হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল। ঘরের প্রত্যেকটি লোক হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল কাঠ-পুতুলের মত।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

'এই যে, রানা, এসে গিয়েছ। ভাল। এদিকে তোমার আসার খবর পেয়েই এরা সবাই হাফ-হলিডের দরখাস্ত দিয়ে বসেছে। রিসেপশন দেবে তোমাকে। গ্র্যান্ট করে দিলাম। যাক, তোমাদের আনন্দে ডিসটার্ব করতে

চাই না—কিন্তু কাল সকালে অফিসে একটু এসো। কমোডোর জুলফিকার খবরের পর খবর দিয়ে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে আমার। মনে করে এসো সকালে।'

রাহাত খান ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই 'তবে রে শালা' বলে ঘুসি পাকিয়ে এগোচ্ছিল রানা, লাফিয়ে এসে পায়ে পড়ল সোহেল।

'মাফ করে দে দোস্। আর কোনদিন করব না। আমাদের আসলে দোষ নেই, সব প্ল্যান ওই পিশাচিনীর।' রেহানার দিকে আঙুল তুলে দেখাল সোহেল।

তিনদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার উপর সলিল, নাসের আর জাহেদ। এক সেকেন্ডে ওদের কাঁধে উঠে গেল রানা!

চিৎকার করে রেহানা বলল, 'থ্রী চিয়ার্স ফর মাসুদ রানা!'

'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।' হুঙ্কার ছাড়ল চারজন।

খুশির চোটে একফোঁটা জল বেরিয়ে গেল রানার চোখ থেকে।

আর আজ? ঠিক সাতদিন পর ভারত মহাসাগরের এক নির্জন দ্বীপের জঙ্গলে জঙ্গলে হোঁচট খেয়ে বেড়াচ্ছে মাসুদ রানা। সড়াৎ করে পিছলে আরেকটা আছাড় খেতেই মুখের হাসি মিলিয়ে গেল রানার। লেগেছে খুব। শুয়ে শুয়েই হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল সে। সেরেছে! নিচে থেকে সিগন্যাল না দেখালে নামবে না ওটা। ধড়মড় করে উঠেই পড়িমরি করে ছুটল রানা আবার। অসংখ্য জায়গায় ছড়ে গেল হাত পা। বেশ খানিকটা পুবে সরে গেছে আওয়াজটা। খুঁজছে রানাকে।

ছুটতে ছুটতেই হঠাৎ পা হড়কে গেল রানার। অসম্ভব ঢালু জায়গাটা। মাটিতে পা ছুঁতেই চায় না। আন্দাজের উপর পা ফেলে ফেলে নেমে এল রানা প্রায় গড়াতে গড়াতে। প্রতি মুহূর্তেই আশা করছিল এক্ষুণি দড়াম করে কোন গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নাক-মুখ থেঁতলে যাবে। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। প্রায় দশগজ মত ঢালু জায়গার পর সমতল ভূমি। দৌড়ের বেগে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ব্রেক কষল রানা। সামনে সমুদ্র। এসে গেছে সে সাউলানের দক্ষিণতম প্রান্তে।

আবার ফিরে আসছে হেলিকপ্টারটা। তিন চারশো ফুট উঁচুতে। জ্বলবে তো? একটাই মাত্র হ্যান্ডফ্লেয়ার এনেছে সে সঙ্গে। পকেট থেকে বের করল রানা প্লাস্টিক ব্যাগে মোড়া ফ্লেয়ারটা। পানির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। জ্বলবে তো?

দপ্ করে জ্বলে উঠল সেটা। চোখ ধাঁধানো নীলচে-সাদা আলো। আধ মিনিট জ্বলেই আবার দপ্ করে নিভে গেল। ফেলে দিল সেটা রানা। মাথার উপর এসে পড়েছে হেলিকপ্টার। জ্বলে উঠল নিচের দিকে মুখ করা দুটো সার্চ লাইট। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে নেমে এল কপ্টার বালুকা বেলায়। রোটর ব্লেড থেমে আসতেই এগিয়ে গেল রানা। ডানদিকের দরজাটা খুলেই একটা টর্চ

জ্বেলে ধরল পাইলট রানার মুখের উপর।

'গুড মর্নিং। আপনি মাসুদ রানা?'

চেহারার দিকে না চেয়েই বুঝল রানা, ইন্দোনেশিয়ান। বলল, 'ইয়েস। গুড মর্নিং। ভিতরে আসতে পারি?'

'আপনি যে মাসুদ রানা, বুঝব কি করে?'

'আমি বলছি, আপনি বিশ্বাস করবেন। এছাড়া আর কোন উপায় নেই আপনার। আমার আইডেন্টিটি চেক করার অধিকার আপনাকে দেয়া হয়নি।'

'কোন প্রমাণ নেই আপনার কাছে? কোন পেপার নেই···'

'আপনার মাথায় কি ঘিলু নেই, এইটুকু মাথায় এল না যে এই দুর্যোগের মধ্যে যে লোক ভোর পাঁচটায় পেপার হাতে নিয়ে নির্জন এক দ্বীপের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে তার কোন পরিচয় থাকতে পারে না—তার কাছে আইডেন্টিটি কার্ড থাকা অমার্জনীয় অপরাধ? আপনাকে কি আমার পরিচয় পত্র চেক করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে?'

'না।' রানার এই রকম কর্কশ উত্তরে গম্ভীর হয়ে গেল অল্পবয়সী পাইলটের মুখ। 'তবে আমাকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। আমার নাম আবদুল্লাহ সুদজিপতো। নিন, উঠে পড়ুন।'

উঠে বসল রানা পাইলটের পাশের সীটে। ঝগড়া দিয়ে পরিচয়ের সূত্রপাত হলেও দু'জনে ভাব হয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না। সিঙ্গারাজার এয়ার সী রেস্‌কিউ পাইলট সুদজিপতো। গত দুই বছর থেকে আছে সে এখানে—প্রত্যেকটা দ্বীপ ওর নখদর্পণে। Vectra-র ডুবন্ত নাবিকদের উদ্ধার করবার নাম নেই, মাসুদ রানা বলে একটা লোককে নিয়ে সারাদিন ঘুরতে হবে শুনেই আসলে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন জানতে পারল যে Vectra বলে কোন ইয়টই নেই, সবটা ব্যাপার সাজানো, তখন রানার উপর থেকে সমস্ত অসন্তোষ দূর হয়ে গেল ওর।

'বলেন কি! ভুয়ো খবর ব্রডকাস্ট করেছে ইন্দোনেশিয়ান রেডিও! কিন্তু কেন?'

'এই সম্পূর্ণ এলাকাটা আমি যেন কারও সন্দেহের উদ্রেক না করেই সার্চ করতে পারি। সেইজন্যে এই বিশেষ নিউজ বুলেটিন প্রচার করা হয়েছে। সবাই জানবে আমরা Vectra-র ডুবন্ত নাবিকদের খুঁজছি, কিন্তু আসলে আমরা খুঁজব অন্য জিনিস।'

'কি জিনিস?'

'আপনি তো এদিককার সবগুলো দ্বীপই চেনেন। আমি এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করতে চাই যেখানে বেশ বড়সড়, মানে, চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট লম্বা কোন বোট লুকিয়ে রাখা যায়। কোন বোটহাউস, কিংবা গাছ গাছড়া দিয়ে ঢাকা কোন খাল, কিংবা বাইরে থেকে দেখা যায় না এরকম গোপন কোন জেটি। প্রথমে আমরা বালি, লম্বক আর সুম্বাওয়ার দক্ষিণে যতগুলো ছোট ছোট দ্বীপ আছে সবগুলো দেখব, তারপর খুঁজব উত্তর দিকে।'

'খেপেছেন নাকি সাহেব? কয়শো দ্বীপ আছে এরকম সে খেয়াল আছে? কয় মাস সময় আছে আপনার হাতে?'

'সময় একটু কম। আজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় আছে হাতে। কিন্তু চিন্তা করবেন না। আমরা অনেক দ্বীপ বাদ দেব। যে সব দ্বীপে ঘন লোক বসতি আছে সেগুলো বাদ। দুই তিনটের বেশি ঘর দেখলেই বাদ দিয়ে দেব। জেলেদের বসতি বাদ দিয়ে যাব আমরা। এমন কি যে সব এলাকায় রেগুলার স্টীমার সার্ভিস আছে, ওসব জায়গাও মাড়াব না আমরা।'

'তাও হপ্তাখানেক লাগবে।' বলল সুদজিপতো।

'লাগবে না। আরও অনেক দ্বীপ ম্যাপ দেখেই খারিজ করে দেব।'

'অলরাইট। ফাস্‌ন্‌ ইওর সীট বেল্ট, প্লীজ। আর এই হেড ফোন লাগিয়ে নিন কানে। নইলে বেজায় শব্দ হয় ভিতরে। কিছু বলতে চাইলে ওই মাউথ পীসে বলবেন।'

বেলা বারোটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে একটা নির্জন দ্বীপে নেমে খেয়ে নিল ওরা। এতক্ষণের মধ্যে এক মিনিটের জন্যেও থামেনি বৃষ্টি। সেই সাথে আছে বাতাস। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল স্পীড। সুদজিপতোর মত এক্সপার্ট পাইলট সঙ্গে না থাকলে এতক্ষণে যে হেলিকপ্টার ক্র্যাশে এন্তেকাল করতে হত সে বিষয়ে রানার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। অন্তত পঞ্চাশ জায়গায় নামতে হয়েছে ওদের। কয়েকখানে হেলিকপ্টার ছেড়ে নেমে যেতে হয়েছে রানাকে জায়গাটা ভালমত পরীক্ষা করার জন্যে। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি।

'এবার আবার লম্বকের দিকে ফিরব আমরা।' ম্যাপের দিকে চোখ রেখে বলল রানা। 'মালাদ্বীপটা দেখতে হবে। তারপর চলে যাব পশ্চিমে। আচ্ছা, এই যে দুটো দ্বীপ দেখা যাচ্ছে এগুলো কি?'

'ও দুটো হচ্ছে রত্নদ্বীপ আর ইয়ালু দ্বীপ। ওখানে পাওয়া যাবে না কিছু। ওই দুটো দ্বীপের মাঝখানের জায়গাটার ভয়ানক দুর্নাম আছে। ডুবো পাহাড় আছে কয়েকটা। ওটাকে বলে—সাতু লাগি। ওখানে কেউ যায় না। দারুণ ঘূর্ণি স্রোত।' বলল সুদজিপতো।

'ঠিক আছে, তাহলে মালাদ্বীপ আর সুরাংদ্বীপ দেখেই চলে যাব আমরা পশ্চিমে।'

আবার শুরু হলো খোঁজা। বোট হাউস আছে এমন প্রত্যেকটা দ্বীপেই নেমেছে ওরা। দুই একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জাকার্তা ইউনিভার্সিটির জুয়োলজির কিছু ছাত্র এসেছে এক্সকারশনে—সেই দ্বীপে নামল না ওরা। বালি শেষ করে জাভারও কয়েকটা দ্বীপ দেখে হঠাৎ প্ল্যান পরিবর্তন করল রানা। বেলা গড়িয়ে গেছে। দিনের আলো আর বেশিক্ষণ থাকবে না। বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হয়, কিন্তু আকাশ জুড়ে কালো মেঘের কমতি নেই। তাড়াতাড়ি সারতে হবে কাজ। ইয়ালু আর রত্নদ্বীপ দেখতে হবে।

কথায় কথায় অনেক খবর জানা গেল সুদজিপতোর কাছ থেকে। অল্পবয়স হলে কি হবে, দু'বছর এই এলাকায় ঘুরে ঘুরে অনেক কিংবদন্তী, অনেক গল্প-কাহিনী সংগ্রহ করেছে সে। মালাদ্বীপের গল্প শুনিয়েছে সে রানাকে ইতোমধ্যেই। কেমন ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে প্রতাপ প্রতিপত্তিশালী একটা জেলে সম্প্রদায় তার করুণ কাহিনী। এখনও দালান কোঠা বাড়ি ঘর সব রয়েছে, কিন্তু সারা দ্বীপে একটি জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই।

'রত্নদ্বীপটা দেখতে কি রকম? গেছেন কখনও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। দু'বার গিয়েছি।' বলল পাইলট। 'বিরাট একটা দুর্গ আছে ওই দ্বীপে। পর্তুগীজ জলদস্যু হুবার্টো তৈরি করেছিল ওই দুর্গ। এখন দ্বীপটা কিনে নিয়ে বসবাস করছে আমাদের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী আবদুল গনি ইলাহুদে। একটা মেয়ে আছে ভদ্রলোকের। অপূর্ব সুন্দরী। নাম ডোডি ইলাহুদে। দু'জনই এখন আধমরা। লোকজন সহ্য করতে পারে না।'

'কেন?' অবাক হয়ে চাইল রানা সুদজিপতোর মুখের দিকে।

'মাস তিনেক হলো প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে আবদুল গনি ইলাহুদের বড় ছেলে আর হবু জামাই। একেবারে মন ভেঙে গেছে বুড়োর। একদম খাঁটি আর সৎ লোক বলে সবাই ভালবাসত এই বুড়োকে। কিন্তু কেমন যেন পাগল পাগল মত হয়ে গেছে লোকটা আজকাল, কারও সঙ্গে মেশে না। মেয়েটারও ওই একই অবস্থা।'

একটা কাকপক্ষীও দেখা গেল না ইয়ালু দ্বীপে। এইসব দ্বীপের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা মাছ ধরা। কিন্তু সাতু লাগির দশ মাইলের মধ্যে মাছ ধরার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। কাজেই ইয়ালু দ্বীপে লোক বসতি গড়ে উঠতে পারেনি কোনদিনই। এবার রত্নদ্বীপের উদ্দেশে চলল ওরা।

পাহাড়ী দ্বীপ। দুর্গটা তৈরি করা হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। ষোড়শ শতাব্দীর শক্তপোক্ত পাহাড়ী দুর্গ। দুর্গের ডান ধারে খানিকটা জায়গায় পাথুরে পাড় ধসে গেছে। সেইখানে অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম করে একটা জেটি তৈরি করা হয়েছে। পাথর দিয়ে আপনা আপনি ব্রেক ওয়াটার তৈরি হয়ে গেছে।

কিন্তু ছোট। বোট হাউসের মুখটা ছয়-সাত গজের বেশি নয়। রানা লক্ষ করল, লম্বায়ও ছয়-সাত গজের বেশি হবে না। শেষ মাথা গিয়ে ঠেকেছে পাথরের গায়ে।

চৌকোনা দুর্গের চারপাশে ঘুরল একবার হেলিকপ্টার, তারপর নেমে এল ধীরে ধীরে। দুর্গের উত্তর দিকে বিশ ফুট চওড়া সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটা সমতল ভূমি চলে গেছে সাগরের তীর পর্যন্ত। দুইশো গজ হবে লম্বায়। সবুজ ঘাসে কয়েকটি বিরাট আকারের ছাগল চরছে। অতিরিক্ত বাতাসের জন্যে ঘাসের উপর নামা গেল না, আর একটু সরে দুর্গের কাছাকাছি নামল হেলিকপ্টার। নেমেই রওনা হলো রানা দুর্গের দিকে। একটা মোড় ঘুরতেই আচমকা ধাক্কা খেল সে একটা মেয়ের সঙ্গে। ডোডি ইলাহুদে। প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছিল সে ওদের দ্বীপে হেলিকপ্টার নামতে দেখে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিস্…মিস্…'

ভদ্রতার খাতিরে নিজের পরিচয় দেয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করল না মেয়েটা। কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ইঞ্জিন ফেইলিওর।'

'না, ঠিক তা নয়…'

'মেকানিকাল ফেইলিওর? না? তাহলে আপনি যেতে পারেন। এক্ষুণি। এটা প্রাইভেট প্রপার্টি।'

মেয়েটার মুখের দিকে চাইল রানা অবাক হয়ে। ফ্যাকাসে একটা মুখ, শুকনো ঠোঁট, চোখের কোণে কালি, চুল উষ্কখুষ্ক। কিন্তু চোখ দুটো উজ্জ্বল। অদ্ভুত এক মলিন সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে ওর মুখে। কিন্তু এত কর্কশ কেন মেয়েটির কথাগুলো?

'কি দেখছেন?' একটু যেন ভয় পেল মেয়েটা। এদিক ওদিক চাইল।

'কিছু না। আপনার বাবা কোথায়?'

'আমি আবদুল গনি ইলাহুদে।' গম্ভীর ভারী কণ্ঠে কেউ কথা বলে উঠল রানার পিছন থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা ওয়াকিং স্টিক হাতে এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়িয়েছে। লম্বা, চিবুকে সামান্য পাকা দাড়ি, মাথায় টাক। বুদ্ধিদীপ্ত সম্ভ্রান্ত চেহারা। 'কি ব্যাপার?'

'আমার নাম আবদুল্লাহ্ সুদজিপতো।' বলল রানা। 'এয়ার সী রেসকিউ সার্ভিস থেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে। Vectra বলে একটা ইয়ট কাছাকাছি কোথাও ডুবে গেছে। এক আধজন সারভাইভার হয়তো এখনও ভেসে থাকতে পারে, তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা সকাল থেকে।'

'এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবার আগেই নিশ্চয়ই ডোডি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিতে চাইছিল?' মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৃদ্ধের মুখ। 'পাগলী একটা। জার্নালিস্ট পছন্দ করে না ও একেবারেই।'

'তা না করতে পারে, কিন্তু আমাকে অপছন্দ করবার কারণ কি? আমি রীতিমত ভদ্রলোক।'

'কিন্তু ওর বয়সটা দেখবে তো। একুশ বছর বয়সে তুমি জার্নালিস্ট আর ভদ্রলোকের তফাত বুঝতে পারতে? আমি তো পারতাম না। এখন বয়স হয়েছে, এক মাইল দূর থেকেও চিনতে পারি। কিন্তু যাক সে কথা। তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত, মিস্টার সুদজিপতো। গতরাতে খবরটা শুনে সারারাত আমার লোকজনকে দিয়ে পালা করে ডিউটি দিইয়েছি। আমি নিজেও ছিলাম রাত বারোটা পর্যন্ত। কিন্তু কোন লাইট বা ফ্লেয়ার দেখা যায়নি। কিছু না।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার। সবাই যদি এরকম স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করত…যাক, কিন্তু জার্নালিস্টদের কথা বলছিলেন কেন?'

'তুমি জানো না বোধহয়, আমাদের পরিবারে একটা করুণ ঘটনা ঘটে গেছে। আমার ছেলে আর হবু জামাই হঠাৎ মারা গেছে প্লেন ক্র্যাশ করে। আমার একটা প্রাইভেট বীচক্র্যাফট্ ছিল। আমার ছেলেই চালাত। এই যে

সবুজ স্ট্রিপ দেখছ্ সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। সেদিন সকালে ওরা দু'জন এখান থেকেই টেক অফ্ করেছিল। দুর্ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ঝাঁকে ঝাঁকে জার্নালিস্ট এসে কে কার চেয়ে বেশি খবর জোগাড় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিয়েছিল। ফল বুঝতেই পারছ্। এখন লোক দেখলেই তাড়াতে চায় ডোডি—পাছে আবার ওকে সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা স্মরণ করতে হয়। যাক, চা খাবে?'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার। কিন্তু দিনের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর আধঘণ্টা সময় আছে হাতে...'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, রওনা হয়ে যাও। কিন্তু বিশেষ আশা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না আমার কাছে।'

'সত্যিই নেই। কিন্তু তবু চেষ্টা করতে হবে। বুঝতেই পারছেন...

'হ্যাঁ! উইশ ইউ সাকসেস্, ইয়ং-ম্যান।'

রানার হাত ঝাঁকিয়ে দিল বৃদ্ধ। ডোডিও এক টুকরো নকল হাসি উপহার দিল। চলে এল রানা হেলিকপ্টারে।

'তেলও বেশি নেই, সময়ও নেই। এবার কোন্‌দিকে?' জিজ্ঞেস করল সুদজিপতো।

'এবার এই যে ঘাসের এয়ার স্ট্রিপ দেখছেন, এটা ধরে খুব ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চলুন।'

তাই করল সুদজিপতো। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কি যেন দেখল রানা নিচের দিকে চেয়ে। তারপর সোজা উত্তর দিকে চালাতে বলল। দৃষ্টির আড়ালে গিয়েই সাউলানের দিকে ঘুরল হেলিকপ্টার। ফিরে আসছে ওরা।

'দিনটা কি শুধু শুধুই গেল, মিস্টার মাসুদ রানা? যা খুঁজছিলেন পেলেন না?' জিজ্ঞেস করল সুদজিপতো।

'পেয়েছি।'

'পেয়েছেন!' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল পাইলট রানার মুখের দিকে। 'কি জিনিস পেলেন দেখালেন না? সারাটা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটলাম, তন্ন তন্ন করে দু'জন একসাথে খুঁজলাম, অথচ জিনিসটা পেলেন, একটি বার বললেনও না আমাকে?' একটু যেন অভিমান প্রকাশ হয়ে পড়ল সুদজিপতোর কণ্ঠস্বরে।

'আমি আসলে কয়েকটা তথ্য খুঁজছিলাম, আবদুল্লাহ্। দেখাবার মত জিনিস সেগুলো নয়।' মৃদু হেসে বলল রানা।

সূর্য অস্ত গেছে বেশ কিছুক্ষণ হয়। নিচটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সাউলানের দক্ষিণতম পয়েন্টে এসে উপস্থিত হলো ওরা। আবছা মত দেখা যাচ্ছে সী-বীচটা। নামা কি ঠিক হবে? কিন্তু পাখোয়াজ পাইলট আবদুল্লাহ্ সুদজিপতো। ভাবনার লেশমাত্র নেই ওর চোখে মুখে। নিশ্চিত হলো রানা। কারণ এতক্ষণের সান্নিধ্যে সে বুঝে নিয়েছে হেলিকপ্টার সে-ও চালাতে জানে, কিন্তু আবদুল্লাহ্‌র মত চালাতে হলে আরও পাঁচ বছরের ট্রেনিং নিতে হবে ওকে। যাক, এখন চিন্তা কেবল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বোটের কাছে গিয়ে

পৌঁছুনো। এবার দৌড়াতে হবে না, এই যা ভরসা। বৃষ্টিটাও নেই।

ল্যান্ডিং লাইট জ্বালবার জন্যে সুইচের দিকে হাত বাড়াল সুদজিপতো, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে জ্বলে উঠল আলো। হেলিকপ্টার থেকে নয়—নিচে থেকে। তীব্র উজ্জ্বল সার্চ লাইট জ্বলে উঠল সাগর থেকে। আলোয় আলোময় হয়ে গেল কক্‌পিট। ঝট্ করে মাথাটা একপাশে সরাল রানা চোখ ঝল্‌সানো আলো থেকে বাঁচবার জন্যে। সেই অবস্থায় দেখল, এক হাত তুলে চোখ ঢাকল সুদজিপতো, পরমুহূর্তে বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে। রক্তে ভিজে লাল হয়ে যাচ্ছে শার্টটা। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বুক মেশিনগানের গুলিতে। মাথা নিচু করে সীট থেকে নেমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল রানা। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে চুর করে দিল উইন্ডস্ক্রীন। হেলিকপ্টারটা কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে—নাকটা নিচু হয়ে গেছে বেশ খানিকটা, সরে যাচ্ছে ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড থেকে। মৃত পাইলটের হাত পিচ্ লিভার থ্রট্‌ল্ থেকে সরিয়ে ওটা ঘুরাতে গেল রানা, এমন সময় দিক পরিবর্তন করল বুলেটগুলো। খটাং খটাং করে ইঞ্জিন কেসিং-এর গায়ে এসে লাগছে এখন গুলিগুলো। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। যেন কেউ অফ করে দিল ইগ্‌নিশন সুইচ। আর কিছুই করবার নেই রানার। সোজা গিয়ে সমুদ্রে পড়বে এখন হেলিকপ্টার। তীব্র একটা ঝাঁকুনির জন্যে প্রস্তুত হলো রানার শরীর। যতটা আশা করেছিল তার চাইতে অনেক বেশি জোরে ঝাঁকুনি খেল সে। মাথা জোরে ঠুকে গেল মেঝের সঙ্গে। পাহাড়ের উপর পড়েছে আসলে হেলিকপ্টারটা।

নিজের অজান্তেই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা। কিন্তু দরজা দিয়ে বেরোতে পারল না। মাথা নিচু দিকে করে পড়েছে হেলিকপ্টার—দরজা অনেক উঁচুতে। শরীরে শক্তি পাচ্ছে না রানা। কোথা থেকে একরাশ পানি এসে জমছে হেলিকপ্টারের নাকের কাছে।

কিছুক্ষণ কবরের মত স্তব্ধতা বিরাজ করল চারপাশে। তারপর আবার শুরু হলো নিচে থেকে গুলিবর্ষণ। ফিউযিলেজ ভেদ করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য গুলি। দু'বার ঘাড়ের কাছে জামায় হ্যাঁচকা টান অনুভব করল রানা। পানির মধ্যে মুখ গুঁজে বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে।

এমনি সময় নাকের কাছে পানি জমার জন্যেই হোক আর গুলির ধাক্কাতেই হোক ভারসাম্য টলে উঠল হেলিকপ্টারের। কাৎ হয়ে গেল সেটা একদিকে, একসেকেন্ড যেন থমকে দাঁড়াল, তারপর সোজা নেমে এল নিচে ঠিক সিমেন্টের বস্তার মত—ঝপাৎ করে সমুদ্রে পড়েই তলিয়ে গেল মুহূর্তে।

পাঁচ

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল রানা। নাকে, মুখে, চোখে লবণাক্ত

পানি যেতেই চোখ মেলে চাইল। কি ঘটেছে বুঝে উঠতেই পার হয়ে গেল আরও কয়েক সেকেন্ড।

সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেছে সে! সবটা ব্যাপার মনে পড়তেই ভয়ানক এক আতঙ্ক পেয়ে বসল ওকে। বুকের উপর থেকে সুদজিপতোর শরীরটা সরিয়ে দিল সে। তারপর দরজার দিকে এগোল অন্ধের মত দুই হাত সামনে বাড়িয়ে।

আটকে গেছে দরজা। খুলল না। প্রচণ্ড ধাক্কায় দুমড়ে বেঁকে আটকে গেছে শক্ত ভাবে। ধাক্কা দিল রানা, টানল, দমাদম পিটাল—কিন্তু খুলল না দরজা।

চোখ আর কান ব্যথা করছে রানার। তার মানে সমুদ্রের অনেক গভীরে তলিয়ে গেছে হেলিকপ্টার। বুকের ভিতরটায় মনে হচ্ছে কেউ যেন পেট্রল ভরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঢিপ ঢিপ করছে কপালের দুই পাশ। আবার একবার প্রাণপণে চেষ্টা করল রানা দরজা খুলবার। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের গায়ে দুই পা ঠেকিয়ে দুই হাতে দরজার হাতল ধরে টানল সে। খুলতেই হবে দরজা, নইলে অবধারিত মৃত্যু। কিন্তু খুলল না দরজা। টানের চোটে হ্যান্ডেলটাই ঘুরল কেবল, ছুটে গেল রানার হাত থেকে। হ্যান্ডেলটা ছুটে যেতেই পায়ের ধাক্কায় চলে এল সে হেলিকপ্টারের পিছন দিকে।

আর পারা যায় না। মৃত্যুকে স্বীকার করে নেয়াই ভাল এখন। বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইছে। কতক্ষণ হলো সে দম বন্ধ করে আছে? দু'মিনিট? ভুড়ভুড়ি হয়ে উপরে উঠে গেল রানার অবশিষ্ট দম। ফুসফুস ভর্তি বাতাস গ্রহণ করবার স্বাভাবিক জৈবিক তাগিদে হাঁ করে দম নিল সে। লবণ পানি। কিন্তু না নিয়েও উপায় নেই। ইচ্ছে করে ঠেকানো যাচ্ছে না। মস্তিষ্কের হুকুম অমান্য করে দেহটা বাঁচতে চাইছে নিজের তাগিদে। হঠাৎ রানা বুঝতে পারল ওর দেহটা আসলে ও না। আলাদা একটা অস্তিত্ব আছে দেহটার। ওটা একটা বিচিত্র কলকজা দিয়ে তৈরি গাড়ির মত। ড্রাইভার হিসেবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে ওটার মধ্যে। এতদিন ড্রাইভ করেছে ঠিকই, কিন্তু ভিতরের যন্ত্রপাতিগুলোর নিয়মকানুন প্রভৃতি সম্বন্ধে আসলে কোন ধারণাই নেই ওর। এতদিন বুঝতে পারেনি, কিন্তু আজ এই জরুরী মুহূর্তে অপদার্থ ড্রাইভারকে নাকচ করে দিয়ে দেহটা নিজেই চলবার চেষ্টা করছে দেখে অবাক হলো সে। টের পেল ও এবং ওর দেহটা সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জিনিস। কিন্তু এসব ভাবছে কেন সে? মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে এইসব কথা ভাবে মানুষ? এত শব্দ কিসের? মাথার মধ্যে কোলাহল হচ্ছে কেন? চিন্তাগুলো ডুবে যাচ্ছে সেই প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে। হাঁ করে আবার দম নেবার চেষ্টা করল দেহটা। একরাশ বাতাস ঢুকল ক্ষুধার্ত ফুসফুসে।

অবাক হলো রানা। বাতাস! বাতাস এল কোত্থেকে? পেট্রলের গন্ধ। আন্দাজেই বুঝতে পারল সে ব্যাপারটা। পায়ের ধাক্কায় হেলিকপ্টারের লেজের কাছে চলে এসেছে সে। কপাল গুণে আটকে আছে ওখানে খানিকটা

বাতাস—বেরিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি।

বুক ভরে শ্বাস নিল কয়েকবার রানা। আবার ওর কন্ট্রোলে চলে এল দেহটা। বুকের উপর থেকে সরে গেল সাঁড়াশীর চাপ। কতখানি বাতাস আছে? অন্ধকারে দুই হাত বাড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল রানা। ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু আন্দাজ করা গেল, দশ-পনেরো মিনিট অনায়াসে বাঁচতে পারবে সে।

বেরোনো যাবে না? দরজা তো দুটো।

কথাটা মনে আসতেই বুক ভরে দম নিয়ে ডুব দিল রানা। পনেরো ফুট নিচে পাইলটের পাশের দরজাটা খুঁজে বের করল সে হাতড়ে হাতড়ে। দরজা নেই, দরজার ফাঁকটা আছে। রানার পাশের দরজাটা ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে গিয়ে আটকে গেছে, আর সেই ধাক্কাতেই পাইলটের পাশের দরজাটা খুলে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এল রানা আবার লেজের দিকটায়।

এখন উপরে ওঠা ঠিক হবে না। পিস্তল আর সাব-মেশিনগান হাতে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ওরা। সহজে যাবে না ওরা। রানার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কিছুতেই যাবে না। সমুদ্রের দিক থেকেই এসেছিল সার্চ লাইটের আলো। নিশ্চয়ই বোটে করে এসেছে ওরা। এখন ঠিক যেখানটায় হেলিকপ্টারটা তলিয়ে গেছে সেখানটায় এসে অপেক্ষা করছে পানিতে আলো ফেলে। আশা করছে, যে কোন মুহূর্তে ভুস করে ভেসে উঠতে পারে কেউ।

যদি কখনও কর্ণফুলীতে ফিরতে পারে তাহলে কি জবাবদিহি করবে সে কমোডোর জুলফিকারের কাছে? রাশেদ-খলিলের মৃত্যুর জন্যে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে তাকেই দায়ী করেছেন কমোডোর। Triton উধাও হয়ে গেছে, ওর নিজের পরিচয়ও আর গোপন নেই শত্রুপক্ষের কাছে। আবদুল্লাহ্ সুদজিপতোর মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ী। হেলিকপ্টারও গেছে। মুখ দেখাবে কি করে সে দেশে ফিরে? কি জবাব দেবে এতগুলো প্রশ্নের। সবকিছু গোলমাল করে দিয়ে বসে আছে সে। আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আর বারো ঘণ্টা মাত্র আছে হাতে। এইটুকু সময়ে কদ্দূর কি করতে পারবে সে একা?

কতক্ষণ বোট নিয়ে অপেক্ষা করবে ওরা? আটকানো বাতাসটুকু ইতোমধ্যেই দূষিত হয়ে এসেছে। মিনিট দশেক পার হয়ে গেছে এরমধ্যেই। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ভেসে উঠতে হবে রানাকে উপরে। ভেসে ওঠার কথা ভাবতেই একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাৎ আঁতকে উঠল রানা। সর্বনাশ! নাইট্রোজেন বাবল্! একটি বারও এই নাইট্রোজেন বাবলের কথা মনে হয়নি রানার এতক্ষণ! আরেকবার কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নগ্ন আতঙ্ক নিষ্ক্রিয় করে দিল ওর চিন্তাশক্তি।

নিজেকে স্থির রাখবার চেষ্টা করল রানা। যা হবার হয়ে গেছে। এখন যা হবার হবে।

কতখানি গভীর পানিতে আছে সে? দশ ফ্যাদম? পনেরো? বিশ? না

আরও বেশি? সেলাত লম্বকের কোন কোন জায়গায় গভীরতা আশি ফ্যাদম। কিন্তু পাড়ের এত কাছে কি এত গভীর পানি থাকবে? থাকবে না—নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্বীকার করবার উপায় রইল না যে পাহাড়ের ঠিক ধারেই পানিতে পড়েছে হেলিকপ্টার। এবং ইচ্ছে করলেই এখানে পঞ্চাশ-ষাট ফ্যাদম পানি থাকতে পারে।

খোদা! যদি পঁচিশ ফ্যাদম পানি হয় তাহলেই সব শেষ। ডিকম্প্রেশন টেব্‌লটা মুখস্থই আছে রানার। তিরিশ ফ্যাদম নিচে কেউ যদি দশ মিনিট সময় ব্যয় করে তাহলে উপরে উঠতে উঠতে জায়গায় জায়গায় আঠারো মিনিট ডিকম্প্রেশন স্টপ্ দিতে হবে তাকে। সমুদ্রের নিচে প্রেশারের মধ্যে শ্বাস নিলে নাইট্রোজেন জমে মানুষের টিস্যুতে। উপরে উঠতে আরম্ভ করলে এই নাইট্রোজেন রক্তের সঙ্গে মিশে ফুসফুসে চলে আসে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে দূর হয়ে যায়। কিন্তু দ্রুত উপরে উঠে এলে শ্বাস-প্রশ্বাস দূর করতে পারে না নাইট্রোজেন—ফলে রক্তের মধ্যে নাইট্রোজেন বাব্‌ল্ তৈরি হয়। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তো হবেই, পঙ্গু হয়ে যাবে সে জন্মের মত, মারাও যেতে পারে।

বিশ ফ্যাদমও (১২০ ফুট) যদি নিচে থাকে, ভাবল রানা, তাহলে ছয়মিনিট থামতে হবে ডিকম্প্রেশনের জন্যে। যদি বাঁচি, পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকতে হবে বাকি জীবন। আর থাকা যায় না।

বার কয়েক বুক ভরে বাতাস নিয়ে আবার ছেড়ে দিল রানা। রক্তের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নেয়া দরকার। শেষবার ফুসফুস পুরো করে নিয়ে ডুব দিল সে, পাইলটের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠতে আরম্ভ করল উপরে। ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে আর একটু পর পরই অল্প অল্প বাতাস ছেড়ে দিচ্ছে সে মুখ দিয়ে। উপর দিকে চাইল রানা। মনে হলো কালির দোয়াতের মধ্যে সাঁতার কাটছে। ঘন অন্ধকার। আর কতদূর? আরও পঞ্চাশ ফ্যাদম? এদিকে দম যে ফুরিয়ে যাচ্ছে—বুকের উপর সেই সাঁড়াশীটা চেপে বসতে চাইছে আবার।

হঠাৎ, হাল ছেড়ে দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে অপেক্ষাকৃত হালকা মনে হলো অন্ধকারটা। একটু পরেই মাথাটা ঠেকল শক্ত মত কি একটা জিনিসের সঙ্গে। ধরে ফেলল রানা সেটা। ধীরে, খুব ধীরে মাথা তুলল পানির উপরে। প্রাণ ভরে শ্বাস নিল সে খোলা সমুদ্রের ভেজা মিষ্টি বাতাসে। এক্ষুণি শুরু হবে গাঁটে গাঁটে ডিকম্প্রেশনের তীব্র যন্ত্রণা। নিজেকে প্রস্তুত করল রানা। কিন্তু কিছুই ঘটল না। পনেরো ফ্যাদম হলেও যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যেত না—নিশ্চয়ই তারও কম পানিতে ছিল সে এতক্ষণ। খুব সম্ভব পঞ্চাশ ষাট ফুটের বেশি ছিল না পানি।

কি জিনিস আঁকড়ে ধরে আছে আগেই বুঝতে পেরেছিল রানা, এবার মনোযোগ দিল তার প্রতি। হাল। এখনও রয়েছে বোটটা। ঠিক ওদের বোটের তলায় উঠেছে রানা। বেশ বড়সড় একটা বোটের হাল ধরে ঝুলছে সে এখন।

ভাগ্যিস প্রপেলারের কাছে ওঠেনি! তাহলে ধড়টা আলাদা হয়ে যেত মাথা থেকে।

আশপাশের সমুদ্র বোটের আলোয় আলোকিত। সার্চ লাইটটা এখনও খুঁজছে ওকে অক্লান্তভাবে। একটি লোককেও দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু ওরা কি করছে বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর। পানির দিকে নজর রেখে অপেক্ষা করছে ওরা—সেফ্‌টি ক্যাচগুলো সব অফ্ করা। তৈরি।

পায়ের সাথে বাঁধা প্লাস্টিক খাপ থেকে ছুরিটা বের করে হালের গায়ে লিখল রানা M.R. যতক্ষণ ওরা নিশ্চিন্ত না হতে পারছে ততক্ষণ আর কাজ নেই রানার অপেক্ষা করা ছাড়া।

'যথেষ্ট হয়েছে।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা বলে উঠল কেউ। চম্‌কে উঠল রানা। অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর। 'এতক্ষণ পানির তলায় থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কায়েস, মিসির, দাউদ!'

ক্যাপ্টেন ইমরানের গলা! ঘাড়ের কাছে কয়েকটা চুল খাড়া হয়ে গেল রানার!

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন?'

'কেউ ওঠেনি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'না, স্যার।' পরপর একই উত্তর দিল তিনজন।

'ঠিক আছে। গ্রান্ট, ছেড়ে দাও বোট। মাতারাম।'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।'

ডুব দিল রানা। প্রায় দশ ফুট নিচে দিয়ে সাঁতরে চলল সে পাড়ের দিকে। মাথার উপর পানিতে তোলপাড় তুলছে প্রপেলার। প্রায় দেড় মিনিট পর অতি সাবধানে মাথা তুলল রানা পানির উপর। বহুদূরে চলে গেছে বোট। সার্চ লাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, হুইল হাউসে বাতি জ্বলছে কেবল। দ্বিধাহীন চিত্তে ফিরে চলেছে ওরা। যে কাজে এসেছিল সেকাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।

একটু ডান পাশে সরে গিয়ে ছোট্ট সী-বিচটায় উঠল রানা। ভেজা বালির উপর চিত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিল পনেরো মিনিট। তারপর উঠে রওনা হলো রাবারের ডিঙিটার উদ্দেশে।

বার কয়েক ডাকল রানা। কোন সাড়াশব্দ নেই ওজন আলীর। অন্ধকার হয়ে আছে কর্ণফুলী। মৃত্যুর মত অন্ধকার। গেল কোথায়? তীরে যেতে নিষেধ করেছে রানা, কাজেই নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছে। ঘুমন্ত ওজন আলীর নিশ্চিন্ত নাদুস নুদুস চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই রেগে উঠল রানা মনে মনে। সারাদিনের এই ধকলের পর কাউকে ঘুমাতে দেখলে কে না রেগে উঠবে। গলা ছেড়ে চিৎকার করল রানা, ওয়ালথারের বাঁট দিয়ে ইয়টের গায়ে টোকা দিল জোরে জোরে। কিন্তু তবু কেউ এল না। মরণ ঘুমে পেয়েছে ওজন আলীকে।

আবার চেষ্টা করল রানা উপরে উঠতে। মাত্র চারফুট। একটা বাচ্চা

ছেলেও পারবে। কিন্তু রানা পারছে না। অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে ওর দেহমন। কেউ সাহায্য না করলে বোধহয় পারবেও না উঠতে। ডিঙিতে বসে কিছুক্ষণ শক্তি সঞ্চয় করল রানা। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে এল উপরে।

কিন্তু কোথায় ওজন আলী? সারা ইয়টে চিহ্নমাত্র নেই ওর। কোথাও কোন ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। যেমন ছিল—ঠিক তেমনি স্বাভাবিক রয়েছে কর্ণফুলী। শুধু অদৃশ্য হয়ে গেছে সাব্-লেফ্‌টেন্যান্ট ওজন আলী।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে বসে পড়ল রানা স্যালুনের একটা সোফায় দুই আউন্স পরিমাণ ব্র্যান্ডি গ্লাসে ঢেলে নিয়ে। খানিকটা শক্তি ফিরে এল ব্র্যান্ডির কল্যাণে। ফিরে এল রানা আপার ডেকে। বহুকষ্টে ডিঙি আর আউট বোর্ড মোটর তুলে ফেলল ডেকের উপর। ডিঙিটা ডিফ্লেট করে আফটার লকারে রেখে দিল। আজ আর লুকিয়ে রাখবার, বা প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। কেউ যদি আসে এবং সার্চ করে? মৃদু হাসল রানা। কেউ যদি আসে তাহলে বুলেট খাবে সে কলজে বরাবর।

স্যালুনে চলে এল রানা। বাথরুমে ঢুকে জামা কাপড় খুলে প্রথমেই স্নান করল সে সাবান মেখে। গায়ের কাদামাটি পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু মনের কালি ঘুচল না। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে রাশেদ, খলিল আর আবদুল্লাহ সুদজিপতোর মরা মুখ। শুকনো তোয়ালেতে গা-হাত-পা মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সদ্য পাট ভাঙা কাপড় পরে নিল রানা। চুল আঁচড়াতে গিয়ে আয়নার দিকে চেয়েই অবাক হয়ে গেল সে। ওর ঠাকুর্দা চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। মনে হচ্ছে আয়নার ভিতর থেকে আশি বছরের এক বৃদ্ধের মুখ দেখা যাচ্ছে। মাথা নাড়ল রানা, সেই বৃদ্ধও মাথা নাড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

স্কার্ফটা গলায় পেঁচিয়ে নিয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল রানা। প্রথমেই ওর প্রিয় ওয়ালথারটা চেক করল সে। ইজেক্টার স্প্রিং ঠিক আছে, ম্যাগাজিন ফুল। বারকয়েক দ্রুত এইম করল সে দরজার হাতলের দিকে। ঠিক আছে—চলবে।

আধগ্লাস ব্র্যান্ডি ঢেলে নিয়ে পাশের টিপয়ের উপরে রাখল রানা। তারপর সিগারেট ধরাল একটা। কয়েক মিনিটের জন্যে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। ধ্যান ভাঙল একটা ইঞ্জিনের শব্দ কানে যেতেই। এই ইয়টের দিকেই এগিয়ে আসছে কোন বোট। শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা টিপে মারল রানা অ্যাশট্রেতে। ঢক্ করে অবশিষ্ট ব্র্যান্ডিটুকু গিলে ফেলল। তারপর স্যালুনের বাতিটা অফ্ করে দিয়েই খোলা দরজার পাশে সেঁটে গেল দেয়ালের গায়ে।

যতদূর সম্ভব ওজন আলী। কিন্তু তাহলে কাঠের ডিঙিটা নিয়ে যায়নি কেন সে? ওটা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। তাই এই সাবধানতা।

মোটর বোটের ইঞ্জিন প্রথমে স্লো হলো, তারপর নিউট্রাল। আস্তে ধাক্কা খেল সেটা ইয়টের গায়ে। কয়েকজনের কথাবার্তার শব্দ। কেউ একজন উঠল ইয়টে। আবার জোর আওয়াজ শোনা গেল ইঞ্জিনের।

জোরে জোরে পা ফেলে স্যালুনের ছাতের উপর দিয়ে হুইল হাউসের

দিকে চলে গেল একজন লোক। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো রানা—লোকটা আর যেই হোক, ওজন আলী নয়। কিন্তু এমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হাঁটছে কেন লোকটা? গোপনীয়তার কোন প্রয়োজনই বোধ করছে না কেন? ওকি স্থির নিশ্চিত যে কেউ বাধা দেবে না ওকে? রানার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু ওজন আলী? তবে কি ওজন আলীকেও...

পিস্তলটা হাতে চলে এল রানার। ক্লিক করে খুলে গেল হুইল হাউসের দরজা, দড়াম করে লেগে গেল আবার। টর্চ জ্বেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল লোকটা স্যালুনের ভিতর। নেমেই থামল সে। টর্চটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে লাইটের সুইচটা খুঁজছে এখন। বিদ্যুতের মত এগিয়ে এল রানা। বাম হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরেই হাঁটু দিয়ে জোর এক গুঁতো লাগাল সে লোকটার পিছন দিকে। ডান হাতে ধরা পিস্তলটা ততক্ষণে চেপে বসেছে লোকটার কানের উপর। ককিয়ে উঠল লোকটা এই আচমকা আক্রমণে।

'এটা হিয়ারিং এইড নয় মিস্টার, এটা একটা পিস্তল।' বলল রানা। 'থ্রী টু ক্যালিবারের ওয়ালথার পি. পি. কে। একটু নড়াচড়া করলেই গুলি বেরিয়ে যাবে।'

কিছু যেন বলবার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোল কেবল। একটু পিছন দিকে বাঁকা হয়ে স্থির হয়ে রইল সে পাছে ভুল বুঝে গুলি করে বসে রানা।

'বাম হাতে লাইটের সুইচটা অন করো।' গলাটা একটু ঢিল দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু খবরদার! খুব ধীরে।'

অতি ধীরে, অতি সাবধানে বাম হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করল লোকটা। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল ঘরটা।

'এবার দুই হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়াও। কোন রকম কৌশলের চেষ্টা করলে নিজ দায়িত্বে করবে। সাবধান।'

আদেশ পালন করল লোকটা নিখুঁত ভাবে। ব্যাটা আদর্শ বন্দী ভাবল রানা। গুনে গুনে তিন পা পিছিয়ে এল সে, তারপর পিস্তলটা ঠিক ওর পিঠের উপর স্থির রেখে হুকুম করল, 'ঘুরে দাঁড়াও।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা রানার দিকে। ভ্রূ জোড়া কুঁচকানো, অগ্নি বর্ষণ করছে ভাঁটার মত দুই চোখ, ক্লিন শেভ্ন মুখটা লাল হয়ে গেছে রাগে। কমোডোর জুলফিকার।

চট্ করে পিস্তলটা পকেটস্থ করে জিভ কাটল রানা। বলল, 'দরজায় নক্ করা উচিত ছিল, স্যার।'

'আবার কথা বলে!' খেপে উঠলেন কমোডোর। 'এটা কি ধরনের ভদ্রতা জানতে চাই আমি! অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার এটা কোন্ ধরনের রীতি, মাসুদ রানা?' বসে পড়লেন কমোডোর একটা সোফায়।

'লম্বকে অন্তত আমার কোন বন্ধুও নেই, অতিথিও নেই, স্যার। এখানে কেবল শত্রু আছে আর আততায়ী আছে। যে-ই এই ইয়টে আসবে সে-ই

শত্রু। কিন্তু আপনাকে তো আশা করিনি, স্যার। আপনি হঠাৎ…'

'হ্যাঁ। হঠাৎই আসতে হয়েছে আমাকে। ঘণ্টা দুয়েক আগে এসে পৌঁছেছি। Triton-এ কত টাকার এম্যারেল্ড ছিল জানো?' রানার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ বেমালুম ভুলে গেলেন তিনি নতুন খবর শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেয়ার কথা মনে আসতেই।

'প্রায় কোটি টাকার মত।' বলল রানা।

'তেত্রিশ কোটি!' চোখ বড় বড় করে রানাকে শব্দ দুটোর তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি। 'আমারও ধারণা ছিল এক কোটি। করাচী থেকে কয়েক চালানে যাবার কথা ছিল পুরো মাল। কিন্তু যেই আমাদের লোকজন জাহাজটা পাহারা দেবে জানতে পেরেছে ওমনি পুরোটা একবারেই চালান দিয়ে দিয়েছে গর্দভগুলো। এখন মাথার চুল ছিঁড়ছে। ওপর থেকে স্পেশাল ইন্‌স্ট্রাকশন এসেছে আমার কাছে আজই দুপুরে। কাজেই ছুটে চলে এসেছি আমি আর দেরি না করে।'

'খবর দিয়ে তো আসতে পারতেন, স্যার।'

'চেষ্টা করেছিলাম। দুপুরে কয়েকবার চেষ্টা করেছি। কেউ সাড়া দেয়নি এদিক থেকে। বুঝলাম অবস্থা খারাপ। নিশ্চয়ই আরও কিছু গোলমাল হয়েছে। বিমান বাহিনীর জেটে করে…আচ্ছা, ওজন আলী গেল কোথায়?'

'জানি না, স্যার।'

'জানো না!' অবাক হলেন কমোডোর। 'কিন্তু কি ব্যাপার, রানা? কি হয়েছে তোমার? কি বলছ? ওজন আলী কোথায় জানো না তুমি?'

'না, স্যার? জানি না। খুব সম্ভব বল প্রয়োগ করে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওকে এখান থেকে। ঠিক জানি না। দুই ঘণ্টা আগে এসেছেন আপনি, এই দুই ঘণ্টা কোথায় ছিলেন, স্যার? কর্ণফুলীতে আসেননি একবারও?'

'এসেছিলাম। এই যে বোটটা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল—আরমেডা সামুডেরা, অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ান নেভির রেসকিউ বোট—এতে করেই এসেছিলাম। তোমাদের কাউকে দেখলাম না। খাওয়া দাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত নেই দেখে চলে গেলাম Sirrus-এ।'

'Sirrus-এ!' অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল রানা কমোডোরের মুখের দিকে, তারপর হঠাৎ মনে পড়ল। 'ও, আচ্ছা, আপনি বলেছিলেন, ওসমান খান আপনার ক্লাস ফ্রেন্ড। এমালি খানকেও চেনেন আপনি…'

'হ্যাঁ। ডিনারটা ওখানেই সেরে নিলাম। বিরিয়ানী করেছিল আজ।'

'কেমন দেখলেন আপনার বাল্যবন্ধুকে?'

'মানে?' অবাক হলেন কমোডোর একটু। 'কেমন আবার দেখব? ভালই।'

'আর বেগম ওসমান খান?' কমোডোরকে একটু ইতস্তত করতে দেখে নিজেই উত্তরটা দিল রানা, 'বিশেষ সুবিধার নয়, তাই না, স্যার? অসুখী,

ফ্যাকাসে চেহারা, কালি পড়েছে চোখের কোলে। স্বামী অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করে। গতকাল রাতে তো আমাদের সামনেই বিশ্রীভাবে অপমান করেছে তাকে আপনার বাল্যবন্ধু। এমালি খানের হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি কাল আমি...'

'অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব।' বললেন কমোডোর। 'আমি ওর আগের বউকেও চিনতাম। বেচারী মারা গেছে মাস চারেক আগে। সুখী...'

'আগের মিসেস খান মেন্টাল হস্‌পিটালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।'

'তাতে কি আছে? ওরা পরস্পরকে অসম্ভব ভালবাসত। নাহে, মানুষ এভাবে বদলে যেতে পারে না। ওসমান অত্যন্ত ভদ্রলোক।'

'ঠিক আছে, আপনিই বলুন না, স্যার, বর্তমান বেগম খানকে কেমন দেখলেন?'

'খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে যাবার বেশ খানিকটা পরে এসেছিল এমালি।' বললেন কমোডোর চিন্তান্বিত কণ্ঠে। 'আমি তখন অবশ্য খাওয়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু ওর শরীরটা বিশেষ ভাল বলে মনে হলো না। জিজ্ঞেস করায় বলল, হঠাৎ পা পিছলে যাওয়ায় কপালের ডানদিকে খানিকটা জায়গা ছেঁচে গেছে ইয়টের গার্ড রেইলে লেগে।'

'স্বামীর হাতের সঙ্গে লেগে আসলে ছেঁচেছে ওর কপাল, আমার যতদূর বিশ্বাস। যাক, আপনি কি, স্যার, কর্ণফুলীতে আমাদের দেখতে না পেয়ে ভালমত খুঁজেছিলেন পুরো ইয়টটা?'

'নিশ্চয়ই। আফটার কেবিনটা কেবল বন্ধ ছিল। তাছাড়া...'

বসে ছিল রানা, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

'বন্ধ ছিল! আমি তো খোলা দেখলাম একটু আগে!' মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল রানার। 'ওজন আলী, স্যার! নিশ্চয়ই ওজন আলীকে বন্দী করে রেখেছিল ওরা আফটার কেবিনে। আমার মৃত্যু সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। যদি দৈবাৎ বেঁচে ফিরে আসি তাহলে কাজটা সেরেই ফিরবে বলে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় আপনি এসে পড়ায় আফটার কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। মরতেই হবে আমাকে। স্ট্রং-রুম ভেঙে সোনা আর এমারেল্ড বের করতে হলে সময় চাই ওদের। আমাকে বেঁচে থাকতে দিলে সে সময় পাবে না ওরা। কিন্তু আশ্চর্য...'

'কি যা তা বলছ, রানা। একটু পরিষ্কার করে বলো, বুঝতে পারছি না।'

'আজ সকালে আমার জন্যে যে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেছিলেন, ওটা এখন সমুদ্রের তলায়, স্যার। আজ সন্ধ্যায় গুলি করে নামানো হয়েছে ওটাকে। পাইলট মারা গেছে। ওরা জানে, আমিও মারা গেছি সেই সাথে।'

কথাটা শুনেই চুপ হয়ে গেলেন কমোডোর জুলফিকার। দুই মিনিট ভুঁরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করলেন। ক্লিষ্ট হাসি হেসে বসবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন রানাকে। তারপর বললেন, 'জানো, রানা, ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের সবাইকে

আমি তোমার সম্বন্ধে কি বলি? আমার এত বছর বয়সে আজ পর্যন্ত এত বুদ্ধিমান ছেলে দেখিনি আমি। সেই তোমাকে পর্যন্ত নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়ে দিল এরা। এরা তাহলে কি?'

'এরা ইহুদি।'

'শোনো, রানা। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার উপর নির্ভর করেছিলাম। কিন্তু তাই বলে তোমাকে হারাতে চাই না আমি। জেদ, রাগ, আক্রোশ বা পরাজয়ের গ্লানি সব ভুলে যাও। আমাদের সবারই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ভয়ানক ধূর্ত ওরা। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে আমাকে বলো, এদের বিরুদ্ধে কাজ করবার ইচ্ছা এখনও আছে তোমার? মানে···পারবে তুমি এদের সঙ্গে?' অদ্ভুত একটা স্নেহ ঝরে পড়ল কমোডোর জুলফিকারের কণ্ঠে। একটু অবাক হলো রানা। এই কঠোর লোকটার হৃদয়ে যে সে কখন স্থান করে নিয়েছে বুঝতেই পারেনি আগে।

'পারব, স্যার।'

'পারবে?' আবার প্রশ্ন করেন কমোডোর।

'জেদ, রাগ, আক্রোশ ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, স্যার। তিনজন বন্ধুকে হারিয়েছি আমি, হয়তো আরেকজনকেও হারাতে চলেছি। এই অবস্থায় ওসব ব্যাপার মন থেকে দূর করা সহজ নয়। কিন্তু পারব। ওদের কৌশল বুঝেছি আমি, স্যার। আর চব্বিশ ঘণ্টা টিকে থাকতে পারলেই এখানকার পাট চুকিয়ে রওনা হতে পারব আমরা পাকিস্তানের উদ্দেশে।'

স্যালুনের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এল রানা। সংক্ষেপে যতদূর সম্ভব সবটা ব্যাপার বুঝিয়ে বলল কমোডোরকে। চোখ বন্ধ করে সোফায় হেলান দিয়ে শুনে গেলেন কমোডোর জুলফিকার। তারপর বললেন, 'তাহলে সাতু লাগি?'

'জ্বি, স্যার। সাতু লাগি। নিশ্চয়ই একটা ট্রান্সমিটার আছে ওখানে কোথাও। নইলে আমার চেহারার বর্ণনা পেল কোথায় ওরা? খুব সম্ভব মাতারাম থেকে গিয়ে বোটটা অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে।' হঠাৎ উঠে গিয়ে জানালার ভেলভেটের পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে এল রানা। 'আমরা বিকেল বেলা গিয়েছি সাউলানের পাশ দিয়ে, তখন কোন বোট ছিল না। অথচ সন্ধ্যার সময় তারা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। আমাদের খবর জানল কি করে ওরা? এত নিশ্চিতই বা হলো কি করে?'

'ঠিক বলেছ। ট্রান্সমিটারেরই কাজ। কিন্তু ওই পর্দাগুলো সরিয়ে দিলে কেন?'

'একটা দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে। এই ইয়টে লোক আসবে আজ রাতে, স্যার। ওরা জানে আমি মারা গিয়েছি। ওজন আলীও হয় মারা গেছে, নয়তো ওদের হাতে বন্দী হয়ে আছে। কাজেই বাধা দেবার কেউ নেই।'

'কিন্তু কেন, কি করতে আসবে লোক?'

'জনশূন্য কর্ণফুলী নোঙর করা থাকলে সন্দেহ হবে অন্যান্য লোকের।

কেউ খোঁজ খবর করতে পারে। তাই বোটে করে আসবে ওরা। নোঙর তুলে লম্বক প্রণালী থেকে বের করে নিয়ে যাবে কর্ণফুলীকে। তারপর সল্ট ওয়াটার কক্‌টা খুলে দিয়ে ফিরে চলে আসবে। অল্পক্ষণেই তলিয়ে যাবে কর্ণফুলী। এখানকার সবাই জানবে মাতারাম ছেড়ে চলে গিয়েছি আমি আর ওজন আলী।'

'তা বুঝলাম। কিন্তু পর্দা সরালে কেন?' সিগারেট ধরালেন কমোডোর।

'বলছি, স্যার।' ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছিল রানার। কোন মতে মেলে রেখে বলল, 'ইয়ট ডুবাতে হলে আসবে ওরা রাত বারোটার দিকে, জোয়ার এলে। কিন্তু তার আগেই নিমন্ত্রণ করছি আমি ওদের। যদি আধঘণ্টার মধ্যে এসে পড়ে তাহলেই বোঝা যাবে মাতারাম বন্দরেই জলে অথবা ডাঙায় একটা ঘাঁটি আছে আমাদের শত্রুপক্ষের।'

'ঠিক বুঝলাম না, রানা। একটু পরিষ্কার করে বলো।'

'ওজন আলী কোথায় কি অবস্থায় আছে ভাল করেই জানা আছে ওদের। আমাকেও মেরে রেখে এসেছে ওরা সাউলানে। কিন্তু পুরোপুরি শিওর না ওরা আমার ব্যাপারে। আমার মরা মুখ দেখে আসবার সুযোগ হয়নি ওদের। এখন যেই কর্ণফুলীর স্যালুনে বাতি দেখবে ওমনি চমকে উঠবে ওরা। ব্যাপার কি! মাসুদ রানা ফিরে এল, না ওর আর কোন সহকর্মী? যে-ই হোক, খতম করে দিতে হবে। ছুটে আসছে ওরা—রওনা হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে।'

চট্ করে চাইলেন কমোডোর রানার চোখের দিকে। উশখুশ করলেন একটু, তারপর বললেন, 'তাহলে চোখ বুজে পড়ে আছ কেন? তুমি যখন এতই শিওর যে ওরা আসছে আমাদের খুন করতে, তখন আত্মরক্ষা…মানে, একটা পিস্তল টিস্তলও তো নেই আমার কাছে।'

'লাগবে না, স্যার। তবু আমারটা রাখতে পারেন সাথে।' নিজের পিস্তলটা এগিয়ে দিল রানা। অভ্যাসবশে ঝট্‌পট্ পরীক্ষা করে দেখলেন কমোডোর পিস্তলটা ঠিক আছে কিনা। ফেরত দেয়ার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিলেন, রানা বলল, 'থাক, স্যার, ওটা আপনার কাছেই। পরে দরকার হলে চেয়ে নেব।'

'কিন্তু এখানে বসে থাকা কি ঠিক হচ্ছে? অন্তত প্রস্তুত হয়ে…'

মৃদু হাসল রানা। বলল, 'এখান থেকে আধমাইলের মধ্যে কোন ইয়ট নেই, স্যার, আর ঘাট তো পৌনে এক মাইল দূরে। কাজেই সময় লাগবে ওদের পৌঁছতে। দাঁড় বেয়ে আসতে হবে ওদের। আউটবোর্ড ইঞ্জিন ব্যবহার করবে না।'

একটু যেন নিশ্চিন্ত হলেন কমোডোর। তারপর হঠাৎ বললেন, 'আজই রাতে সাতু লাগি যেতে চাও তুমি?'

'জ্বি, স্যার। আমাদের হাতে সময় কম, কাজ অনেক। বাধা দেবার চেষ্টা করবে ওরা। যদি…'

'রত্নদ্বীপে সন্দেহজনক কি পেলে তুমি, রানা?'

'প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী এবং তার কন্যার ব্যবহার।'

'কি যে বলো তুমি, রানা! আমি আবদুল গনি ইলাহ্‌দেকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। আরমেডা সমুদারার রিয়ার-অ্যাডমিরাল ছিলেন উনি রাজনীতিতে ঢোকার আগে। ওসমান সম্পর্কে আমার ভুল হতেও পারে, অবশ্য তার সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগের বেশি নয়: কিন্তু রিয়ার-অ্যাডমিরাল আবদুল গনি ইলাহ্‌দের ব্যাপারে পাগল ছাড়া আর কেউ এই ধরনের সন্দেহ পোষণ করবে না। বে-আইনী বা অসৎ কোন কাজ করা ওর পক্ষে অসম্ভব।'

'আমারও তাই ধারণা, স্যার। খুব খাঁটি লোক।'

'তাই বলো।' আশ্বস্ত হলেন কমোডোর। 'আমি ভাবলাম বিদঘুটে নাম দেখেই ডাকাত-সর্দার ভেবে বসেছ তুমি ওকে। যাক, এবার রেডি হতে হয়, তোমার মেহমানরা এসে গেছে অর্ধেক রাস্তা। ওদের ঠেকাবার কি প্ল্যান করছ?'

'স্যালুনের লাইট নিভিয়ে স্লীপিং কেবিন আর স্টার্নের লাইট জ্বেলে দেব। আফটার ডেকের আলো জ্বেলে দেয়ায় এদিকটা ওদের কাছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার মনে হবে। আমরা ফরওয়ার্ডের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকব।'

'কোথায়?'

'আপনি থাকবেন হুইল হাউসের মধ্যে। হ্যান্ডেলের উপর হাত রাখবেন হাল্‌কা ভাবে। আস্তে আস্তে যখন ঘুরতে থাকবে হ্যান্ডেলটা তখনই বুঝতে পারবেন এসে গেছে ওরা। দরজাটা বাইরের দিকে খুলবে। দুই ইঞ্চি খোলার পরই জোরে লাথি মারবেন। তাতেই কাজ হয়ে যাবে, একটা দাঁতও অবশিষ্ট থাকবে না, নাকটাও শেষ হয়ে যাবে জন্মের মত। অন্যদের ব্যবস্থা আমি করব।'

'কিভাবে?'

'আমি থাকব স্যালুনের ছাতে। মুগুর পেটা করে চিৎ করব যে-ই উঠবে উপরে।'

'কেন, চোখের উপর টর্চের আলো ফেলে হ্যান্ডস আপ করলেই তো হয়।' বোঝা গেল রানার আত্মরক্ষার প্ল্যান মোটেও পছন্দ হয়নি কমোডোরের কাছে।

'হয় না, স্যার। বিষাক্ত সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর ওরা। কোন রকম সুযোগ দেয়া যাবে না ওদের। গুলি আমরা নিতান্তই বাধ্য না হলে ছুঁড়ব না। কারণ উত্তর-পশ্চিমে বইছে বাতাস, সমুদ্রের উপর বহুদূর পর্যন্ত শোনা যাবে গুলির শব্দ—সাবধান হয়ে যাবে ওদের ঘাঁটির লোকেরা। দ্রুত, নিঃশব্দে, অদৃশ্য থেকে কাজ সারতে হবে আমাদের। কয়েকটা নাইট গ্লাস এখন চেয়ে আছে কর্ণফুলীর দিকে।'

আর কিছু বললেন না কমোডোর। রানা বেরিয়ে গেল বাইরে। জায়গা মত দাঁড়িয়ে হ্যান্ডেলের উপর একহাত রেখে অপেক্ষা করতে থাকলেন তিনি। লাইটের ও সিগন্যালের ব্যবস্থা করে স্যালুনের ছাতে চলে এল রানা। বাম

হাতে ছুরি, ডান হাতে একটা শক্ত কাঠের ডাণ্ডা। ধিক ধিক প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে ওর চোখে।

পনেরো মিনিট পরে এল ওরা। দু'জন। রাবারের ডিঙি এসে লেগেছে কর্ণফুলীর গায়ে। একটা রশি ধরে দুটো টান দিল রানা। রশির আরেক মাথা বাঁধা আছে কমোডোরের বাম হাতে। ওদিক থেকে একটা টান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি, যে তিনি প্রস্তুত।

একজন উঠে এল প্রথমে। বেঁধে ফেলল ডিঙিটা। এবার উঠে এল অপরজন। ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে চাঁটি মারতে পারে রানা ওদের মাথায়। হুইল হাউসের দরজার দিকে পা বাড়াল ওরা।

চার সেকেন্ড নীরবতা। তারপরই ঘোঁৎ করে শব্দ বেরোল সামনের লোকটার মুখ থেকে। দরজায় লাথি চালিয়েছেন কমোডোর। সঙ্গে সঙ্গে লাঠি চালাল রানা। কিন্তু লাগল না ঠিকমত। ক্ষিপ্রগতিতে বসে পড়েছে দ্বিতীয় লোকটা। বাড়িটা ঘাড়ে লাগল না পিঠে লাগল বোঝা গেল না। কিন্তু বুঝবার চেষ্টা না করে চিতাবাঘের মত লাফিয়ে পড়েছে ততক্ষণে রানা ওর উপর। লোকটার যে কোন এক হাতে একটা ছুরি অথবা পিস্তল আছে, রানা জানে। কাজেই উপায় নেই কোন। এক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেলেই খতম হয়ে যাবে সে। রানার বাম হাতটা বিদ্যুৎবেগে দু'বার ওঠা নামা করল। স্থির হয়ে গেল লোকটা।

যন্ত্রণায় অস্ফুট গোঙানি বেরোচ্ছে প্রথম লোকটার মুখ থেকে। গড়াগড়ি খাচ্ছে সে ডেকের উপর। স্যালুনে নেমে এল রানা। কার্টেনগুলো টেনে দিয়ে বাতি জ্বেলে দিল। তারপর উপরে গিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল লোকটাকে নিচে।

'আরেকটা কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর।

'ওটা শেষ।' জবাব দিল রানা সংক্ষেপে।

যেটা আছে সেটাও প্রায়ই না থাকার মত। মুখের চেহারার দিকে চাওয়া যায় না, এমন বীভৎস ভাবে জখম হয়েছে। কমোডোর যে ইচ্ছে করলেই কপাটের উপর লাথি মেরে কারও মুখের জিয়োগ্রাফীর ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনে দেয়ার ব্যাপারে ওয়ার্লড্ চ্যাম্পিয়ান হতে পারবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না রানার।

থুক্ করে তিনটে ভাঙা দাঁত ফেলল লোকটা কার্পেটের উপর। কিন্তু বিন্দুমাত্র করুণা হলো না রানার। সার্চ করা হলো লোকটাকে। ওজন আলীর ল্যুগারটা বেরোল ওর পকেট থেকে। জিজ্ঞেস করে একটি কথাও বের করা গেল না ওর মুখ থেকে। এক চড় মারতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল লোকটা কার্পেটের উপর।

লোকটাকে কমোডোরের জিম্মায় রেখে উপরে চলে এল রানা। আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। একটা রেন-কোট গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল সে বাইরে। মোটর সুদ্ধ ডিঙিটা তুলে আনল সে উপরে। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে পরীক্ষা

করল—কিন্তু কোন ইয়টের নাম লেখা নেই ওটার গায়ে কোথাও। বাতাস ছেড়ে দিল রানা রাবারের ডিঙিটার। তারপর মৃত লোকটার ডান হাতে ধরা সাইলেন্সার ফিট করা কোল্ট ফরটিফাইভটা নিয়ে শুঁকে দেখল নলটা। বারুদের গন্ধ নেই। পরীক্ষা করে দেখল ম্যাগাজিন ফুল, চেম্বারেও আছে বুলেট একটা। সেফ্‌টি ক্যাচ্ অন করে পকেটে রেখে দিল সে পিস্তলটা। টেনে নিয়ে গেল দেহটা রেলিং-এর ধারে ডিঙির কাছে। রশি দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধল সে মৃতদেহটা ডিঙির সঙ্গে, আউটবোর্ড মোটরের উপরও কয়েক প্যাঁচ লাগাল রশির। তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পানিতে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়েই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল পোঁটলাটা। হুইল হাউসের দরজার ভিতর থেকে চাবি মেরে নেমে এল রানা স্যালুনে। জ্ঞান ফেরেনি লোকটার এখনও।

'লোকটাকে নিয়ে কি করা যায় বলো তো, রানা?'

'পুলিসে দেব।'

'পুলিসে?' অবাক হলেন কমোডোর। 'পুলিস সম্পর্কে তোমার রিপোর্ট তো অন্যরকম ছিল?'

'এখনও আছে, স্যার। তবু পুলিসেই দিতে হবে ওকে। সার্জেন্টের সঙ্গে আরেকবার দেখা করার ভাল ছুতো পাওয়া গেছে।'

'তার আগে কি এর কাছ থেকে কিছু কথা আদায় করতে চাও?'

'না, স্যার। কথা ও বলবে না। সুস্থ মানুষ হলে টরচার করলে দুই একটা কথা বের হতে পারত, কিন্তু এখন কিছুতেই কথা বের করা যাবে না ওর কাছ থেকে। কিছু একটা করলেই ভিরমি খেয়ে আধঘণ্টা পার করে দেবে।'

'তবে চলো ব্যাটাকে থানাতেই দিয়ে আসা যাক।'

'তার আগে একটু Sirrus-এ যেতে চাই, স্যার। ওজন আলীকে খুঁজতে।'

'ওজন আলীকে খুঁজতে?' ভুরু কুঁচকালেন কমোডোর। 'Sirrus সম্পর্কে তোমার যা ধারণা তাতে খুঁজতে দেওয়াটা অস্বাভাবিক বলে ঠেকছে না তোমার কাছে?'

'না, স্যার। আমরা গায়ের জোরে যাব না। ভদ্রভাবে শুধু জিজ্ঞেস করব ওজন আলীকে ওরা দেখেছে কিনা।'

'বুঝেছি। তুমি ওদের রি অ্যাকশন দেখতে চাও। একজন মৃত ব্যক্তিকে জ্যান্ত দেখলে ওদের মুখের ভাব কি রকম হয় জানতে চাও তুমি। বেশ। আমিও জানতে চাই সত্যিই ওরা দোষী কিনা। অল্পক্ষণ আগেই যে ইয়টে লোক পাঠিয়েছে ওরা খুন করতে সেই ইয়ট থেকে মৃত মাসুদ রানাকে উঠে আসতে দেখে যদি চমকে ওঠে ওরা, বুঝব সত্যিই ওরা দোষী। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো কিভাবে? কি গল্প বলবে?'

'আপনি কিভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন?'

'আমি বলেছি রিটায়ার করে বেড়াতে এসেছি।'

'এবার বলবেন আমি আপনার ভাতিজা। আসলে ওরা যদি ফুলের মত

নিষ্পাপ হয় তাহলে আপনি যা বলবেন তাই বিশ্বাস করবে, আর যদি গোলমাল থাকে ওদের ভিতর তাহলে আপনি ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স চীফ আর আমি আপনার অপারেটার, এমারেল্ডের ব্যাপারে এসেছি আমরা—এই কথা বললেও বিশ্বাস করবে না ওরা।'

মুচকে হাসলেন কমোডোর। মাথা ঝাঁকালেন। নাক-মুখ ভাঙা লোকটাকে আফটার কেবিনে নিয়ে এসে আচ্ছামত কষে বাঁধা হলো। তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে নোঙর তুলে ফেলা হলো। নেভিগেশন লাইট জ্বেলে দিয়ে রওনা হলো ওরা পৌনে এক মাইল দূরে নোঙর করা Sirrus-এর দিকে।

হঠাৎ অনুভব করল রানা, সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে ওর।

ছয়

Sirrus থেকে শ' দেড়েক গজ দূরে এসে নোঙর ফেলা হলো কর্ণফুলীর। নেভিগেশন লাইট নিভিয়ে দিয়ে হুইল হাউসের সব কটা বাতি জ্বেলে দেয়া হলো। তারপর স্যালুনে এসে বসল দু'জন।

'কতক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা, রানা?'

'বেশিক্ষণ না, স্যার। আরেকবার ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামলেই আবছা হয়ে যাব আমরা ওদের চোখে। ঠিক সেই সময় রওনা হতে হবে আমাদের।'

'তোমার কি মনে হয় আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেছে ওরা দূরবীনে?'

'নিশ্চয়ই। তবে সবটা দেখতে পায়নি। আমরা যতটুকু দেখিয়েছি, সেইটুকু কেবল দেখতে পেয়েছে ওরা নাইট-গ্লাসে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই, নাভিশ্বাস উঠে গেছে ওদের। কোথায় কি গোলমাল হয়ে গেছে বুঝতে পারছে না ওরা। সেই দুইজন খুনীরই বা কি হলো, হঠাৎ ইয়টটা এগিয়ে এল কেন, ইত্যাদি প্রশ্ন জাগছে ওদের মনে, কিন্তু উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না কিছুতেই। ছট্‌ফট্ করছে ওরা এখন। অবশ্য যদি ওরাই দোষী হয়ে থাকে, তাহলে।'

'তাহলে খোঁজ করবে ওরা।'

'এত তাড়াতাড়ি খোঁজ করবে না। অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, স্যার। ওদের পাঠানো আততায়ীর জন্যে অপেক্ষা করবে ওরা। ভাববে ওরা কর্ণফুলীতে পৌঁছবার আগেই হয়তো আমরা নোঙর তুলে ছেড়ে দিয়েছি ইয়ট, কিংবা ডিঙিটায় হঠাৎ ফুটো হয়ে যাওয়ায় গোলমাল হয়েছে কিছু। অনেক কিছুই তো ঘটতে পারে।' হঠাৎ চড়্‌চড়্ করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ পাওয়া গেল। 'চলুন, স্যার, রওনা হয়ে যাই।'

গেলিডোর দিয়ে বেরিয়ে ইয়টের পিছন দিকে চলে এল ওরা। ডিঙিটা প্রায় নিঃশব্দে নামল পানিতে, তারপর ট্র্যান্সম ল্যাডার বেয়ে নেমে গেল ডিঙিতে। স্রোত আর বাতাসে ভেসে ঘাটের কাছাকাছি চলে এল ডিঙিটা। দুশো গজ দূরে গিয়ে তারপর আউটবোর্ড মোটর স্টার্ট দিল রানা। অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি।

আবছা দেখা যাচ্ছে Sirrus-এর রাইডিং লাইট। এগোল ওরা।

Sirrus-এর টেন্ডার দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল স্টারবোর্ড সাইডে। ওটার পিছন দিকটা আলোকিত গ্যাঙ-ওয়ে থেকে আট দশ ফুট দূরে। ডিঙিটা গ্যাঙ-ওয়েতে গিয়ে ভিড়তেই সাদা কস্টিউম পরা প্রহরী এগিয়ে এল।

'এই যে!' বললেন কমোডোর। 'ওসমান খান সাহেব আছেন নাকি?'

'আছেন।' জবাব দিল প্রহরী।

'দেখা করা যাবে?'

'আপনি একটু অপেক্ষা করুন...' হঠাৎ কমোডোরের চেহারাটা দেখতে পেয়ে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়ে গেল লোকটার। 'আরে, আপনি? আমি অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাইনি। আপনিই তো কমোডোর...'

'হ্যাঁ। কমোডোর জুলফিকার। তুমিই ডিনারের পর আমাকে বন্দরে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলে না?'

'জ্বি, স্যার। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। উনি স্যালুনে আছেন।'

'ঠিক আছে, আসছি। বোটটা থাকল এখানে।' রানা যেন ওর নৌকার সাধারণ একটা মাঝি এই রকম ভাব দেখালেন তিনি।

'থাকুক, স্যার। আপনি আসুন।'

উপরে উঠে গেলেন কমোডোর। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। গ্যাঙ-ওয়ে লাইটটা পরীক্ষা করে দেখল, তার ছেঁড়া সহজ হবে না। তারপর অনুসরণ করল ওদের দু'জনকে। স্যালুনের দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেন কমোডোর ভিতরে প্রহরীর পিছন পিছন, রানা দরজা ছাড়িয়ে প্যাসেজ ধরে আরও কয়েক ফুট চলে গেল, তারপর লুকিয়ে পড়ল অন্ধকার মত জায়গায়। দুই সেকেন্ড পরই স্যালুন থেকে বেরিয়ে রওনা হলো প্রহরী গ্যাঙ-ওয়ের দিকে। একটু পরেই মাঝির খোঁজ পড়বে, হৈ-চৈ হবে বেশ খানিকটা—কিন্তু তার আগেই কাজ শেষ হয়ে যাবে রানার। স্যালুনের আধ-ভেজানো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'না, না।' সৌজন্য প্রকাশ করছেন কমোডোর জুলফিকার। 'আমিই বরং ডিসটার্ব করছি তোমাকে, ওসমান। তা, হ্যাঁ, দিতে পারো। খানিকটা সোডা...ব্যস্ ব্যস্। তোমাদের বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে চাই না। আসলে ব্যাপার হয়েছে কি, আমার ভাতিজার সহকর্মীটিকে পাওয়া যাচ্ছে না...'

টোকা দিল রানা স্যালুনের দরজায়। তারপর কারও অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ঢুকে পড়ল ভিতরে মিষ্টি হাসি মুখে টেনে এনে।

'আপনাদের বিরক্ত করতে হলো বলে আমরা খুবই দুঃখিত, মিস্টার খান। এই যে, মিসেস খানও আছেন। ভাল আছেন তো আপনারা?'

মোট ছয়জন লোক ছিল স্যালুনের মধ্যে। কমোডোর, ওসমান খান, এমালি খান, এবং আরও তিনজন অপরিচিত লোক। সবার হাতেই একটা করে গেলাস। প্রত্যেকটি লোক আড়ষ্ট হয়ে গেল রানাকে দেখে। ভুরু কপালে উঠল ওসমান খানের। হাতের গ্লাসটা আরও একটু জোরে চেপে ধরল

এমালি। কপালের ছ্যাঁচা দাগটায় চমৎকার দেখাচ্ছে এমালিকে। যেন কবিতা হয়ে উঠেছে মুখটা। তিনজন অপরিচিত ভদ্রলোকের একজনের হাত থেকে পড়ে গেল গ্লাসটা। মাঝের জনের কঠোর মুখটায় কোন পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না—শুধু মনে হলো দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আরও। আর তৃতীয় জনের মুখ দেখে মনে হলো মাঝ রাত্তিরে গোরস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় পিছন থেকে কেউ যেন ওর কাঁধের উপর হাত রেখেছে একটা। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ—যেন এক্ষুণি চিৎকার করে উঠেই জ্ঞান হারাবে।

সবচেয়ে আগে সামলে নিল এমালি খান। ক্লিষ্ট হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। তারপর সহজ হলো ওসমান খান। বলল, 'আরে! মিস্টার মাসুদ রানা! আপনি হঠাৎ কোত্থেকে?' কমোডোরের দিকে চাইল এবার। 'তোমাদের পরিচয় আছে তা তো জানতাম না?'

'আমার ভাতিজা। বড় ভাইয়ের ছেলে। ম্যারিন বায়োলজিস্ট। আমি আসলে ওর বিয়ের ব্যাপারে এসেছি। তা ছোঁড়া কিছুতেই রাজি হতে চায় না। বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। এদিকে আমরাও সুন্দরী দেখে একটা মেয়ে পছন্দ করে তাকে অপেক্ষা করাচ্ছি।··· যাক্, নিজেদের কথাই বলছি কেবল। ওর সহকর্মী ওজন আলীকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। জলে ডাঙায় কোথাও নেই। তোমাদের এখানে কি এসেছিল সে? কোন খবর জানো ওর?'

'না তো!' বলল ওসমান খান। 'গত রাতে শেষ দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। তারপর আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কেউ দেখেছ তোমরা? কেউ না?' একটা বেল টিপতেই স্টুয়ার্ড এল একজন। তাকে আদেশ করা হলো যেন ইয়টের সবাইকে জিজ্ঞেস করে ওজন আলীকে দেখেছে কিনা। স্টুয়ার্ড বেরিয়ে যেতেই বলল, 'কখন থেকে পাচ্ছেন না ওকে, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'ঠিক বলতে পারছি না। ওকে রেখে আমি জেলিফিশের কিছু স্পেসিমেন জোগাড় করতে গিয়েছিলাম। আজ সারাটা দিনই বাইরে। ফিরে এসে দেখি গায়েব হয়ে গেছে।'

'সাঁতার জানত?' মাঝের অপরিচিত লোকটা জিজ্ঞেস করল হঠাৎ।

'না, সাঁতার জানত না।' বলল রানা ওর দিকে চেয়ে। 'আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছি তখন থেকে। পিছন দিকে কর্ণফুলীর গার্ড রেইলে নেই। তারপর পিচ্ছিল হয়ে ছিল ডেকটা সারাদিনের বৃষ্টিতে। আমিও ভাবছি···' একটু থামল রানা, তারপর চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলল, 'ভাবছি আর বেশি খোঁজাখুঁজি না করে সার্জেন্ট আহমেদ সুদীরুর কাছে রিপোর্ট করা দরকার।'

একটু পরেই স্টুয়ার্ড এসে জানাল Sirrus-এর কেউ দেখেনি ওজন আলীকে। ফিরে চলল ওরা গ্যাঙ-ওয়ের দিকে। ওসমান খানও এল সাথে সাথে। সবাই পরামর্শ দিল রানাকে যে ব্যাপারটা আজই রাতে জানানো দরকার পুলিসে।

গ্যাঙ-ওয়ের মুখে এসে হঠাৎ পা পিছলে গেল রানার। দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে ব্যালেন্স রক্ষা করবার চেষ্টা করল সে, তারপর গ্যাঙ-ওয়ের লাইটটা

ভেঙে পড়ে গেল সমুদ্রের মধ্যে। অন্ধকার হয়ে গেল এদিকটা। একে বৃষ্টি, তার উপর অন্ধকার। জগাখিচুড়ী গোলমাল চলল কিছুক্ষণ। প্রায় এক মিনিট পর টেনে তোলা হলো রানাকে। লাইটটা ভেঙে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করল রানা। আরে না, না; ও কিছু না, বরং আমাদেরই লজ্জিত হওয়া উচিত, ইত্যাদি বলল ওসমান খান। শুকনো কাপড় দিয়ে সাহায্য করতে চাইল। রানা অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে এল ডিঙিতে। বলল কর্ণফুলীতে গিয়েই কাপড় ছাড়বে। কর্ণফুলীতে না পৌঁছানো পর্যন্ত একটি কথাও হলো না চাচা-ভাতিজার মধ্যে। আফটার লকার থেকে স্কুবা স্যুটটা নিয়ে নিল রানা। তারপর চাচা মিঞার পিছন পিছন চলে এল স্যালুনে।

'যাই বলো,' বললেন কমোডোর একখানা সোফায় আরাম করে বসে। 'আমাকে ওরা সন্দেহ করতে পারেনি একবিন্দুও।'

'ঠিক, স্যার।' বলল রানা। 'ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী।'

'কারণ?'

'হঠাৎ রিটায়ার করে পাকিস্তান নেভীর কমোডোর জুলফিকার চলে এলেন লম্বক প্রণালীতে—কেন, আর জায়গা ছিল না পৃথিবীতে? তিনি এলেন কিসে করে—না, আরমেডা সামুডেরার লঞ্চে। চেহারার বিন্দুমাত্র মিল নেই, ভাষা আলাদা—মাসুদ রানা হয়ে গেল ভাতিজা। এর পরেও কি করে আশা করছেন ওরা আপনাকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির মনে করবে?'

'Sirrus-এ গিয়ে তাহলে তোমার সন্দেহ দূর হয়েছে?'

'জ্বি, স্যার। ওদের মুখের চেহারা তো আপনিও দেখেছেন—কেমন মনে হলো আপনার কাছে?'

'কিন্তু কেবল এতে করেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায় না।'

'না, স্যার।' স্কুবা স্যুটটা পরতে পরতে বলল রানা। 'একটু আগে পা পিছলে আমি ইচ্ছে করেই পড়েছিলাম পানিতে। আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে আজ সন্ধ্যায় হেলিকপ্টার ক্র্যাশের পর যখন সমুদ্রের তলা থেকে ভেসে উঠেছিলাম আমি ওদের বোটের তলায় তখন হালের গায়ে M.R. লিখে রেখেছিলাম ছুরি দিয়ে। পিছলে পানিতে পড়েই অন্ধকারের সুযোগে প্রথমেই পরীক্ষা করলাম আমি Sirrus-এর টেন্ডারটার হাল। হালের গায়ে লেখা আছে M.R. আমারই হাতের লেখা। এই বোট থেকেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সুদজিপতোকে।'

'অর্থাৎ নিঃসন্দেহ এখন তুমি।' চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন কমোডোর।

'আরও আগেই নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছি আমি, স্যার। তবু আরও নিশ্চিত হয়ে নিলাম। যে লোকটা আমাকে জিজ্ঞেস করল ওজন আলী সাঁতার জানে কিনা ওর চিলের মত গলা শুনেই সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল আমার। ওর নাম ক্যাপ্টেন ইমরান। সে-ই ওই বোটের চার্জে ছিল।'

মাথা ঝাঁকালেন কমোডোর বার কয়েক। তারপর বললেন, 'বুঝলাম।

কিন্তু ওটা পরছ কেন আবার?'

'Sirrus থেকে একটু ঘুরে আসতে চাই, স্যার। ঠিক Sirrus-এ নয়, ওটার টেন্ডারে যাব একটু বেড়াতে। ছোট্ট একটা যন্ত্র আর সের খানেক চিনি নিয়ে যাব সাথে।'

'অর্থাৎ গ্যাঙ-ওয়ের লাইটটা ভেঙে ফেলাও তাহলে ইচ্ছাকৃত অ্যাক্সিডেন্ট?'

'জ্বি, স্যার। ওটা সেরে ফেলবার আগেই ঘুরে আসতে চাই আমি ওখান থেকে। অবশ্য যদি আপনি অনুমতি দেন তবেই...'

'ভণিতা করবার কোন প্রয়োজন নেই, রানা। যদি যাওয়ার দরকার মনে করো, যাও। ফিরে এসে কারণ ব্যাখ্যা করলেও চলবে।'

'আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে, স্যার। আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমি ঘুরে আসতে আসতে আপনি ইন্দোনেশিয়ান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সাহায্যে আরও একটা খবর জোগাড় করে ফেলুন।'

'কি খবর?'

'আবদুল গনি ইলাহুদের ছেলের ইনশিওরেন্স সম্পর্কেও খবর নিতে হবে।'

চোখ বড় বড় করে চাইলেন কমোডোর রানার দিকে। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। ইঞ্জিন-রুমের কোথায় ট্রান্সমিটার আছে ভাল করেই জানেন তিনি, কাজেই আর বাক্যব্যয় না করে বেরিয়ে গেল রানা বাইরে।

নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করে ফিরে এল রানা। কমোডোর জুলফিকার দাঁড়িয়ে আছেন ডেকের ধারে। উপরে উঠতে সাহায্য করলেন তিনি রানাকে। তারপর বললেন, 'ওজন আলীকে পেয়েছি, রানা।'

'কোথায়!' ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার মনটা অমঙ্গল আশঙ্কায়।

'ইঞ্জিন-রুমে। এসো দেখাচ্ছি।'

আর বলতে হলো না রানাকে কিছু। যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। ছুটল সে ইঞ্জিন-রুমের দিকে। ঢাকনিটা খোলা। ট্রান্সমিটার নেই। পাশের ফাঁকা জায়গায় গোটা দুই পোর্টেবল ট্রান্সমিটার ছিল, কয়েকটা প্যাকেটে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড অ্যামাটোল, প্রাইমার, কেমিক্যাল ডিটোনেটার আর পাঁচ মিনিট রেঞ্জের মিনিয়েচার টাইমিং ডিভাইস ছিল, কয়েকটা অতি ক্ষুদ্র আধুনিক ট্রান্সমিটার ছিল—কিচ্ছু নেই। সেজদার ভঙ্গিতে বসে আছে ওজন আলী। কোন ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

গাল ছুঁয়ে দেখল রানা। এখনও ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। ঘণ্টা দুয়েক আগে খুন করা হয়েছে ওকে। মুখটা এপাশে ফিরাল রানা এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল ওর মৃত্যুর কারণ। ঘাড় মট্‌কে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে ওকে।

কমোডোরের দিকে চাইল রানা। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। মুখের উপর ফুটে রয়েছে কঠোর একটা অভিব্যক্তি। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছেন তিনি। ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে দুই চোখে।

'কিভাবে মারা গেছে?'

'ঘাড় ভেঙে দেয়া হয়েছে, স্যার।'

'প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। মিসির ওর নাম। রাশেদ আর খলীলকেও ও-ই খুন করেছিল। আমাকেও আর একটু হলে শেষ করে দিত Triton-এর ডেকের উপর।'

'একে খুঁজে বের করে হত্যা করবার অর্ডার দিলাম আমি তোমাকে, রানা। যেখানে যে অবস্থায় পাও ধ্বংস করে দেবে ওকে বিনা দ্বিধায়।' ফিরে এল ওরা স্যালুনে। চুপচাপ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন কমোডোর, তারপর বললেন, 'কিভাবে ব্যাপারটা ঘটেছে আঁচ করতে পারছ, রানা?'

'পারছি, স্যার। আমি ভোর রাতে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার থাকতে থাকতে ওরা এসে উঠেছিল এই ইয়টে। ওজন আলীকে বন্দী করে রেখেছিল সারাদিন। সেজন্যে দুপুরে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি সে আপনাকে। আপনি যখন Sirrus-এ ডিনার খেতে যাবার আগে কর্ণফুলীতে উঠেছিলেন তখনও বন্দী ছিল সে।'

'কিন্তু ওরা কিসে করে আসবে? নৌকো বা ডিঙি তো দেখলাম না?'

'ওদের নামিয়ে দিয়েই ফিরে গিয়েছিল নিশ্চয়ই ডিঙি। Sirrus-এর ডিঙি সারাদিন কর্ণফুলীর গায়ে লাগিয়ে রাখতে পারে না ওরা। আমার মৃত্যু সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। আপনি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল ক্যাপ্টেন ইমরান আমাকে হত্যা করে সাগর তলায় নামিয়ে দিয়ে। মিসিরকে হুকুম দেয়া হলো, ওজন আলীকে শেষ করে দিতে হবে। এমন বীভৎস ভাবে হত্যা করা কেন হলো ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো গুলির শব্দ দূর থেকে শোনা যাবে, আর ছুরি মারলে ডেকের উপর রক্তের চিহ্ন থেকে যেতে পারে—এই ভয়েই ওভাবে মারা হয়েছে ওজন আলীকে। কিংবা হয়তো এভাবে হত্যা করতেই পছন্দ করে মিসির।'

'হুম।' বললেন কমোডোর জুলফিকার। 'তারপর ওরা চিন্তা করল কোথায় লুকিয়ে রাখা যায় ওজন আলীকে। রাত বারোটা পর্যন্ত ইয়টটা খালিই ফেলে রাখতে হবে, কাজেই লুকিয়ে রাখা দরকার, নইলে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে দেখে ফেলবে। তাই ইঞ্জিন কেসিংটা তুলে ভিতরের যন্ত্রপাতি সরিয়ে ওজন আলীকে ওর মধ্যে ভরে ঢাকনি লাগিয়ে দিল।' এতক্ষণ পর্যন্ত শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলছিলেন কমোডোর জুলফিকার। হঠাৎ এই প্রথম বারের মত রানাকে চমকে দিয়ে বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন তিনি। 'কিন্তু ওরা জানল কি করে, রানা! কি করে জানল ওরা আমাদের ট্রান্সমিটারটা কোথায় লুকানো আছে?' আবার খাদে নেমে এল কমোডোরের গলা। প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'কে বিশ্বাসঘাতকতা করল, রানা? কে?'

'আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার নির্বুদ্ধিতা।' বলল রানা। 'আমারই বোকামির জন্যে ওজন আলীর মৃত্যু হয়েছে, স্যার। কাস্টমস্ অফিসার এল, তন্ন তন্ন করে খুঁজল অর্ধেকটা ইয়ট। কিন্তু ইঞ্জিনরুমটা দেখার

পরই আর কিছুই পরীক্ষা করবার আগ্রহ রইল না তার। ব্যাটারির কথা জিজ্ঞেস করল আমাকে—তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার। আমাদের ডিনার খাওয়ার ছুতোয় সরিয়ে দেয়া হলো ইয়ট থেকে—তখনও বুঝলাম না!' ক্ষোভে বুজে এল রানার কণ্ঠস্বর।

'কি বুঝলে না?'

'আসুন, স্যার।' ইঞ্জিনরুমে চলে এল ওরা। 'ব্যাটারিগুলো দেখে আপনার মনে কোন রকম সন্দেহ জাগছে?'

রানার দিকে চাইলেন কমোডোর একটু অবাক হয়ে, তারপর হাতের টর্চ জ্বেলে পরীক্ষা করলেন ব্যাটারিগুলো। মিনিট দুই পরীক্ষা করবার পর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'কই, না। কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'আমিও বুঝিনি। কিন্তু নকল কাস্টম্‌স্ অফিসার ঠিকই বুঝেছিল। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল ওরা, তাই বুঝতে অসুবিধে হয়নি মোটেই। ওরা শক্তিশালী একটা ট্রান্সমিটার খুঁজছিল। ব্যাটারিগুলোর গায়ে ক্রকোডাইল ক্লিপ্ কিংবা স্ক্রু ক্ল্যাম্পের দাগ খুঁজছিল ওরা।'

আবার টর্চ জ্বাললেন কমোডোর। ঝুঁকে পড়লেন ব্যাটারিগুলোর উপর। এবার দশ সেকেন্ডেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'বুঝলাম। এটা দেখেই বুঝে নিয়েছিল ওরা এরই আশেপাশে কোথাও আছে আমাদের আসল ট্রান্সমিটার।'

'এবং এইজন্যেই আমার কার্যকলাপ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না ওদের মনে। এইজন্যেই ওরা জানত একা পাওয়া যাবে ওজন আলীকে ভোর রাতে। জানত, সন্ধ্যায় সাউলান দ্বীপের ঠিক কোন্ জায়গাটায় ফিরে আসব আমরা হেলিকপ্টার নিয়ে। সাতু লাগির কাছাকাছি কোথাও থেকে যখন রিপোর্ট পাওয়া গেল আমার চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এমন একজন লোক হেলিকপ্টার নিয়ে আশেপাশে ঘুরঘুর করছে, তখন হেলিকপ্টারটা ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা—পাছে পাইলটকে আমি কোন ইনফরমেশন দিয়ে থাকি। এখানকার সবকটা ইয়টের ট্রান্সমিটার নষ্ট করে দিয়ে বোকা বানিয়েছে ওরা আমাদের। এটা করেছে যাতে আমরা মনে করি একমাত্র আমাদের গোপন ট্রান্সমিটার ছাড়া লম্বকে আর একটি ট্রান্সমিটারও আস্ত নেই। ছি, ছি। ইহুদি ব্রেন সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না আমার।'

'গত রাতে ডিনার খেয়ে ফিরে এসে তোমরা দেখলে তোমাদের অনুপস্থিতিতে কেউ এসেছিল ইয়টে। ওরা নিশ্চয়ই এই ট্রান্সমিটারটা খুঁজে বের করতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। যন্ত্রপাতি নিয়েই এসেছিল; এবং এমন ব্যবস্থা করে গেছে যাতে আমাদের প্রত্যেকটি কথাবার্তা শুনতে পায় ওরা। কাজেই আমাদের প্ল্যান জানতে অসুবিধে হয়নি ওদের। আমরা কি করছি, কি করতে চাই, কতদূর

জেনে ফেলেছি, সবই আঁচ করতে পেরেছে ওরা, এবং সেইমত ব্যবস্থা করেছে। ওরা ইচ্ছে করলেই নষ্ট করে দিতে পারত এই ট্রান্সমিটার—কিন্তু তাহলে আমাদের চিন্তাধারা, কার্যকলাপ সম্পর্কে জানবার আর কোন উপায় থাকত না। খোদা! কিছুই বুঝতে পারিনি আমি...'

'তুমি যতটা পেরেছ, আমি তাও বুঝতে পারিনি, রানা। এখন দুঃখ করে লাভ নেই। এখন তো বুঝলে কি রকম আশ্চর্য কৌশলী আর ধূর্ত তোমার প্রতিপক্ষ। এবার বলো কিভাবে এগোতে চাও।'

রানা আদৌ এগোতে চায় কিনা সেকথা জিজ্ঞেস করলেন না কমোডোর আর। কারণ সে সময় পার হয়ে গেছে। এখন এগোনো বা না এগোনো কারও ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না। ট্রান্সমিটারের মারফত এদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম জানবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন সম্মুখ যুদ্ধ। মুখোশ খুলে গেছে দুই পক্ষেরই।

'ওরা জানে, ওজন আলীকে খুঁজে পাব আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই...'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানার কথার মাঝখানে কথা বলে উঠলেন কমোডোর। 'হ্যাঁ। এবং ওরা জানে না আমরা ঠিক কতখানি জানি। কিন্তু কোনরকম ঝুঁকি নেয়া উচিত মনে করবে না ওরা। এটা একশো তেইশ কোটি টাকার ব্যাপার। কাজেই আমাদের শেষ করে দিতেই হবে।'

'জি, স্যার। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক নয়। এতক্ষণে হয়তো রওনা হয়ে গিয়েছে ওরা। পিস্তলটা বের করে হাতে রাখুন, স্যার।'

'ওই ভারীটা আমাকে দাও।' রানার ওয়ালথার রানাকে ফিরিয়ে দিয়ে কোল্ট ফরটিফাইভটা নিলেন কমোডোর। 'এবার কি সাতু লাগির দিকে রওনা হবে?'

'তার আগে ওজন আলী আর আফটার কেবিনের লোকটাকে পাড়ে নামিয়ে দিতে হবে, স্যার।'

'একটা শব্দ হলো যেন, রানা।' বললেন কমোডোর জুলফিকার।

আবছামত শব্দ রানাও শুনেছিল, মনে করেছিল কানের ভুল, কিন্তু কমোডোরের কথায় কান খাড়া হয়ে গেল ওর। আবার এল শব্দটা। ইয়টের গায়ে খালিহাতে চাপড় দিচ্ছে যেন কেউ।

অন্ধকারে নোঙর তুলে ফেলেছে ওরা কর্ণফুলীর। রওনা হবে, এমন সময় এসেছে শব্দটা। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল রানা গার্ড রেইলের কাছে। তারপর শুয়ে পড়ল ডেকের উপর। হাতে ওয়ালথার পি. পি. কে। চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

'বাঁচাও!' চাপা মেয়েলি কণ্ঠে কথা বলে উঠল কেউ। আবার শব্দ হলো ইয়টের গায়ে। 'বাঁচাও! ডুবে গেলাম!'

টুঁ শব্দ করল না রানা। নড়ল না একটুও। কাউকে বাঁচাবে না সে। অন্তত যতক্ষণ না নিশ্চিত হতে পারছে যে সত্যিই বিপদে পড়ছে কেউ। শব্দটা

যদি কোন ডিঙি থেকে এসে থাকে, এবং সেই ডিঙিতে সাব-মেশিনগান হাতে বসে থাকে আরও দু'জন লোক, তাহলে থাকুক ওরা। টুঁ শব্দ করবে না রানা।

কিন্তু সাহায্য করতেই হলো। এমালি খান। সাঁতার কাটছে পানিতে, আর হাবুডুবু খাচ্ছে। একটু দূরে সরে গিয়ে আবার ডাকল এমালি: 'ডুবে গেলাম! বাঁচাও!'

'কে? মিসেস খান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। ডুবে গেলাম, তাড়াতাড়ি ওঠান আমাকে! খোদা!'

একটা টায়ার ফেন্ডার নিচে নামিয়ে দিল রানা।

'ফেন্ডারটা ধরে ফেলুন।'

'পেয়েছি।' একটু পরেই শব্দ এল নিচে থেকে।

'এবার উঠে আসুন রশি বেয়ে।'

চেষ্টার ত্রুটি করল না এমালি খান। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হলো পানিতে। তারপর বলল, 'পারছি না, মিস্টার রানা।'

'ঠিক আছে। আপনি ঝুলে থাকুন।' বলেই কমোডোরের উদ্দেশে রওনা হবার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল রানা, দেখল ওর ঘাড়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে আছেন তিনি। কানে কানে বলল রানা, 'মিসেস এমালি খান। কিন্তু ট্র্যাপও হতে পারে, স্যার। আপনি গার্ড দেন, আমি তুলে নিয়ে আসছি। আলো দেখলেই গুলি চালাবেন।'

কোন কথা না বলে মাথা নাড়লেন কমোডোর। গার্ড-রেইল ডিঙিয়ে নেমে গেল রানা। টায়ারে পা বাধিয়ে হাত বাড়াল নিচে। ধরে ফেলল এমালির এক বাহু। কিন্তু টেনে তোলা সহজ কথা নয়। শুধু এমালি হলে হত, বেশ বড়সড় একটা পোঁটলা বেঁধে এনেছে সে পিঠের সঙ্গে। খানিকটা টেনে উপরে তুলবার পর রানার হাঁটু জড়িয়ে ধরল এমালি, আবার খানিকটা টেনে তোলার পর কোমর ধরে ঝুলল। এবার আরও খানিকটা টেনে তুলতেই টায়ারে পা বাধিয়ে উঠে এল সে, দুই হাতে জড়িয়ে ধরে থাকল রানার গলা, দুই পায়ে পেঁচিয়ে ধরেছে সে রানার পা। স্পষ্ট অনুভব করল রানা, থরথর করে কাঁপছে এমালির সর্বশরীর। ভয়ে? না ক্লান্তিতে?

'আমার বুকের সাথে সেঁটে থাকলে তো উঠতে পারব না রশি বেয়ে।' বলল রানা। 'আমি ঘুরছি, আপনি আমার পিঠের দিকে চলে আসুন।'

মাথা নেড়ে সায় দিল এমালি। পেছন থেকে দুই হাতে রানার গলা আর দুই পায়ে রানার পা জড়িয়ে ধরে ঝুলতে থাকল সে। তরতর করে রশি বেয়ে উঠে এল রানা উপরে। গার্ড-রেইলের কাছে আসতেই সাহায্য করলেন কমোডোর। কেউ কোন কথা না বলে চুপচাপ ভেজা এমালিকে প্রায় ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে এল ওরা সেলুনে। বসিয়ে দিল সোফার উপরে।

স্লীপিং গাউন পরা অবস্থায় পালিয়ে এসেছে এমালি। ভিজে চুলগুলো কপালে, গালে, গলায় লেপ্টে লেগে আছে, অদ্ভুত ফ্যাকাসে লাগছে মুখটা, বড় বড় দুই চোখ বিস্ফারিত, লিপস্টিক ধুয়ে গেছে সাগরজলে। কিন্তু সবটা মিলে

অদ্ভুত সুন্দর লাগল রানার চোখে। একটা গ্লাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে নিয়ে এল রানা।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' রানার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল এমালি।

'কি ব্যাপার, মিসেস খান?' প্রশ্ন করলেন কমোডোর।

'আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন চাচাজী, আমি ছেড়ে দিচ্ছি ইয়ট।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা।

'না, না।' বাধা দিল এমালি। 'দুই ঘন্টার মধ্যে আসছে না ওরা। আমি জানি। আড়ি পেতে শুনেছি আমি ওদের কথাবার্তা। সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে চলেছে, কমোডোর জুলফিকার। পালিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বললেন কমোডোর। 'ধীরেসুস্থে বললেই চলবে, অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ব্র্যান্ডিটুকু শেষ করে ফেলুন, মিসেস খান...'

'না। আর আমাকে মিসেস খান বলবেন না। কক্ষনো না। এমালি। এমালি রুসমান। অথবা শুধু এমালি।'

মনে মনে না হেসে পারল না রানা। বোমা ফাটানো খবর আছে এর কাছে, Sirrus থেকে তাড়া করে আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে যে কোন লোক, কিন্তু সবচেয়ে জরুরী কথা ওর কাছে এখন এমালি খান নয়, এমালি রুসমান। জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে পালিয়ে আসতে হলো কেন?'

ব্র্যান্ডিটুকু শেষ করে একটু সুস্থির হয়ে বসল এমালি। বলল, 'কিছুদিন ধরে টের পেয়েছি আমি ভয়ঙ্কর কিছু চলছে ইয়ট Sirrus-এ। অদ্ভুত ধরনের কিছু লোক আসা-যাওয়া করছে, বেশির ভাগ পুরানো নাবিকদের বিদায় করে ভয়ঙ্করদর্শন সব লোক নেয়া হয়েছে তাদের জায়গায়। মাঝে মাঝে আমাকে বন্দরের কোন হোটেলে নামিয়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে Sirrus কয়েক দিনের জন্যে। জিজ্ঞেস করেও জানতে পারি না আমি ওরা কোথায় যায়, কি করে। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই দেখতে দেখতে বদলে গেল আমার স্বামী—বোধহয় বিশ্রী ধরনের কোন নেশা খায় ও। পিস্তল, রিভলভার দেখতে পেয়েছি আমি ওদের কাছে। যখনই কথা বলে ওরা, আমাকে শোবার ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।' একটু থেমে দম নিল এমালি। 'গত দু'তিন দিন ধরে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে ওরা প্রত্যেকে। প্রতি মুহূর্তে কি যেন কি ঘটার আশঙ্কায় তটস্থ হয়ে আছে সর্বক্ষণ। আজ একটু আগে আপনারা যখন চলে এলেন, আমাকে শোবার ঘরে চলে যেতে বলা হলো। সেলুন থেকে বেরিয়ে গিয়েই আড়ি পাতলাম আমি। কায়েস বলল: ওই কমোডোরের বাচ্চা যদি মাসুদ রানার চাচা হয়ে থাকে তাহলে আমি ওসমান খানের খালু শ্বশুর। ওই ব্যাটা পাকিস্তান ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ, আর ওর বায়োলজিস্ট ভাতিজা হচ্ছে মাথামোটা এক পাকিস্তানী স্পাই। যাই হোক, অনেক বাড় বেড়ে গেছে ওরা, আর সুযোগ দেয়া যায় না। মাঝের লোকটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন ইমরান—এদের নেতা। সে বলল: ঠিক বারোটার সময় তুমি, দাউদ আর

মিসির যাবে কর্ণফুলীতে। ওই দুটোকে সাফ করে ইয়টটা সেলাত লম্বক থেকে বের করে সী-কক খুলে দিয়ে আসবে।'

'আহা! যাই বলেন, বড় অমায়িক আপনার স্বামীর বন্ধু-বান্ধবগুলো।' বলল রানা মৃদু হেসে।

ঝট করে চাইল এমালি রানার দিকে। তারপর বলল, 'ঠাট্টা করছেন আপনি! আপনি নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারছেন না কি ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসছে আপনার চারপাশে, তাই এমন হালকাভাবে কথা বলতে পারছেন।'

'বিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার ভাতিজা পূর্ণ ওয়াকেফহাল; মিসেস··· মানে এমালি। আসলে ওর কথাগুলোই ওই রকম। যাক, আপনার সাহস আছে বলতে হবে। মস্তবড় ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি। ধরাও পড়ে যেতে পারতেন।' বললেন কমোডোর জুলফিকার।

'ধরা পড়েছিলাম বলেই তো পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।' বলল এমালি, 'আমার স্বামী ধরে ফেলল আমাকে আড়িপাতা অবস্থায়। দেখুন কি অবস্থা করেছে।' উঠে দাঁড়াল সে। রানাদের দিকে পেছন ফিরে পিঠের কাপড় তুলল।

'ইশ্‌শ্!' আপনাআপনি বেরিয়ে গেল শব্দটা কমোডোরের মুখ থেকে।

এগিয়ে এল রানা। চাবুকের দাগ। পিঠের মাংস কেটে বসে গেছে দাগগুলো আড়াআড়িভাবে। নীলচে হয়ে এসেছে দাগগুলো এখন। ক্ষতচিহ্নের আশেপাশে সূচ ফোটানোর মত রক্তমাখা কয়েকটা বিন্দু। একটা দাগের ওপর হালকাভাবে আঙুল বুলিয়ে দেখল রানা। ফুলে আছে জায়গাটা, নরম, থকথকে। স্পষ্ট বোঝা গেল, মিথ্যে নয়, অল্পক্ষণ আগেই চাবুক মারা হয়েছে এমালির পিঠে। নড়ল না এমালি রানার দেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, রানা পিছিয়ে যেতেই ঘুরে দাঁড়াল। ম্লান ক্লিষ্ট হাসি ওর ঠোঁটে। 'আরও দেখবেন? এর চেয়েও বেশি জখম···'

'না না না।' বিচলিত হয়ে উঠলেন কমোডোর। 'আর দেখাতে হবে না, আর দেখাতে হবে না। বুঝতে পারছি।' দুই সেকেন্ড সময় লাগল তাঁর নিজেকে সামলে নিতে, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন; 'জানোয়ার! জানোয়ার! আশ্চর্য! ওসমান···উঃ! নিজের চোখে না দেখলে কোনদিন বিশ্বাস করতে পারতাম না আমি, মিসেস···এমালি রুসমান। না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে ওসমান···'

'আরেকজন বিশ্বাস করত বেঁচে থাকলে। ওসমানের আগের পক্ষের স্ত্রী।' বলল এমালি। 'এখন আমি বুঝতে পারি কেন মৃত্যুর আগে কয়েকবার মেন্টাল হসপিটালে যেতে হয়েছিল তাকে। ওইভাবে শেষ হয়ে যেতে চাই না আমি। তাই পালিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু ওরা যখনই জানবে আপনি পালিয়েছেন, তক্ষুণি ছুটে আসবে। মাঝরাত্রির জন্যে অপেক্ষা করবে না।' বলল রানা। দ্রুত চিন্তা চলেছে ওর মাথার মধ্যে।

'সকালের আগে টের পাবে না ওরা কেউ। আমি আলাদা ঘরে শুই। রাতের বেলা ভেতর থেকে চাবি মেরে ঘুমাই আমি রোজ, আজ বাইরে থেকে চাবি মেরে চলে এসেছি।'

'ভাল করেছেন।' বলল রানা। 'এবার ভেজা জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলুন। আমার কেবিনে তোয়ালে আছে, অ্যাটাচড্ বাথ আছে, অসুবিধে হবে না। তারপর আপনার জন্যে মাতারামের কোন ভাল হোটেলে রুম রিজার্ভ করে দেয়া যাবে।'

একটু যেন হতাশ হলো এমালি। বলল, 'তাহলে কাল সকালেই ধরা পড়ে যাব আমি। আবার ধরে নিয়ে যাওয়া হবে আমাকে Sirrus-এ।' শিউরে উঠল সে। 'কল্পনা করতেও শিউরে উঠছি আমি, মিস্টার রানা। পালাতে হবে আমাকে। প্রাণ বাঁচাতে হলে পালাতে হবে আপনাদেরও। আমাকে নেবেন না আপনাদের সঙ্গে? প্লীজ! আমরা তো একসাথেই পালাতে পারি!'

'না।'

'আপনারা আমাকে নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন?' ভর্ৎসনা ফুটে উঠল এমালির চোখে। তারপর করুণ মিনতি চোখে ফুটিয়ে কমোডোরের দিকে ফিরল সে। 'কমোডোর জুলফিকার, আমি একজন দুর্বল মেয়েমানুষ, বিপদের সময় সাহায্য চাইছি, সাহায্য করবেন না আপনারা? আপনার বন্ধুপত্নী হিসেবে না হোক, বিয়ের সূত্রে আমি একজন পাকিস্তানী নাগরিক, পাকিস্তানী এক মহিলাকে সাহায্য করবেন না আপনি? আমি এই ইয়টেই থাকতে চাই, অনুমতি দেবেন না?'

বিপদে পড়লেন কমোডোর। কি করবেন বুঝতে পারছেন না তিনি। রানা কেন নিষেধ করেছে না জেনে রাজি হয়ে যাওয়া··· দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টিতে চাইলেন রানার দিকে, কি দেখলেন তিনিই জানেন, আবার চাইলেন তিনি এমালির মিনতি ভরা চোখের দিকে, সব দ্বন্দ্ব কেটে গেল তাঁর।

'আলবৎ থাকবেন। আপনাকে বিপদে ফেলে চলে যাবে এমন কাপুরুষ সারা দেশ খুঁজলেও একটা পাবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। নিশ্চয়ই থাকবেন আপনি।'

'অনেক ধন্যবাদ, কমোডোর।' রানার দিকে তাকিয়ে হাসল এমালি। বিজয়িনীর হাসি নয়, তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি গোছের হাসি। 'আপনিও যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি অসঙ্কোচে থাকতে পারি। কি বলেন? দেবেন থাকতে? রাজি?'

'যদি কমোডোর জুলফিকার অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে আমার অনুমতির প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। আমাদের সাথে এই ইয়টে থাকা যে মাতারামের কোন হোটেলে থাকার চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক, সেটা জেনেও যদি আপনি থাকতে চান এবং কমোডোর অনুমতি দেন—আমার কিছুই বলবার নেই। ইউ আর ওয়েলকাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'কিন্তু আমরা যতক্ষণ ঘাটের কাছাকাছি থাকব ততক্ষণ আপনাকে একটু কষ্ট করে নিচে কেবিনে থাকতে হবে। খুব বেশিক্ষণ নয়। দেড় ঘণ্টার মধ্যে মাতারাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা।'

'আপনিই জানেন, কি চার্জ আনবেন ওর বিরুদ্ধে।' বলল রানা উত্তেজিত কণ্ঠে। দৃষ্টিটা সার্জেন্ট আহমেদ সুদীরুর মুখের উপর থেকে সরে দুই সেকেন্ড থমকে দাঁড়াল নাক-মুখ ভাঙা লোকটার মুখের উপর, তারপর ফিরে এল আবার সার্জেন্টের মুখের উপর। 'ঘটনা সবটাই বলেছি। এখন যা খুশি চার্জ আনতে পারেন—অনধিকার প্রবেশ, আক্রমণ, বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র সাথে রাখা, খুনের মতলব...'

'কিন্তু দেখুন, চার্জ আনা চাট্টিখানি কথা নয়। অনধিকার প্রবেশ কোন আইনে ফেলা যাবে না, আপনারা নো অ্যাডমিশন লিখে রাখেননি ইয়টের কোথাও। আক্রমণ বলছেন, দেখে তো মনে হচ্ছে ওকেই আপনি আক্রমণ করে আহত করেছেন। এখন আগ্নেয়াস্ত্রটাও দেখাতে পারছেন না, বলছেন ধস্তাধস্তিতে পড়ে গেছে সাগরে। আর খুনের মতলব প্রমাণ করবেন কি করে?'

রেগে যাওয়ার ভান করল রানা।

'আশ্চর্য! আপনি নকল কাস্টমস অফিসারদের সাহায্য করবার বেলায় এত তৎপর অথচ আমার ব্যাপারে এত ওজর আপত্তি তুলছেন কেন কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি। এখুনি হয়তো আপনি বলবেন, ঘাটে নেমেই প্রথমে যাকে পেয়েছি তার নাক-মুখ বরাবর চার বাই দুই কাঠের টুকরো দিয়ে মেরে ধরে এসেছি আপনার কাছে—আসতে আসতে যুৎসই একটা গল্প বানিয়ে ফেলেছি। সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আপনার বুদ্ধির দৌড় দেখে। একটা তৃতীয় শ্রেণীর গর্দভও...'

'ভদ্রভাবে কথা বলুন, মিস্টার মাসুদ রানা। সবকিছু সহ্য করতে আমি বাধ্য নই।' লাল হয়ে গেছে আহমেদ সুদীরুর মুখ।

'অপমান তো আবার বোঝেন দেখছি। কিছু কিছু ব্যাপার ইচ্ছে করেই না বোঝার ভান করেন নাকি আপনি? যাক, একে হাজতে ভরছেন কিনা বলুন।'

'শুধু আপনার কথায় কি করে...'

'আমার সাক্ষী আছে একজন। যদি চান তো ইয়ট থেকে ডেকে নিয়ে আসতে পারি। উনি হচ্ছেন ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ, কমোডোর জুলফিকার।'

'আপনার সঙ্গীর নাম ওজন আলী বলেছিলেন না?'

'হ্যাঁ। সে-ও আছে ওখানে।' মাথা ঝাঁকিয়ে বন্দীর দিকে দেখাল রানা। 'ওকে দু'একটা প্রশ্ন করে দেখলেই তো পারেন।'

'ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি। ওর একটা কথাও বোঝা যাচ্ছে না। আগে ওর মুখের চিকিৎসা দরকার...'

'হাজার চিকিৎসা করালেও ওর কথা বুঝতে পারবেন না আপনি। জার্মান ভাষায় কথা বলে ও।' বলল রানা মৃদু হেসে।

'তাই নাকি? তাহলে কোন চিন্তা নেই। ভাগ্যিস অন্য আর কোন ভাষায় কথা বলে না! একজন জার্মান ট্যুরিস্ট এসেছে মাতারামে আজ দু'দিন হলো, ইংরেজী বলতে পারে।'

'বেশ। ভাল কথা। শুধু চারটে প্রশ্ন করলেই অনেককিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার কাছে। ওকে শুধু জিজ্ঞেস করতে বলবেন: ওর পাসপোর্ট কোথায়, ইন্দোনেশিয়ায় কি করে ঢুকল, কার অধীনে কাজ করে এবং থাকে কোথায়।'

রানার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সার্জেন্ট। তারপর বলল, 'অদ্ভুত ধরনের ম্যারিন বায়োলজিস্ট আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'এবং উদ্ভট ধরনের পুলিস সার্জেন্ট আপনি, মিস্টার আহমেদ সুদীরু। চলি। গুড নাইট।'

থানা থেকে বেরিয়ে জেটির দিকে চলে গেল রানা। পনেরো গজ দূরে গিয়েই লুকিয়ে পড়ল সে একটা দোকানের আড়ালে। দু'মিনিট পর ব্যাগ হাতে থানায় এসে ঢুকল স্থানীয় ডাক্তার। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিদায় নিল সে। রানা ঠিকই আঁচ করেছিল স্থানীয় ডাক্তারের কাজ নয়, হাসপাতালে পাঠাতে হবে লোকটাকে।

আরও তিন মিনিট পর থানা থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট আহমেদ সুদীরু। ডাইনে-বাঁয়ে না চেয়ে দ্রুতপায়ে এগোল সে সমুদ্রের দিকে। পিছন পিছন চলল রানা। ঘাটের কাছে গিয়েই টর্চ জ্বালল সার্জেন্ট, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে। সার্জেন্ট যখন একটা ছোট্ট ডিঙিতে উঠবার উপক্রম করছে ঠিক তখনই পৌঁছল রানা ঘাটের কাছে। টর্চ জ্বেলে ধরল সে সার্জেন্টের মুখের উপর।

'কেন যে ব্যাটারা একটা ট্রান্সমিটার দেয় না আপনাকে, আমি তো বুঝে পাই না। কখন যে কোন জরুরী খবর পৌঁছে দেয়ার দরকার হয়ে পড়তে পারে তার ঠিক আছে কিছু। এই রাত্রের অন্ধকারে পুরো একমাইল নৌকা বেয়ে Sirrus-এ পৌঁছুনো তো আর সহজ কথা নয়!'

থমকে গেল সার্জেন্ট, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। উপরে উঠে এল সে পা টেনে টেনে, যেন মস্ত ভারী কিছু টেনে তুলছে। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি বললেন?'

'না না, সার্জেন্ট। সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না। কর্তব্যটা সেরে আসুন আগে, তারপর গাল-গপ্পো করা যাবে। আপনার প্রভুদের আগে জানিয়ে আসুন যে তাদের পাঠানো একজন লোককে বিচ্ছিরিভাবে মারধর করে নাক-মুখ ভেঙে দেয়া হয়েছে। আর এটাও বলতে ভুলবেন না যে মাসুদ রানা বলে সেই লোকটা বিচ্ছিরি রকমের সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে আপনাকে।'

'কি বলছেন, বুঝতে পারছি না আমি।' ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল আহমেদ সুদীরু। 'Sirrus…আমি তো Sirrus-এ যাচ্ছি না।'

'কোথায় যাচ্ছেন তাহলে? বলুন? মাছ ধরতে? লাইন ছাড়া হয়ে যাচ্ছে না কাজটা?'

'আপনার নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে, মিস্টার মাসুদ রানা।' একটু সামলে নিয়ে বলল সার্জেন্ট।

'তাই দিচ্ছি। ওই জার্মান লোকটার ব্যাপারে থোড়াই কেয়ার করি আমি, সার্জেন্ট। যা খুশি চার্জ আনতে পারেন আপনি ওর বিরুদ্ধে, আমার কিছুই এসে যায় না। যদি রাস্তার উপর ডাংগুলি খেলার অভিযোগ আনেন তাতেও আমার আপত্তি নেই। ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছি আমি আসলে। আপনার উপর কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্যে। সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য।'

'আমি আপনাদের মত অতটা বুদ্ধিমান না হতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ করেছিলাম আমি প্রথম থেকেই।' বলল সার্জেন্ট। 'একটু সন্দেহ হয়েছিল যে আপনি হয়তো ওদেরই লোক, কিংবা একই জিনিসের পেছনে ছুটেছেন আপনারা।' একটু থামল সার্জেন্ট। 'আসলে তা নয়। আপনি একজন স্পাই।'

'চলুন না, আমার বসের সঙ্গে দুটো আলাপ করে আসবেন।' ইঙ্গিতে কর্ণফুলীর দিকে দেখাল রানা।

'আপনার কথামত কাজ করতে আমি বাধ্য নই।'

'আপনার যেমন অভিরুচি।' অবজ্ঞাভরে কথাটা বলেই পেছন ফিরল রানা। 'আলাপটা ছিল আপনার দুই ছেলের ব্যাপারে। মানে, যারা মাছ ধরতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল বলে গুজব রটানো হয়েছে।' এক-পা সামনে বাড়াল রানা।

খপ করে রানার একটা হাত ধরে ফেলল সার্জেন্ট। 'আমার ছেলেদের ব্যাপারে! কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'বলতে চাইছি যে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখা হবে আমার তাদের সঙ্গে। তাদের বলব যে তাদের বাবা তাদের বাঁচাবার ব্যাপারে একবিন্দু সাহায্য করতে রাজি হয়নি।'

বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল আহমেদ সুদীরু। একটি কথাও বেরোল না ওর মুখ থেকে। রানা যখন ওর একটা হাত ধরে ইয়টের দিকে রওনা হলো, বাধা দিল না সে। কমোডোরকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখে গিয়েছিল রানা। ডান ভুরুটা উপর দিকে উঁচু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন কমোডোর সার্জেন্টের দিকে—বসতে বললেন না।

'তোমারও পা পিছলে গেল তাহলে, সার্জেন্ট!' সার্জেন্ট যেন তাঁর কতদিনের চেনা। 'তোমার জন্যে টোপ হিসেবে একটা বন্দীকে নিয়ে গিয়েছিল রানা। বোকার মত গিলে ফেলেছ সে টোপ। নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুদের সতর্ক করবার চেষ্টা করেছিলে তুমি?'

'ওরা আমার বন্ধু নয়, স্যার।' বলল সার্জেন্ট তিক্তকণ্ঠে।

'বেশ। তাহলে অর্ধেক সমস্যা আপনাআপনিই সমাধান হয়ে গেল।

এবার মাসুদ রানা এবং আমার সম্পর্কে দু'একটা কথা বলব তোমাকে। আমরা কি কাজে এসেছি এখানে সে সম্পর্কেও অল্পকথায় যতটা সম্ভব জ্ঞান দান করব।' দুই-তিন সেকেন্ড থামলেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'কিন্তু যদি একথা আর কারও কানে যায় তাহলে তোমার চাকরি আর পেনশন তো যাবেই, বছর কয়েক জেলও খাটতে হতে পারে। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সুদীরু। বুঝেছে সে। এবং কমোডোরের ভাবভঙ্গি দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় হয়েছে ওর। যতখানি জানালে অসুবিধে নেই ঠিক ততখানিই বললেন কমোডোর সার্জেন্টকে এবং সবশেষে বললেন, 'আশা করি এবার তোমার পূর্ণ সহযোগিতা পাব আমরা?'

'এ ব্যাপারে আমার ভূমিকা সম্পর্কে যা বললেন সেটা আপনাদের অনুমান মাত্র, স্যার।'

'ঠিক অনুমান বললে ভুল হবে, সার্জেন্ট,' বলল রানা। 'আপনি জানতেন ওই দু'জন লোক নকল কাস্টমস অফিসার, আপনি জানতেন যে ওরা ট্রান্সমিটার নষ্ট করে দিতেই এসেছিল—ক্যামেরা ছিল না ওদের কাছে, Sirrus-এর টেন্ডারে করে এসেছিলেন আপনারা সব আলো নিবিয়ে দিয়ে। কেন সাহায্য করলেন আপনি ওদের? কেন আপনার দুই ছেলের স্কুল এবং বোর্ডিং খরচের জন্যে জাকার্তার যে পোস্ট অফিসে সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রেখেছিলেন সেগুলো তুলে নেননি? কেন আপনার দুই ছেলে মারা যাওয়ার পরও নমিনি চেঞ্জ করবার প্রয়োজন বোধ করেননি ইনস্যুরেন্সের? এইসব "কেন"-র একটিমাত্র উত্তর আছে। সেটি হচ্ছে, আপনি জানেন, আপনার দুই ছেলেই বেঁচে আছে।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল সার্জেন্ট আহমেদ সুদীরু। তারপর ফিরল কমোডোরের দিকে। 'আমি জানি, আমার যা সর্বনাশ ঘটবার ঘটে গেছে। ধরা পড়লে চাকরি বজায় থাকতে পারে না আমার; যে সম্মান নিয়ে এতদিন ছিলাম আমি মাতারামে, সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে; কোথাও আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না আমার। তবু আমাকে করতে হয়েছে এই কাজ—ওদের কথা না শুনলে মেরে ফেলা হবে আমার দুই ছেলেকেই।'

একটা হাত উপরে তুলে অভয় দিলেন কমোডোর। 'তোমার চাকরি থাকবে, সম্মানও নষ্ট হবে না, ছেলেদেরও ফিরে পাবে। আমি কথা দিচ্ছি। বিনিময়ে কয়েকটা ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে আমাদের। "ওরা" বলতে কাদের বোঝাচ্ছ তুমি?'

'ক্যাপ্টেন ইমরান আর তার দলবল। মোট দশ-বারো জন আছে ওরা। রাতের অন্ধকারে আসে ওরা আমার কোয়ার্টারে। Sirrus-এ গিয়েছি শুধু দুইবার। ক্যাপ্টেন ইমরানের আদেশে।'

'ওসমান খান? তার সঙ্গে ইমরানের কি সম্পর্ক?'

'আমি ঠিক জানি না, স্যার।' অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক চাইল সার্জেন্ট। 'আমি এত ভদ্র আর এত ভাল লোক আর দেখিনি, স্যার। হয়তো বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকতেও পারে। হয়তো কুসংসর্গে পড়ে খারাপ পথে পা

বাড়িয়েছেন উনি। কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য লাগে ভাবতে…'

'সত্যি। খুব আশ্চর্যের কথা! তা তোমার কি ভূমিকা ছিল এর মধ্যে?'

'কয়েক মাস ধরে অদ্ভুত কতকগুলো ঘটনা ঘটছে মাতারামে। গায়েব হয়ে যাচ্ছে জেলেনৌকা, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আমাদের চেনাজানা কোন লোক, কোন ইয়টের ইঞ্জিন হয়তো পাওয়া যাচ্ছে ভাঙা।'

'এবং তোমার দায়িত্ব হচ্ছে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে দেয়া। এই তো? খাতা পেন্সিল নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখে নিয়ে আসবে, এমন ভাব দেখাবে যেন খুব কাজ হচ্ছে, কিন্তু কিছুই হবে না শেষ পর্যন্ত। তাই না? তোমার মত একজন চমৎকার সার্ভিস রেকর্ডওয়ালা সচ্চরিত্র পুলিস সার্জেন্ট ওদের কাছে অমূল্য সম্পদ। মাতারামে অন্তত একটি লোকও সন্দেহ করতে পারবে না তোমাকে। ঠিক লোককেই বেছে বের করেছিল ওরা। যাক, এবার বলো, ওরা আসলে করছেটা কি?'

'খোদার কসম, স্যার, আমি কিছু জানি না।'

'কিছুই জানো না?'

'না, স্যার।'

'না জানাই অবশ্য স্বাভাবিক। জানলে কিছুতেই এই রাস্তায় পা বাড়াতে না। তোমার ছেলেদের কোথায় আটকে রাখা হয়েছে সে সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই কিছুই জানা নেই তোমার?'

'না, স্যার।'

'কি করে জানলে যে ওরা বেঁচে আছে এখনও?'

'মাসখানেক আগে আমাকে Sirrus-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমার ছেলেদেরও আনা হয়েছিল ওখানে আমাকে দেখাবার জন্যে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করো যে তোমার ছেলেদের জ্যান্ত ফেরত দেবে ওরা? ওদের বিরুদ্ধে তোমার ছেলেরা হচ্ছে জীবন্ত সাক্ষী—তুমি কি মনে করো, প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই ওরা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করবে না?'

'ক্যাপ্টেন ইমরান কথা দিয়েছে, ওর কথামত কাজ করলে ছেলেদের কোন ক্ষতি করবে না। বলেছে শুধু শুধু হত্যাকাণ্ড পছন্দ করে না সে।'

'তুমি তাহলে শিওর যে খুন করা হবে না ওদের?'

'খুন! কি বলছেন, স্যার!'

'রানা?'

'জ্বি, স্যার?'

'একে দেখিয়ে নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা, স্যার।' বলল রানা।

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল সার্জেন্টের মুখ। চোখে অমঙ্গল আশঙ্কা।

'কি দেখাবেন?'

'আসুন আমার সাথে।' ডাকল রানা। কিন্তু নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। এক্ষুণি জানতে চায় সে কি দেখানো হবে তাকে। মরা ছেলের মুখ?

'কি দেখাবেন?' আবার জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট। কিন্তু একে চমকে দিয়ে পথে আনতে হবে, তাই কেউ বলল না কি দেখানো হবে। ভারী পায়ে এগোল সার্জেন্ট রানার পিছন পিছন ইঞ্জিনরুমের দিকে।

সার্জেন্টের জন্যে আধ গ্লাস ব্র্যান্ডি ঢেলে রেখেছিলেন কমোডোর। রক্তশূন্য মুখে রানার পিছু পিছু সেলুনে এসে ঢুকতেই এগিয়ে দিলেন গ্লাসটা। ওষুধের কাজ দিল ব্র্যান্ডিটুকু।

'তোমাকে বলেছি হেলিকপ্টারে করে রানা আজ সারাদিন লম্বকের দক্ষিণের সবকটা দ্বীপে ঘুরেছে।' আবার শুরু করলেন কমোডোর। 'কিন্তু শেষের অংশটুকু বলিনি। সেটা হচ্ছে সাউলানে পৌঁছবার পর গুলি করে হত্যা করা হয়েছে পাইলটকে। গত পরশুদিন আরও দু'জন এজেন্টকে খুন করা হয়েছে। এবং এখন তো দেখেই এলে নিজের চোখে। এখনও কি তুমি বিশ্বাস করো যে এরা কয়েকজন অ্যামেচার ভদ্রলোক সামান্য দু'একটা বে আইনী কাজ নিয়ে চোর চোর কিংবা লুকোচুরি খেলছে?'

'আর কিছুই বলতে হবে না, স্যার, আমি বুঝে গিয়েছি। আমাকে কি করতে হবে, বলুন এখন। আমার সাধ্যমত...'

এইবার কথা বলল রানা। কারণ পুলিস সার্জেন্টকে কিভাবে কোন্ কাজে সে ব্যবহার করতে চায়, সময়াভাবে বলা হয়নি কমোডোরকে। কমোডোরের দৌড় শেষ।

'প্রথম কাজ, আমি আর আপনি ওজন আলীকে থানায় নিয়ে যাব। এদের বিচারের জন্যে অফিশিয়াল পোস্ট মর্টেমের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় কাজ, রেডিও ট্রান্সমিটার অপারেট করতে পারে এমন একজন বিশ্বস্ত লোক জোগাড় করে দিতে হবে আমাকে। তৃতীয় কাজ, সোজা Sirrus-এ গিয়ে ইমরানকে বলবেন ওজন আলীর লাশ এবং এই আহত জার্মান ইহুদিটাকে থানায় দিয়ে এসেছি আমরা। বলবেন, আমাদের বলতে শুনেছেন বান্‌জুয়াঙ্গি পোর্টে যাচ্ছি আমরা, সেখান থেকে মিলিটারি নিয়ে ফিরব দুই-তিন দিনের মধ্যে। এবং চতুর্থ কাজ হচ্ছে যদি প্রাণে বাঁচতে চান, তাহলে আজই রাতে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে আগামী ছত্রিশ ঘন্টার জন্যে মাতারাম থেকে উধাও হয়ে যাবেন, যেন কোথাও খুঁজে না পাওয়া যায় আপনাদের। বুঝতে পেরেছেন?'

'কি করতে হবে বুঝলাম, কিন্তু কেন করতে হবে বুঝলাম না।' বলল পুলিস সার্জেন্ট।

'সেটা এখন না বুঝলেও চলবে। যা বলছি তাই করুন—আগামী পরশুদিন আপনার দুই ছেলেকেই ফেরত পাবেন।'

'পরশুদিন! সে কি করে সম্ভব?' বলল সার্জেন্ট।

'মেজর মাসুদ রানার পক্ষে অসম্ভব নয়, সার্জেন্ট।' বললেন কমোডোর। 'তুমি চেনো না ওকে, ওর সম্বন্ধে জানার সুযোগ হবে না তোমার কোনদিনই। গর্ব করে কাউকে বলতেও পারবে না যে তুমি একে দেখেছ। কিন্তু অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট না থাকলে এই কথাটা বলেই যে কোন ইন্দোনেশিয়ান সিক্রেট এজেন্টকে তাক লাগিয়ে দিতে পারতে তুমি। এ কাজ কারও পক্ষে

যদি সম্ভব হয়, সে হচ্ছে, মেজর মাসুদ রানা।'

বেশ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে রইল সার্জেন্ট, তারপর মাথা ঝাঁকাল সে কয়েকবার। বলল, 'আমারও তাই বিশ্বাস, স্যার।'

সাত

তিনজন এল ওরা। রাত বারোটায় নয়, নির্ধারিত সময়ের একঘণ্টা আগেই। এগারোটায়।

ইয়ট চালনার দায়িত্ব নিয়েছেন কমোডোর জুলফিকার। তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করছে ফজল সুদীরু। নিজের ছেলে ছাড়া হাতের কাছে বিশ্বস্ত রেডিও অপারেটার আর পায়নি সার্জেন্ট আহমেদ সুদীরু। ছোট ভাই দু'জন বেঁচে আছে, এবং তাদের উদ্ধার করে আনবার কাজে তার সাহায্য দরকার শুনেই ধনুকে পরানো ছিলার মত টান হয়ে গেছে ফজল সুদীরু। উৎসাহ উদ্দীপনার জ্যোতি ফুটে উঠছে ওর বিষণ্ন মুখে।

সার্জেন্টকে Sirrus-এর দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে ফজলের সাহায্যে একজন বৃদ্ধ কেমিস্টকে ঘুম থেকে তুলেছে রানা। প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ এবং পরে ধমক-ধামক দিয়ে একটা বিশেষ ট্যাবলেট ওদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করেছে। সব কাজ সেরে কর্ণফুলীতে ফিরেছে ওরা মিনিট দশেক হলো। সরিয়ে আনা হয়েছে ইয়টটাকে ঘাট থেকে। এবার রওনা হবে ওরা সাতু লাগির দিকে।

কলঙ্কের মত কালো রাত। কোথাও কোন আলোর চিহ্ন নেই।

আলো না জ্বেলে লম্বক প্রণালী থেকে বেরিয়ে যাবে মনে করেছিল রানা। কিন্তু জ্বালতেই হলো। কারণ ফজলের নাইট গ্লাসে ধরা পড়েছে একটা বোট।

জ্বলে উঠল কর্ণফুলীর সার্চলাইট। আলোটা ডান দিক থেকে তিরিশ ডিগ্রি বাঁয়ে ঘুরতেই দেখতে পেল রানা বোটটা। দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে সেটা ইয়টের দিকে। পঞ্চাশ গজ দূরে।

পরিষ্কার চিনতে পারল রানা কায়েসকে। পিছনের গলুইয়ে বসে আছে সে এদিকে মুখ করে। ওর প্রিয় স্মাইযার সাব-মেশিনগানটা কোলের উপর রাখা। মাঝে বসে এদিকে পিছন ফিরে দাঁড় বাইছে যে লোকটা তার প্রকাণ্ড কাঁধ দেখেই চেনা গেল—মিসির। আর সামনের গলুইয়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে কুঁজো হয়ে রয়েছে যে লোকটা, সে নিশ্চয়ই দাউদ। চকচক করছে ওর হাতের পিস্তলটা। ক্যাপ্টেন ইমরান পাঠাবে এদের—বলেছিল এমালি। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই এসে পড়েছে এরা।

এমালি এসে দাঁড়িয়েছে রানার পাশে। রানার কথামত যতক্ষণ ঘাটে দাঁড়িয়েছিল কর্ণফুলী ততক্ষণ দরজা বন্ধ করে নিচের কেবিনে ছিল সে। ইয়ট

ছেড়ে দেয়া হয়েছে দেখে উঠে এসেছে উপরে।

'আপনি সেলুনে গিয়ে বসুন।' বলল রানা এমালিকে। 'এখন একটু-আধটু গোলাগুলি চলতে পারে।' গেল কি গেল না দেখবার সময় নেই। তিন ব্যাটারির Ray-O-Vac টর্চটা বাম হাতে নিয়ে কমোডোরকে বলল, 'সোজা নৌকোর ওপর চড়িয়ে দিন, স্যার। বাকিটুকু আমি করব।'

'অলরাইট মাই বয়, অলরাইট!' খুশি হয়ে উঠেছেন কমোডোর বহুদিন পরে আবার যুদ্ধের সুযোগ পেয়ে। হুইলটা এমনভাবে ধরেছেন যেন ওটা একটা খেলনা ওঁর কাছে।

ঘণ্টায় তিন কি চার মাইল বেগে চলেছে কর্ণফুলী। আর পঁচিশ গজ দূরে নৌকোটা। সার্চলাইটের তীব্র আলো সহ্য করতে না পেরে এক হাত উঠিয়ে চোখ ঢেকেছে কায়েস আর দাউদ। দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল মিসির। দিক পরিবর্তন না করলে দশ ফুট দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে কর্ণফুলী। সার্চলাইটটা বোটের উপর স্থির রাখল ফজল। পিস্তলটা হাতে নিয়ে ইয়টের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

আর বিশ গজ। সাব-মেশিনগান তুলল কায়েস সার্চলাইটের দিকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে পুরো থ্রটল দিয়েই হুইল ঘুরিয়ে হার্ড অ্যাপোর্ট করলেন কমোডোর। ডিজেলের একজস্ট থেকে গম্ভীর আওয়াজ পাওয়া গেল, হঠাৎ স্পীড বেড়ে গেল ইয়টের। তেরছাভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এখন বোটের দিকে।

একরাশ গুলি বেরিয়ে গেল কায়েসের স্মাইযার থেকে। কোন কোনটা লাগল এসে অ্যালুমিনিয়াম ফোরমাস্টের গায়ে—বেশির ভাগই আশপাশ দিয়ে চলে গেল। সার্চলাইট অক্ষতই রইল। কি ঘটতে চলেছে টের পেয়েই দাঁড় দুটো নিচু করে থামাবার চেষ্টা করল মিসির নৌকোটা। দেরি হয়ে গেছে তখন। এবার হুইলটা মিডশিপ করেই থ্রটল লিভার নিউট্রাল করে দিলেন কমোডোর।

উল্টে গেল নৌকা জোর ধাক্কা খেয়ে। পানিতে লাফিয়ে পড়ল তিনজন। একটু পরেই ভেসে উঠল নৌকোর উল্টানো পিঠ, আশেপাশে উঠল তিনটে মাথা। সার্চলাইটের আলো পৌঁছুচ্ছে না এখানে।

টর্চ জ্বালল রানা। কায়েস। সাব-মেশিনগানটা মাথার উপর তুলে ধরে শুকনো রাখবার চেষ্টা করছে সে। টর্চের আলোর রশ্মি বরাবর লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপল রানা পর পর দুইবার। স্তব্ধ হয়ে গেল কায়েসের হাত-পা নাড়া! লাল হয়ে গেল খানিকটা সমুদ্রের পানি। মাথাটা তলিয়ে গেল পানির তলায়, স্মাইযার ধরা হাতটা এখনও পানির উপরে। সরে গেল টর্চের আলো। দাউদকে দেখা গেল কেবল, মিসির নেই। হয় ডুব দিয়ে কর্ণফুলীর নিচে চলে এসেছে সে, না হয় উল্টানো নৌকোটার তলায় আশ্রয় নিয়েছে। টর্চের আলো লক্ষ্য করে রিভলভার তুলেছে দাউদ। দ্রুত আরও দু'বার গুলিবর্ষণ করল ওয়ালথার পি. পি. কে। চিৎকার করে উঠল দাউদ। বীভৎস দেখাচ্ছে ওর মুখের চেহারাটা। তিন চার সেকেন্ড পরে হঠাৎ থেমে গেল আর্তনাদ। মাথাটা চলে গেছে পানির নিচে। বুদ্বুদ উঠল কয়েকটা। এদিকে ওদিকে মিসিরকে

খুঁজল রানার টর্চের আলো। নেই। বেশ খানিকটা দূরে সরে এসেছে কর্ণফুলী। চারদিকে সার্চলাইট ফেলে খুঁজল ফজল সুদীরু। কালিমাখা সমুদ্র কেবল—বোটটাও দেখা যাচ্ছে না আর।

রানার দুইহাত দূরে ককিয়ে উঠল কে যেন। এমালি। সবার অজান্তে চলে এসেছিল সে ডেকের উপরে। নিজের চোখে দুই দুইটা খুন করতে দেখেছে সে রানাকে। দেখেছে দাউদের বীভৎস মুখের চেহারা। দুইহাতে বুক চেপে বসে পড়েছে ডেকের উপর। হুইল হাউসে নিয়ে এল রানা ওকে। বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে। আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠছে সে তখন।

'এবার আমাকে দিতে পারেন, স্যার।' বলল রানা। 'লম্বক স্ট্রেট পার করে দিতে পারব আমি। সুরাংদ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে আপনাকে ইয়টের পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ওসব জায়গায় ইয়ট চালানো আমার কর্ম নয়। আপনি ততক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিন, স্যার।'

'ঠিক বলেছ, রানা।' খুশি হয়ে সরে এলেন কমোডোর। 'কিন্তু তুমি জানলে কি করে? তুমি আমার খবর রাখো তাহলে? সেই যে মেডিটেরেনিয়ানে বুকে গুলি খেয়েছিলাম এম. ভি. রুস্তমের ডাইনিং হলে—ওটা আছে এখনও। ঠিক এইখানটায়।' আঙুল দিয়ে দেখালেন তিনি জায়গাটা। 'বের করা যায়নি। কিন্তু একটু উত্তেজিত হলেই বুকে ব্যথা পাই। টনটন করে। অবশ্য একটু বিশ্রাম নিলেই আবার সেরে যাবে। যাক, শূটিং কমপিটিশনের স্কোর কি হলো?'

'কায়েস আর দাউদকে আউট করে দিয়েছি, স্যার। মিসির ভেগেছে।'

'আহ্-হা,. সৎসাহস নেই ব্যাটার। কিন্তু স্কোর নেহাত খারাপ নয়, রানা। ভালই বলতে হবে। অন্তত চলনসই তো বটেই। মিসিরের জন্যে দুঃখ কোরো না, আবার চান্স পাবে। এখন আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করবে নাকি আবার ব্যাটারা?'

'না, স্যার। Sirrus-এর কেউ এখনও জানে না কি ব্যাপার ঘটেছে। ওরা টের পেতে পেতে অনেকটা দূরে সরে যাব আমরা। আর দুই-দুইটা আক্রমণ বিফল হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় আক্রমণ একটু চিন্তা-ভাবনা করে ধীরেসুস্থেই করবে ওরা। তাছাড়া ধাওয়া করবে কি নিয়ে? Sirrus নিয়ে নিশ্চয়ই নয়? টেন্ডারটাকে পাঠাতে পারত, কিন্তু ওটা একশো গজের বেশি এক গজও এগোতে পারবে না। পারলে চিনির উপর থেকে সব শ্রদ্ধা আমার নষ্ট হয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকালেন কমোডোর! বললেন, 'তাছাড়া কুয়াশা পড়ছে। আমাদের খুঁজেই পাবে না ওরা।'

হুইল হাউসটা অন্ধকার ছিল, কম্পাস ল্যাম্প থেকে আলো আসছিল সামান্য, হঠাৎ জ্বলে উঠল উজ্জ্বল ওভারহেড লাইট। ঝট করে ঘুরে এমালি খানের হাতটা দেখতে পেল রানা সুইচের উপর। বিধ্বস্ত চেহারা এমালির। চোখদুটো বসে গেছে আরও। বেড়ালের বমি মানুষ যে দৃষ্টিতে দেখে ঠিক সেই দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার মুখের দিকে। তীব্র ঘৃণায় খানিকটা

কুঁচকে আছে নাক।

'কি ধরনের লোক আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা?' খশখশে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল এমালি। 'আপনি মানুষ, না কি? দুই দুইজন লোককে খুন করে এখন নিশ্চিন্তে বসে বসে গল্প করছেন! জল্লাদের মত নির্বিকার—যেন কিছুই হয়নি! মন বলতে কি কিচ্ছু নেই আপনার? কোন অনুভূতি নেই, কোন অনুশোচনা হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। মিসিরকেও খুন করতে পারলাম না বলে বড্ড অনুশোচনা হচ্ছে আমার।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এমালি রানার মুখের দিকে। তারপর ফিরল কমোডোরের দিকে। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি, কমোডোর। বীভৎস সে-মুখের চেহারা। মাসুদ রানা ওদের অ্যারেস্ট করতে পারতেন, পুলিসে দিতে পারতেন, কিন্তু··· কিন্তু···তা না করে খুন করেছেন উনি ওদের। কেন?'

'এর মধ্যে কোন "কেন" নেই, মিসেস···' থমকে থামলেন কমোডোর, তারপর বললেন, 'এমালি রুসমান। রানা ওদের খুন না করলে ওরা আমাদের খুন করত। খুন করতেই এসেছিল ওরা। আপনি নিজেই বলেছেন আমাদের সেকথা। বিষাক্ত কোন সাপ মেরে কি আপনার অনুশোচনা হবে? ব্ল্যাক উইডো স্পাইডারকে জুতো দিয়ে মাড়ালে কি পাপ হয়?' ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন কমোডোর। 'আমাদের এই খেলায় মাঝামাঝি কোন রাস্তা নেই। শত্রুপক্ষকে বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়া যাবে না। দিয়েছিলাম বলেই একবার গুলি খেয়েছিলাম বুকে, রানা না থাকলে মারাই যেতাম।'

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কমোডোর জুলফিকারের মত দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর এই ধরনের মন্তব্য শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল এমালি। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে একবার রানার দিকে চেয়ে নিচে নিজের কেবিনে চলে গেল সে। অদ্ভুত এইসব লোক, অদ্ভুত এদের কথাবার্তা, চালচলন।

রাত সাড়ে বারোটায় আবার এল এমালি। ওভারহেড বাতিটা জ্বেলে দিল সে হুইল হাউসে ঢুকেই। সামলে নিয়েছে সে অনেকটা। চুলগুলো পরিপাটি। আতঙ্কিত ভাবটা চলে গেছে মুখের উপর থেকে। মুখে হালকা প্রসাধন। হালকা নীল শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। চমৎকার লাগছে দেখতে। রানার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল সে। রানা গম্ভীর।

'লাইট নিবিয়ে দিন।' ধমকে উঠল রানা। 'এমনিতেই কুয়াশার জন্যে কিছু দেখা যাচ্ছে না সামনে, এই লাইট জ্বেলে কানা করে দিতে চান? আর কিছুক্ষণ পরই ইয়ালু দ্বীপের পাশ দিয়ে যেতে হবে আমাদের সুরাংদ্বীপের দিকে। অসংখ্য ডুবো, আধ-ডুবো পাহাড় আছে এদিকটায়। ওগুলোর একটার ওপর চড়িয়ে দিলেই বারোটা বেজে যাবে।'

'সরি।' নিবে গেল লাইটটা। 'আমি বুঝতে পারিনি।'

'আপনার কেবিনেও আলো জ্বালবেন না। ডুবো পাহাড়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর শত্রু আছে আমাদের আশেপাশে—তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না

আমরা।'

'আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা। না বুঝে কটু কথা বলেছি আমি আপনাকে। খুব আচমকা ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল আমার। ভেবে দেখলাম, আপনাকে বিচার করবার কোন অধিকার আমার নেই। দুই দুইজন মানুষকে হত্যা করবার পরও আপনার মধ্যে কোন বিকার নেই দেখে অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক বলে মনে হওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ভেবে দেখলাম...'

'দু'জন নয়, তিনজন।' বললেন কমোডোর। 'Sirrus-এ যাবার আগে আরেকটাকে মেরে রেখে গিয়েছিল রানা। কিন্তু খুনী বলা যাবে না ওকে কিছুতেই। কারণ, এ ছাড়া উপায় ছিল না ওর। প্রত্যেকটা খুন করবার পর আবার যদি অনুশোচনা আর বিকারকে প্রশ্রয় দিতে হত তাহলে পাগল হয়ে যেত ও। ভুলেও মনে করবেন না যে খুন করবার আনন্দে খুন করে মাসুদ রানা। অনন্যোপায় হলেই করে। অন্যায়কে দমন করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে। প্রয়োজন হলে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় সে অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে। পারবেন আপনি? পারবে আর পাঁচজন সাধারণ লোক?'

'তাছাড়া খুব দয়ালু বলেও নামডাক আছে আমার।' বলল রানা। 'সেটা বাদ দিলেন কেন, স্যার?'

'কিছু মনে কোরো না, রানা,' বললেন কমোডোর। 'তোমাকে লজ্জায় বা সঙ্কোচে ফেলবার জন্যে কথাগুলো বলিনি আমি। মিসেস...মানে, এমালি রুসমান যদি ভুলভাবে নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাফ চাওয়ার জন্যে উপরে উঠে আসতে পারেন, তাহলে ওঁর ভুল শুধরে দেয়া আমাদের উচিত।'

'উনি শুধু মাফ চাওয়ার জন্যে ওপরে ওঠেননি, স্যার।' বলল রানা। 'উনি আসলে মেয়েলি কৌতূহলের তাড়নায় এসেছেন এখানে। উনি আসলে জানতে চান আমরা চলেছি কোথায়।'

এমালির মৃদু হাসির শব্দ পাওয়া গেল।

'ঠিক বলেছেন। কৌতূহল ঠিকই। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি, আমি জানি। একটু আগে আপনিই বলেছেন সুরাংদ্বীপে যাচ্ছি আমরা। আর এ-ও জানি, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে। আমি আসলে জানতে চাই, কি সেটা? কেন Sirrus-এ আনাগোনা করেছে বিচিত্র কতকগুলো লোক, কেন এই খুনখারাবি, কি এমন জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিয়েছে যাতে করে তিন তিনজন মানুষকে খুন করে ফেলা অন্যায় নয়? আপনারাই বা কি করছেন এখানে? আপনি নেভির কমোডোর, মাসুদ রানা কে? আমি নিজেও জড়িয়ে পড়েছি এর মধ্যে। প্লীজ। সবটা ব্যাপার জানার অধিকার আছে আমার।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' বললেন কমোডোর। 'দু'দিন আগে পরে তো কিছুই এসে যায় না। দু'দিন পর সমস্ত পৃথিবী জানতে পারবে যখন, দু'দিন আগে আপনাকে বলতে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? আপনাকে বললে আমাদের কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কি বলো, রানা?'

'আমি আর কি বলব, স্যার। ওঁকে যদি কিছু বলেন তাহলে আপনার

আদেশ আপনি নিজেই অমান্য করবেন। আমাদের চুনোপুঁটির তাতে কি বলার থাকতে পারে?'

'গাল-চালাকি কোরো না, রানা। তুমি ভাল করেই জানো এই অ্যাসাইনমেন্টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার—আমি হঠাৎ এসে পড়ে ফেঁসে গেছি। আমি এখন এই ইয়টের ড্রাইভার মাত্র। তাহলে কি নিষেধ করছ বলতে?'

'না, স্যার। আমি বলছিলাম, ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের মীটিং-এ আপনার প্রত্যেকটা পিলে-চমকানো বক্তৃতায় আপনি অফিশিয়াল সিক্রেটের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করেন সবাইকে; এখন নিজেই ফাঁস করে দিচ্ছেন, এই আর কি! যাক, বলুন স্যার, আমিও শুনি গল্পটা।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে নাটকীয়ভাবে শুরু করলেন কমোডোর।

'তিন জাহাজের কাহিনী এটা, মিসেস···দূর ছাই, এমালি বলেই ডাকব তোমাকে। বন্ধুপত্নী হলে কি হবে, আমার মেয়ের বয়সী তুমি আসলে। শোনো এবার—ভারত মহাসাগর থেকে হারিয়ে গিয়েছে তিনটে জাহাজ। সেই তিনটে জাহাজ নিয়েই এই গল্প।

'এস. এস. পিন্টো নামে একটা জাহাজ সাউথ আফ্রিকার ডারব্যান থেকে কলম্বো হয়ে অস্ট্রেলিয়ার ফ্রী-ম্যান্টলের দিকে যাচ্ছিল। ষাট কোটি টাকা দামের আনকাট ডায়মন্ড ছিল ওই জাহাজের স্ট্রংরুমে। গত ১০ এপ্রিল হারিয়ে গেছে জাহাজটা ভারত মহাসাগর থেকে। ব্যাপারটা যে ডাকাতি তা বোঝা গেল তিনদিন পর সব কয়জন নাবিককে পাওয়া যেতেই। নির্জন এক দ্বীপে বন্দী করে রাখা হয়েছিল ওদের দুই দিন। আজ পর্যন্ত এস. এস. পিন্টোকে পাওয়া যায়নি কোথাও। গত ১৫ জুন অস্ট্রেলিয়ার ফ্রী-ম্যান্টল বন্দর থেকে রওনা হওয়া একটা সোনা বোঝাই জাহাজ এম. ভি. ইভিনিং স্টারে ডাকাতি হলো। প্রায় তিরিশ কোটি টাকার গোল্ড বার ছিল ওটার স্ট্রংরুমে। এবারও একই ব্যাপার ঘটল। নাবিকদের অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল তিনদিন পর অন্য এক দ্বীপে। কিন্তু জাহাজ পাওয়া গেল না। এবং সবশেষে ডাকাতি হলো ট্রাইটন নামে একটা ফ্রেটারে গত ১৮ জুন। করাচী থেকে সিডনী যাচ্ছিল সেটা প্রায় তেত্রিশ কোটি টাকার হাই কোয়ালিটি পাকিস্তানী এমারেল্ড নিয়ে।'

চুপচাপ খানিকক্ষণ সিগারেট টেনে বিশ্রাম নিলেন কমোডোর। তারপর আবার আরম্ভ করলেন। 'আমরা কেন ইন্টারেস্টেড সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—এমারেল্ডগুলো আমাদের, প্রথম দুটো ডাকাতির কথা জানতে পেরেই আমরা সতর্ক হয়ে গেলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে অত্যন্ত শক্তিশালী একদল জলদস্যু গজিয়ে উঠেছে, সংবাদ সংগ্রহের জন্যে চমৎকার নেট-ওয়ার্ক আছে ওদের চারদিকে। আমাদের এমারেল্ডের ওপরও নজর থাকতে পারে ওদের। ব্যাপারটা এল ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের হাতে। অর্থাৎ আমার হাতে।'

'এই ব্যাপারে আপনারা ক্যাপ্টেন ইমরান বা ওসমানকে সন্দেহ করছেন নাকি?'

'সন্দেহের কথায় পরে আসা যাবে, এখন গল্পটা শুনে যাও। বিরাট ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি মাসুদ রানার সাহায্য চাইলাম। রানা আসলে

আমার ডিপার্টমেন্টের লোক নয়। আর্মি, নেভি এবং এয়ার-ফোর্সের কয়েকজন বাছাই করা সেরা লোককে নিয়ে একটা সংস্থা আছে আমাদের ঢাকায়। যে কোন ডিপার্টমেন্ট সাহায্য চাইতে পারে এদের কাছে। মেজর মাসুদ রানা ঢাকা হেড-অফিসের চীফ এজেন্ট। আমি ওকে চেয়ে বসলাম ওর বসের কাছে...'

'কেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করল এমালি।

'কারণ ওর সম্পর্কে আমি অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করি। কেবল ক্ষুরধার বুদ্ধি নয়, ভদ্রতা বলো, সাহস বলো...'

'গল্পটা বলুন, স্যার।' বাধা দিল রানা। 'কেন শুধু শুধু একজন ভদ্রমহিলার সামনে লজ্জা দিচ্ছেন? যদি কিছু অন্যায় করে থাকি...'

'এই দ্যাখ, কি লাজুক ছেলে! গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়েই আমার হাতে হুইলের ভার দিয়ে ওই আড়ালে গিয়ে সিগারেট ফুঁকতে চায়।' রানা ভাবল ও বাবা, এ দেখছি JMTT—জাতে মাতাল তালে ঠিক! 'যাক, এ ছেলে তো করাচী এসে সব শুনেই প্ল্যান ঠিক করে ফেলল। ওরই পরামর্শে লেফটেন্যান্ট রাশেদ আর খলিল গযনভি বলে দু'জন হাইলি ট্রেনড এজেন্টকে গোপনে তুলে দেয়া হলো Triton-এ রেডিও সিগন্যাল ট্রান্সমিটার সাথে দিয়ে। ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কাউকে জানানো হলো না এদের উপস্থিতির কথা। একটা বিশেষ ফ্রীকোয়েন্সিতে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করবে ওরা নির্দিষ্ট সময়ে। ঠিক হলো জাভার কাছাকাছি এসে অপেক্ষা করবে রানা এবং নেভির একজন বিশ্বস্ত সাব-লেফটেন্যান্ট ওজন আলী।'

'তাই তো, মিস্টার আলীকে তো দেখছি না?' বলল এমালি।

'বলছি। ১৮ জুন যেই জলদস্যুরা Triton দখল করে নিল অমনি ট্রান্সমিট করতে আরম্ভ করল রাশেদ আর খলিল। আধঘণ্টা পর পর সিগন্যাল আসতে থাকল। রওনা হলো কর্ণফুলী। Triton-কে অনুসরণ করবার কোন দরকার হলো না—কোর্সে অলটারেশন দেখেই ইন্টারসেপশন পয়েন্ট বের করে নিয়ে সেদিকে চলল কর্ণফুলী। ক্রিসমাস আয়ল্যান্ড বাঁয়ে রেখে যখন পূর্ব দিকে রওনা হলো Triton তখন জাকার্তার কাছে পৌঁছে অপেক্ষা করছে কর্ণফুলী। কিন্তু আরও অনেক পুবে এগিয়ে গেল Triton; কর্ণফুলীও চলল দুশো মাইল দূরে দিয়ে সমান্তরালভাবে। বালিদ্বীপের দক্ষিণে এসে হঠাৎ কোর্স চেঞ্জ করে সোজা উত্তর দিকে এগোল Triton, অর্থাৎ সোজাসুজি কর্ণফুলীর দিকে। সিগন্যাল আসছে তখনও নিয়মিতভাবে। কাজেই লম্বক প্রণালীতে ঢুকে পড়ল কর্ণফুলী। এমনি সময় বন্ধ হয়ে গেল সিগন্যাল। বেলা বারোটার পরে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি রাশেদ বা খলিলের।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন কমোডোর। গলাটা ভারী হয়ে আসছিল, বোধ হয় সামলে নেয়ার জন্যে থামলেন।

'কি করে ধরা পড়ল বলতে পারি না। অসাবধানতার জন্যেই হোক কিংবা কেউ হঠাৎ দেখে ফেলায়ই হোক, ধরে ফেলল ওরা ওদের। লম্বকের দিকে এগোচ্ছিল Triton, সন্ধ্যার দিকে প্রণালীর মুখে এসে পৌঁছবার কথা।

সেই আন্দাজ করে মাতারাম বন্দরের কাছাকাছি কর্ণফুলীকে নোঙর করে রাবারের ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। ঠিক লম্বক প্রণালীর মুখের কাছে দাঁড়িয়েছিল নোঙর করা Triton, পানির তলা দিয়ে গিয়ে জাহাজে উঠে ঘুরে ফিরে দেখে এল রানা। নাম, ফ্ল্যাগ আর গায়ের রঙ পাল্টে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু জাহাজটা যে Triton সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না ওর।

'পরের দিন ঝড়-বৃষ্টির জন্যে মাতারামেই আটকা পড়ল রানা, কিন্তু তারপরের দিন, অর্থাৎ গতকাল সকালে হেলিকপ্টারে করে এয়ারসার্চের ব্যবস্থা করল ও। ওর ধারণা ছিল নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও পাওয়া যাবে Triton-কে, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। অনেক ঘোরাঘুরির পর ওর ধারণা হয়েছে সুরাং কিংবা মালাদ্বীপের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে আমাদের সব সমস্যার সমাধান। তাই খুঁজতে চলেছি আমরা। বের করতেই হবে, যেমন করে হোক উদ্ধার করতেই হবে আমাদের তেত্রিশ কোটি টাকার এমারেল্ড। ব্যস, এখানেই আমার গল্প শেষ। রানা, এবার খানিকটা বিশ্রাম করে নাও, আমি হাল ধরছি।'

'কিন্তু…কিন্তু…সবটা তো বললেন না, কমোডোর? মিস্টার আলী… মিস্টার ওজন আলী কোথায় গেলেন? আর মাসুদ রানা Triton-এ গিয়ে…'

'সব কথা নাই বা শুনলে, এমালি। শুধু শুধু মন খারাপ হবে তোমার।'

'আমি আপনার মেয়ের বয়সী হতে পারি, কিন্তু কচি খুকি নই, কমোডোর। এতসব ঘটনার পর যে কোন খবর সহ্য করতে পারব আমি।'

'বেশ। শুনবেই যদি, শোনো।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কমোডোর। 'Triton-এ উঠে রাশেদ আর খলিলকে মরা পেয়েছিল মাসুদ রানা। ওদের দু'জনকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে। গত সন্ধ্যায় হেলিকপ্টারের পাইলটকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তার ঘণ্টা দুয়েক পরেই ওজন আলীকে আবিষ্কার করা হয়েছে কর্ণফুলীর ইঞ্জিন-রূমে। অমানুষিক শক্তিশালী কোন লোক ঘাড় মটকে খুন করেছে ওজন আলীকে।'

দুই মিনিট আর একটি কথাও বলল না কেউ। তারপর কাঁপা কাঁপা ফ্যাসফেঁসে গলায় এমালি বলল, 'আশ্চর্য! পাষণ্ড এরা। পিশাচ!' আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার বলল, 'কিন্তু… কিন্তু…এত ভয়ঙ্কর দস্যুদলকে ঠেকাবেন কি করে?'

'আমি তো ঠেকাব না। কমোডোর মানুষ আমি, মারামারি করতে যাব কেন? খেপেছ? আমি শুধু অর্ডার দেব, রানা ঠেকাবে। যাও রানা, বিশ্রাম করে একটু শক্তি সঞ্চয় করে নাও গিয়ে।'

সেলুনে নেমে এসে প্রথমেই সিগারেট ধরাল রানা। তারপর সটান শুয়ে পড়ল বড় সোফাটায়। পা দুটো বেরিয়ে রইল বাইরে। রানা ভেবেছিল, কেবিনে চলে যাবে এমালি। কিন্তু তা না করে মাথার কাছে একটা সোফায় বসে পড়ল সে। চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল

এমালি, 'কিভাবে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে চাইছেন, মিস্টার মাসুদ রানা? কি করতে চান?'

'আপনি দেখছি তথ্য আদায় করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। অত্যন্ত সিক্রেট মিশনে চলেছি আমরা। টুঁশব্দ করা নিষেধ। দেখলেন না, একটি কথাও ফাঁস করলেন না কমোডোর জুলফিকার?'

'আপনি ঠাট্টা করছেন! আপনি ভুলে যাচ্ছেন এই গোপন মিশনে আমিও জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে।'

'ভাগ্যিস জড়িয়েছেন। নইলে বড্ড কর্কশ, পুরুষালী হয়ে যেত মিশনটা। তাছাড়া আপনার সাহায্য আমার দরকার হবে।'

'আমি কি আর সাহায্য করতে পারব? কমোডোরের কথা শুনে মনে হলো কারও সাহায্যের দরকার নেই আপনার, আপনি একাই একশো।'

'উনি বাড়িয়ে বলেছেন। স্নেহের আতিশয্যে।'

'কেবল স্নেহ নয়, নির্ভরতাও আছে। যে কোন ব্যাপারে আপনার উপর চোখ বুজে নির্ভর করতে দ্বিধা করবেন না উনি। সেইসাথে আছে গভীর বিশ্বাস। রীতিমত শ্রদ্ধা...'

হেসে উঠল রানা, সশব্দে।

'হাসছেন কেন?'

'হাসছি, যে যাই বলে তাই আপনি বিশ্বাস করেন দেখে।'

'কি রকম?'

'আপনার কি একবারও মনে হয়নি, উনি নিজেকে যতই তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করুন না কেন, যতই অন্য কারোর গুণকীর্তন করুন না কেন, মানুষটা আসলে উনি পাক্কা ঘুঘু। ভুলে গেছেন যে উনি ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের বাঘা চীফ, আর আমি একজন সাধারণ অপারেটার? শুধু শুধুই উঠেছেন উনি অত উপরে? শুধু শুধুই নাম করেছেন দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, দুর্দান্ত এবং সেই সাথে ক্ষুরধার বুদ্ধিমান দেশপ্রেমিক হিসেবে? ওঁর কথা বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি আপনার। হয়তো স্নেহ করেন উনি আমাকে, হয়তো বিশ্বাস করেন—কিন্তু চোখ বুজে নির্ভর কখনোই করেন না। চোখটা সর্বক্ষণ খোলা আছে বলেই আমাদের সবার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পেয়েছেন উনি। ওঁর আন্ডারে কোন অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করতে পারা আমরা সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি।'

'আশ্চর্য! অদ্ভুত বিনয়ী লোক তো!'

'কে?'

'আপনারা কিছুতেই নিজের প্রশংসা নিজে করবেন না। যাক, মালাদ্বীপেই কি নামতে হবে আমাদের?'

'মালাদ্বীপেই নামব, কিন্তু পরে। আগে সুরাংদ্বীপটা দেখে তারপর যাব আমরা মালাদ্বীপে। কাল চলে যাব বানজুয়্যাঙ্গি। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস সব সমস্যার সমাধান আছে এই সুরাং আর মালাদ্বীপেই।'

কিছু বলল না এমালি। চুপচাপ কাটল দুই মিনিট। চমৎকার একটা সেন্টের মাদক সুবাস আসছে এমালির গা থেকে। স্ত্রী-লোকের মন বোঝা

ভার। পালিয়ে এসেছে Sirrus থেকে, কিন্তু তার আগে পোঁটলা গুছিয়েছে। জামা-কাপড়ের সঙ্গে একটা সেন্টের শিশি নিতেও ভোলেনি।

'রানা!' কোমল খশখশে কণ্ঠ এমালির। রানার চুলের মধ্যে প্রবেশ করল ওর একটা হাত। শিউরে উঠল রানা।

'মম্?'

'মাফ চাইছি। সত্যিই দুঃখিত আমি। তোমাকে না বুঝে কটু কথা বলেছি। রাশেদ, খলিল, ওজন আলী আর পাইলটের কথা আমি জানতাম না। আঘাত দিয়েছি আমি তোমাকে। প্লীজ, মাফ করে দাও আমাকে। আমি অনুতপ্ত।'

উঠে এসে কার্পেটের উপর হাঁটু গেড়ে বসল এমালি। খুব কাছে। নিঃশ্বাস এসে লাগছে রানার গলায়। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল রানার। কেমন যেন ঘোলা লাগছে সবকিছু। মনটা স্থির থাকতে চাইছে না কিছুতেই।

'কফি করে নিয়ে আসি এক কাপ?' জিজ্ঞেস করল এমালি।

'চমৎকার প্রস্তাব। নিয়ে এসো। কিন্তু আলো জ্বালতে পারবে না কফি করতে গিয়ে।' বলল রানা। ওকে দূর করতে পারলে যেন বাঁচে সে। এমালি চলে যেতেই ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল যেন সে আবার।

প্রায় বিশ মিনিট লাগল এমালির কফি তৈরি করতে। দেরি দেখে মনে মনে হাসল রানা। কিন্তু কাপ-তশতরির ঠুনঠুন আওয়াজ পেয়ে খুশি না হয়েও পারল না সে।

আফটার কেবিনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। মৃদু টোকা দিল দুটো।

'কে?' ফজল সুদীরুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল ভেতর থেকে।

'আমি রানা।'

খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে অন্ধকার। ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল রানা দরজা। জ্বলে উঠল ঘরের বাতি। একরাশ যন্ত্রপাতি ঘরময় ছিটানো।

'কদ্দূর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আর দশ মিনিট। কেন? এসে গেছি মালাদ্বীপে?'

'না, আর দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব। জলদি হাত চালাও। এই ট্রান্সমিটারের উপরই নির্ভর করছে সবকিছু।'

আফটার লকারের এখানে ওখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে রাখা একখানা পোর্টেবল ট্রান্সমিটার সেটের পার্টসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে রি-অ্যাসেম্বল করবার কাজে লেগেছে ফজল ঘণ্টা দেড়েক হলো। কাজ এমন কিছু না, ডায়াগ্রাম দেখে দেখে একটার পর একটা পার্টস জুড়ে যাওয়া। প্রায় সেরে এনেছে ফজল, রানাও হাত লাগাল। যন্ত্রটা রেডি হয়ে যেতেই ট্রায়াল দিয়ে দেখা হলো। ঠিক আছে। এবার একখানা সিগারেট ধরিয়ে ফজলকে কি কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল রানা। তারপর গোটাদুই চাদর দিয়ে সেটটাকে ভাল করে মুড়ে নিয়ে বড় সাইজের একখানা প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে ভরা হলো। এবার ঘর অন্ধকার করে দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন ব্যাগটা নিয়ে।

'ঘাটে লাগানো যাবে না হে, ডিঙি নিয়ে যেতে হবে তোমাদের।' বললেন কমোডোর। 'কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবার চেষ্টা কোরো।'

'জ্বি, স্যার। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবার চেষ্টা করব। অবশ্য যদি মালাদ্বীপে প্রেতাত্মারা আটকে না রাখে।'

ট্রান্সমিটার এবং আরও কিছু বেডিং-পত্র নিয়ে ডিঙিতে উঠল ওরা। সাথে কিছু মোমবাতি নিতেও ভুলল না। পঁচিশ মিনিট পরই ফিরে এল রানা। হুইল হাউসে বসে আছে এমালি, আর দ্বারোকা দুর্গ ধ্বংসের গল্প বলছেন তাকে কমোডোর।

'পাওয়া গেল না কিছু?' রানাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল এমালি।

'কিছুই বলা যায় না,' বলল রানা। 'ফজলকে নামিয়ে দিয়ে এলাম, ও খুঁজবে সারারাত। কালকে খবর পাওয়া যাবে কতদূর কি হলো।'

রওনা হলো কর্ণফুলী আবার।

'এবার মালাদ্বীপে যাচ্ছি আমরা, তাই না?' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার জিজ্ঞেস করল এমালি।

'না। এবার যাচ্ছি আমরা সাতু লাগির দিকে।' বলল রানা।

'সাতু লাগি?' চমকে উঠল এমালি। 'এই না বললে মালাদ্বীপে যাব আমরা সুরাংদ্বীপটা দেখে নিয়ে?'

রানা বুঝল মালাদ্বীপকেই সুরাংদ্বীপ বলে ভুল করেছে এমালি। কিন্তু ভুল ভেঙে দেয়ার চেষ্টা না করে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিল সে।

'প্ল্যান চেঞ্জ করেছি। এখন সোজা সাতু লাগির দিকে চলেছি আমরা।'

'সাতু লাগির কোথায়?'

'রত্নদ্বীপে। রিয়ার-অ্যাডমিরাল আবদুল গনি ইলাহুদে আর তাঁর অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ডোডি ইলাহুদের সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার। অবশ্য যদি পৌঁছোতে পারি। এই কুয়াশার মধ্যে রত্নদ্বীপ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কফি খাবেন নাকি স্যার, এক কাপ?'

'কি বললে? কফি? কে বানাবে?'

'আমিই বানাব, স্যার। আনব বানিয়ে তিন কাপ?'

'নিশ্চয়ই। আবার জিজ্ঞেস করছ কোন্ আক্কেলে? এই ভয়ঙ্কর এলাকায় রাতের অন্ধকারে ইয়ট চালাতে হলে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর কফি খাওয়ানো উচিত ক্যাপ্টেনকে। প্রতি পনেরো মিনিটেই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।'

'বিশ্বাস করলাম না, স্যার। যাক, কে বানাবে জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

'অতি সহজ উত্তর: দ্বারোকা দুর্গ ধ্বংসের শেষ চ্যাপ্টারে এসে পড়েছি, এখন এমালিকে ছাড়া যাবে না। তুমি বানালে খেতে পারি।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। নিজের অজান্তে কি বলে ফেলেছেন জানেন না কমোডোর। সেই দুর্গম দুর্গ উপাখ্যানের শেষের অংশটুকু আসলে জানা নেই কমোডোরের। জানলে 'এখন এমালিকে ছাড়া যাবে না' কথাটা মুখ দিয়ে বের হত না ওঁর।

'ঠিক আছে, স্যার। আমিই বানাচ্ছি।'

'আমার জন্যে দরকার নেই।' বলল এমালি। 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে, শুয়ে পড়ব এক্ষুণি।'

'শুয়ে পড়লেই হলো!' বলল রানা। 'তোমার হাতের কফি খাইয়েছ আমাকে, এবার আমার হাতের কফি খেতেই হবে তোমাকে। ঋণী হয়ে থাকব না আমি কিছুতেই। দেরি হবে না, পাঁচ মিনিটে বানিয়ে আনছি।'

সত্যিই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কফি বানিয়ে নিয়ে এল রানা তিন কাপ। নেসক্যাফে। পাউডার কফি, চিনি আর কনডেন্সড মিল্ক তো আছেই, তিন চামচ করে ব্র্যান্ডিও দিয়েছে সে সবগুলোতে। একটাতে কেবল বাড়তি আরেকটা জিনিস যোগ করেছে সামান্য পরিমাণে।

কফি শেষ হতে গল্প শেষ করে ফেললেন কমোডোর। প্রচুর প্রশংসা করলেন কফির। তারপর নিচে গিয়ে শুয়ে পড়তে বললেন রানা ও এমালিকে। ভরসা দিলেন, গত তিরিশটা বছর সমুদ্রে কাটিয়েছেন তিনি, কাজেই ডুবো-পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খাওয়ার ভয় না করে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে ওরা। রত্নদ্বীপে পৌঁছতে না পারলে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেবেন তিনি রানাকে, আর পৌঁছতে না পারলে ফিরে যাবেন সুরাংদ্বীপে।

বড্ড ঘুম পেয়েছে বলে চলে গেল এমালি। চোখের পাতা আর খুলে রাখতে পারছে না সে। রানাও চলে এল নিচে একটু পরে। ওজন আলীর বিছানায় তিন মিনিট বিশ্রাম নিল সে শবাসনে শুয়ে। তারপর স্টোর-রুম থেকে সংগ্রহ করা লোহা ঘষার তিনকোনা ফাইলটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে কেবিনের দরজা খুলে চলে এল এমালির দরজার সামনে। মৃদু টোকা দিল রানা, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ভেতর থেকে। হ্যান্ডেল ঘোরাতেই খুলে গেল দরজা। চোরের মত ঢুকে পড়ল সে এমালির কেবিনে। দরজা বন্ধ করেই জ্বেলে দিল বাতি।

ঘুমোচ্ছে এমালি। এত ঘুম পেয়েছিল যে বিছানা পর্যন্তও পৌঁছতে পারেনি বেচারি—শুয়ে পড়েছে কার্পেটের উপরই। লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে গভীর ঘুমের মধ্যে। বুকের কাপড় সরে গেছে খানিকটা, একটা পায়ের হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে শাড়ি। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল রানা ওকে। বিছানায় শুইয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল গলা পর্যন্ত। থ্রী কোয়ার্টার্স ব্লাউজের হাতা। একটা হাতা উপরে তুলে পরীক্ষা করল সে রশিবাঁধা দাগটা।

ছোট্ট কেবিন, তাই বেশি কষ্ট করতে হলো না। যা খুঁজতে এসেছিল পেয়ে গেল রানা দুই মিনিটের মধ্যেই।

আট

লাফ দিল রানা।

পায়ের নিচে পাথর ঠেকতেই প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানাল কমোডোরকে মনে মনে। রত্নদ্বীপের পশ্চিম দিকে পাথুরে পাড়ের দুই ফুটের মধ্যে ইয়টটা নিয়ে এসে রানাকে লাফ দেয়ার সুযোগ করে দিয়েই প্রাণপণে ফুল-অ্যাসটার্ন করে দুর্ঘটনা এড়াবার চেষ্টা করছেন তিনি এখন। বালি ভাষায় সাতু লাগি মানে ওয়ান মোর। অর্থাৎ আরও একটা দুর্ঘটনার সংবাদের জন্যে প্রস্তুত আছে ওরা সর্বক্ষণ। দুর্ঘটনাও কোনদিন শেষ হবে না এই সাতু লাগিতে। জলদস্যু হুবার্টোর উপর এটা জল-দেবতার অভিসম্পাত। কিন্তু কমোডোর জুলফিকারের সঙ্গে বিশেষ এঁটে উঠতে পারল না জল-দেবতারা। কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছেন তিনি এখন ইয়ট নিয়ে। পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ মাসুদ রানা।

একটা টর্চ, পিস্তল, ছুরি আর কিছু দড়ি আছে কেবল রানার সঙ্গে। ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল সে। প্রথমেই দুর্গের দিকে না গিয়ে সবুজ ঘাসে ছাওয়া এয়ার-স্ট্রীপের দিকে এগোল রানা। এখান থেকেই টেক অফ করেছিল আবদুল গনি ইলাহুদের ছেলে আর হবুজামাই বীচক্র্যাফটে করে। বিকেলে হেলিকপ্টার খুব ধীরে ধীরে চালাতে বলেছিল রানা সুদজিপতোকে এই স্ট্রীপের উপর দিয়ে। কিছু একটা দেখতে পেয়েছিল সে তখন, এখন নিশ্চিত হতে হবে সে-ব্যাপারে।

মাটিটা সমতল, তাই টর্চ না জ্বেলেই দ্রুতপায়ে এগোল রানা সোজা উত্তর দিকে। টর্চটা যতটা সম্ভব না জ্বালানোই ভাল। কোথাও কোন আলোর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কেউ কোথাও জেগে নেই। নিশ্চয়ই প্রহরী আছে। থাকতেই হবে।

হোঁচট খেল রানা। দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে মাটিতে নরম কিছুর গায়ে পা বেধে গিয়ে। কেবল নরম নয়, জীবন্ত। ঝট্ করে ছুরিটা হাতে চলে এল রানার, বিদ্যুৎবেগে মাটি থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে শত্রুকে প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়েই। শত্রুই বটে! ম্যাঁ···করে উঠল শত্রুটা। রানা ছেড়ে দিতেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল চারপায়ে। বিটকেল বোঁটকা গন্ধ শত্রুর গায়ে। নরম কণ্ঠে দুই একটা আপসজাতীয় কথাবার্তা বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল রানা ওকে। মনে হলো ওর কথা বুঝতে পেরেছে ছাগলটা। রাতদুপুরে এমন আচমকা ঘুমের ডিস্টার্ব হওয়ায় বিরক্ত হয়েছিল সে নিঃসন্দেহে, কিন্তু মাফ করে দিল, রেগেমেগে ঢুঁশ দেয়া থেকে বিরত করল সে নিজেকে। আবার এগোল রানা উত্তর দিকে। একরাশ কৌতূহল নিয়ে পিছন পিছন চলল রামছাগলটা।

এয়ার-স্ট্রীপটা শেষ হয়ে আসতেই অতি সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে চারপায়ে এগোল রানা। নইলে যে-কোন মুহূর্তে তিরিশ ফুট নিচে পানিতে গিয়ে পড়বে সে। ছাগলটা মনে করল খেলা হচ্ছে। তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে রানার চারপাশে এক চক্কর মেরে নিয়ে আগে আগে চলল সে রানার। নিশ্চিন্তে রামছাগলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পৌঁছে গেল রানা এয়ার-স্ট্রীপের শেষ মাথায়। এর পরই খাড়া তিরিশ ফুট নিচে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে

পাথরের গায়ে।

বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। ঠিক মাঝখান থেকে একটু বাঁয়ে পাওয়া গেল দাগটা। ফুট তিনেক চওড়া, আর মাঝখানটায় পাঁচ ছয় ইঞ্চি দাবানো। জায়গাটায় ঘাস গজিয়েছে আবার। মাসচারেক আগে ঘটেছে ঘটনাটা। বীচক্র্যাফটের লেজের দিকের চাপ খেয়েই তৈরি হয়েছে এই দাগ। কেউ ছিল না প্লেনে, স্টার্ট দিয়ে থ্রট্‌ল্ ওপেন করে চক সরিয়ে দিতেই সোজা এসে সমুদ্রে পড়েছিল প্লেনটা। পড়বার সময় ফিউযিলেজে লেগে ট্যাপ খেয়ে গেছে মাটি।

উঠে পড়ল রানা। আর সন্দেহ নেই কোন। ছাগলটাকে একটু আদর করে দিয়ে এবার সোজা দুর্গের দিকে এগোল সে। আলো জ্বালা যাবে না, তাই বাতাসের গতি অনুভব করে দিক নির্ণয় করতে হচ্ছে। হঠাৎ কমে গেল বাতাসের বেগ। দুর্গের কাছাকাছি চলে এসেছে সে। একটু পরেই দেয়ালে হাত ঠেকল রানার। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না মেইন গেটের কোন্ দিকটায় আছে সে। আন্দাজের উপর ভর করে বাম দিকেই এগোল রানা। ছয়-সাত পা এগিয়েই সিগারেটের গন্ধ পেল। মেইন এন্ট্র্যান্সে দাঁড়িয়ে বা বসে সিগারেট ফুঁকছে একজন প্রহরী। মুচকে হাসল রানা। প্রহরীদের সিগারেট খাওয়া বারণ। কেবল বারণ নয়, দণ্ডনীয় অপরাধ। কারণ এর ফলে সে নিজের এবং অন্যান্যদের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

অতি সাবধানে দেয়ালের গায়ে সেঁটে থেকে এক-পা এক-পা করে এগোল রানা গেটের দিকে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে, কিন্তু সিগারেটের আগুনের গতিপ্রকৃতি দেখে বোঝা গেল রানার দিকে মুখ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। অপেক্ষা করল রানা। আবার প্রহরীর মুখে চলে এল সিগারেটটা। উজ্জ্বল হয়ে উঠল আগুন সিগারেটের মাথায়। তার মানে দেখতে পাবে না সে এখন এগোলে। তিন লাফে চলে এল রানা প্রহরীর সামনে। এসেই নক আউট পাঞ্চ কষাল একটা। দড়াম করে নাকের উপর ঘুসি খেয়েই টলে গিয়েছিল প্রহরী, এবার ঢলে পড়ল ঘাড়ের উপর বেমক্কা এক কারাতের কোপ পড়তেই। পড়ন্ত প্রহরীকে ধরে আস্তে করে নামাতে গিয়েছিল রানা, এমনসময় পাঁজরের কাছে খোঁচা লাগল কিসের যেন। লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে এদিকে মনোযোগ দিল সে। বেয়োনেট। প্রহরীর হাত থেকে খসে যাওয়া রাইফেলের বেয়োনেটটা।

দশ হাত দূরেই সমুদ্রের উঁচু পাড়। রাইফেলটাকে অন্ধের লাঠির মত ব্যবহার করে চলে এল রানা পাড়ের একেবারে কিনারে। পাড়ের নরম মাটিতে রাইফেলের কুঁদো মেরে ধসিয়ে দিল খানিকটা করে মাটি পাশাপাশি দুটো জায়গায়। অর্থাৎ পেচ্ছাপ চেপেছিল, সমুদ্রের মধ্যেই কাজটা সারতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছে প্রহরীটা। রাইফেলটা কেবল হাত থেকে খসে পড়ে আছে মাটিতে, প্রহরীর চিহ্নও নেই আর।

ফিরে এল রানা প্রহরীটার পাশে। জ্ঞান ফিরে আসছে লোকটার, গোঙানির মত শব্দ বেরোচ্ছে ওর গলা থেকে। একটা রুমাল ঠেসে দিল রানা

ওর মুখের ভেতর। থেমে গেল গোঙানি। মিটমিট করে চাইছে সে এখন। দুই মিনিটের মধ্যে উঠে দাঁড়াল লোকটা ওয়ালথারের ইঙ্গিতে। হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়ে গেছে ততক্ষণে। পিস্তল দিয়ে খোঁচা লাগাল রানা এবার ওর শিরদাঁড়ার উপর। এগোল সে। শ'দুয়েক গজ পশ্চিম দিকে এগিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়ে এবার ওর পা দুটোও বেঁধে ফেলল রানা। হাত আর পা একসাথে করে আবার বাঁধল শক্ত করে। ঠেলা দিতেই কাৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটা মাটিতে, এবং পড়েই থাকল।

ফিরে এল রানা দুর্গমুখে। আর কোন প্রহরী দেখা গেল না মেইন গেটে। ছোট্ট একটা উঠান পেরিয়েই দুর্গের দরজা। বন্ধ, কিন্তু তালা মারা নয়। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। সূচীভেদ্য অন্ধকার। আকাশ থেকে যতটা দেখা গেছে এবং যতটা বোঝা গেছে তার উপর নির্ভর করে মোটামুটি দুর্গটার একটা নকশা এঁকে রেখেছে রানা মনে মনে। সেই নকশা অনুযায়ী দোতলায় উঠবার সিঁড়িটা এই দরজার ঠিক উল্টোদিকে থাকা সম্ভব বলে মনে হলো ওর কাছে। হলঘরটার চারদিকে চট করে ঘুরে এল একবার টর্চের উজ্জ্বল আলো। ফাঁকা। কেউ নেই। এবার স্থির হলো আলোটা এসে সিঁড়ির কাছে। ঠিকই আন্দাজ করেছিল সে, ওপাশের দেয়ালের কাছাকাছি দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। দু'পাশে দুটো। আলো নিবিয়ে দিয়ে ডান দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল রানা। মৃদু একটা আলো আসছে উপর থেকে। বাম দিকে মোড় নিয়ে আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি। আলোটা এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা।

সিঁড়ি শেষ হতেই একটা দরজা। আধ ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে দরজাটা। ঘরের ভেতরের উজ্জ্বল আলো বাইরে এসে পড়েছে। চোরের মত নিঃশব্দে ধাপ ক'টা উঠে চোখ রাখল রানা ফাঁকটায়। একটা আলমারির খানিকটা অংশ দেখতে পেল সে প্রথমেই, তারপর খানিকটা মেঝে, একটা বিছানার কিছুটা অংশ, আর সবশেষে বিছানার উপর একটা কাদামাখা বুট সুদ্ধ পা। এবার কান পাতল রানা দরজার ফাঁকে। প্রথমে মনে হলো কেটলিতে পানি ফুটছে, তারপর মনে হলো—না, কেউ গড়গড়া টানছে, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হলো করাত চালাচ্ছে কাঠের উপর কোন ছুতোর মিস্ত্রি। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল রানা ঘরের ভেতর।

ঘুমিয়ে আছে একজন প্রহরী রাইফেল বুকে নিয়ে। মাথার কাছে একটা টেবিলের উপর প্রায় খালি হয়ে আসা একটা মদের বোতল। কর্ক খোলা। বেঘোরে নাক ডাকাচ্ছে লোকটা। ডিউটির সময় হলেই ডেকে তুলে দেবে নিচের প্রহরী, তাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিচ্ছে সে।

কিন্তু আজ আর কেউ জাগিয়ে দেবে না তোমাকে, ভাবল রানা। সকাল আটটা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে। কিন্তু যদি আগেই উঠে যায়? কিংবা অ্যালার্ম দেয়া থাকে কোন ঘড়ি?

ছোট্ট শিশিটাকে খুলে গোটাকয়েক ট্যাবলেট ফেলে দিল রানা বোতলের মধ্যে। ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে বোতলের দিকে হাত বাড়াবে এ লোক, রানার সন্দেহ নেই। যে লোক জামা-কাপড়, জুতো পর্যন্ত খুলবার আগেই ঘুমে ঢলে

পড়ে, ঘুম থেকে উঠেই তার তেষ্টা পাবে। এবং আধ গ্লাস খেলেই যে সে আবার ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হবে, তাতেও রানার সন্দেহ নেই।

পাশের ঘরটা খালি। কিন্তু একনজর চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল রানা যে ঘরটা আসলে নিচের সেই প্রহরীটির। এই ঘরটিও আগেরটার মত অগোছাল, নোংরা। সারা ঘরময় পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে।

এই ঘরটা ছাড়িয়েই বারান্দা। বাম পাশে চলে এল রানা সেই বারান্দা ধরে। ডান পাশটা যদি প্রহরীদের ঘর হয় তাহলে বাম পাশে পাওয়া যাবে আবদুল গনি ইলাহুদেকে। ঘরটা পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু গৃহস্বামীকে পাওয়া গেল না। বিছানায় আজ রাতে শোয়নি কেউ।

পাশের বাথরুমেও কেউ নেই। এবার পাশের ঘরে যাবার বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। বন্ধ, কিন্তু তালা মারা নয়। হাতল ঘুরিয়ে এক ইঞ্চি ফাঁক করল রানা দরজাটা। চট করে টর্চটা বাম হাতে নিয়ে পিস্তলটা বের করল সে। আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। গার্ড আছে নাকি? অস্পষ্ট কিসের যেন একটা শব্দ কানে এল ওর। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে দরজার সামনে, পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে ঝট করে খুলে ফেলল দরজা।

'কে?' খনখনে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল কেউ।

চমকে উঠল রানা। কিন্তু কোথায় কে? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে মশারির ভিতর শুয়ে আছে ডোডি ইলাহুদে। ঘরের মধ্যে কেউ নেই আর।

'কে?' আবার এল প্রশ্নটা। 'ডোডি মা, দ্যাখ তো কে এল?'

মুচকে হাসল রানা। ঢুকে এল ঘরের মধ্যে। ডোডি ইলাহুদের পোষা তোতাপাখিটার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। বাথরুমের দরজার চৌকাঠে ঝোলানো আছে খাঁচা। নখ দিয়ে খামচে ধরে আছে সে খাঁচার উপরের দিকের কয়েকটা শিক, মাথা নিচের দিকে। ঘাড়টা কাৎ করে বিজ্ঞের মত চেয়ে আছে সে এখন রানার দিকে।

ঘুমিয়ে আছে ডোডি। বালিশময় বিছিয়ে রয়েছে একরাশ এলোমেলো চুল। নিষ্পাপ শিশুর মত লাগছে ওর ঘুমন্ত মুখটা। হাত থেকে খসে বালিশের পাশে পড়ে আছে একটা সিনেমা ম্যাগাজিন। নগ্নবক্ষা এক সুন্দরী যুবতীর ছবি কভারে।

মশারি তুলে ফেলল রানা। টেরও পেল না ডোডি। কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিতেই পাশ ফিরে আরও কুঁকড়ে-মুকড়ে জুত করে শুল। ভ্যালা মুসিবৎ। ওপাশে গিয়ে আবার ঝাঁকাল রানা ডোডির কাঁধ। এমনভাবে দাঁড়াল যাতে চোখ খুলেই ওর মুখ দেখতে পায় ডোডি। ইঙ্গিত করলে হয়তো চিৎকার করা থেকে বিরত থাকতেও পারে।

এবার চোখ মেলল ডোডি। এবং মেলেই আঁতকে উঠল।

'কে! কে তুমি!'

ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে বলল ওকে রানা। কিন্তু তাতে আরও ভড়কে গেল ডোডি। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ঘরের এদিকে ওদিকে চাইল সে।

'কে তুমি! কি চাও? কি চাও এখানে তুমি? খবরদার ছোঁবে না আমাকে!'

'না, ছোঁবো না।' বলল রানা। 'কিন্তু গলার স্বরটা একটু নামিয়ে কথা বলো, ডোডি ইলাহুদে। নইলে তুমিও বিপদে পড়বে, আমিও।'

এতক্ষণ ভয়ই পেয়েছিল, ঘুমের রেশ চোখ থেকে পুরোপুরি কেটে না যাওয়ায় চিনতে পারেনি রানাকে, এবার হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল সে বিছানার উপর।

'তুমি সেই লোকটা। সুদজিপতো। আজ বিকালে এসেছিলে তুমি। হেলিকপ্টারের পাইলট।'

'হ্যাঁ, আমি সেই লোকটা। এছাড়া আর একটি কথাও ঠিক বলতে পারোনি। আমার নাম আসলে মাসুদ রানা। বিকেলটা আসলে গতকালকের বিকেল। আর হেলিকপ্টারের পাইলট ছিল আরেকজন, আমি না। যাক, আমি একজন সিক্রেট সার্ভিসের লোক। তোমাদের শত্রু নই আমি। তোমাকে আর তোমার বাবাকে সাহায্য করতে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'কি করতে এসেছ?'

'তোমাদের দুর্দিনের অবসান ঘটাতে এসেছি আমি। এক মাসের মধ্যে সিমান্দজুনতাকের সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার—তার ব্যবস্থা করতে এসেছি।'

'যদি তুমি আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো তাহলে এক্ষুণি চলে যাও তুমি এখান থেকে। দয়া করে চলে যাও তুমি, নইলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। প্লীজ, আমি অনুরোধ করছি, উপকার করতে গিয়ে সর্বনাশ ঘনিয়ে এনো না তুমি আমাদের। চলে যাও এখান থেকে।'

রানা বুঝল, সার্জেন্টের মতই ক্যাপ্টেন ইমরানের কথায় বিশ্বাস করে ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় বসে আছে ডোডি।

'তুমিও ওদের কথায় বিশ্বাস করে বসে আছ! তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়েও! ওরা তোমাদের ছেড়ে দেবে মনে করছ? কি করে ছাড়বে! সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যাবে ওরা যাবার আগে। বন্দীদের তো কথাই নেই, তোমাদেরও প্রত্যেককে শেষ করে তারপর যাবে ওরা।'

'অসম্ভব! তা হতেই পারে না। ক্যাপ্টেন ইমরান বলেছে আমার বাবাকে, কারও কোন ক্ষতি করবে না সে। ইসরাইলের জন্যে টাকা জোগাড় করছে ওরা। কাজ হয়ে গেলেই চলে যাবে।'

'তাই যদি যেত, তাহলে গত তিনদিনের মধ্যে চারজন লোককে খুন করল কেন ওরা? গত তিনদিনের মধ্যে চারবার খুন করবার চেষ্টা করল কেন আমাকে?'

'মিথ্যে কথা বলছ তুমি। অসম্ভব! অসম্ভব কয়েকটা কথা বানিয়ে এনে আমাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করছ তুমি। তার চেয়ে নিজের চরকায় তেল দাও না গিয়ে!'

কঠোর হয়ে গেল রানার দৃষ্টি। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'ছি ছি, আবদুল গনি ইলাহুদের মত একজন সম্মানিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির মেয়ের মুখে এই কথা আমি আশা করিনি। যাক, তোমাকে দিয়ে কাজ হবে না। তোমার বাবা কোথায়?'

'আমি জানি না। রাত বারোটার দিকে কয়েকজন লোক এসে নিয়ে গেছে

বাবাকে। কোথায় গেছেন আমাকে বলে যাননি উনি। আমাকে কোন কথাই বলেন না উনি আজকাল।' কথা বলতে বলতে অন্যদিকে চেয়ে ছিল। ডোডি হঠাৎ রানার চোখের দিকে চাইল। 'আমাকে দিয়ে কাজ হবে না মানে কি বলতে চাও তুমি?'

'কখন ফিরবেন তা কি বলে গেছেন উনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাকে দিয়ে কাজ হবে না বলে কি বোঝাতে চাও তুমি?'

'বোঝাতে চাই এই যে একে তোমার বয়স কম, এই জগতের হালচাল সম্বন্ধে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, তার ওপর বুদ্ধিটাও তেমন চোখা নয়। একজন ঝানু বদমাশ তোমাকে যা বলেছে তাই ঐশীবাণী বলে বিশ্বাস করে বসে আছ। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হবে কি করে? বিশ্বাসই তো করবে না আমার কথা। একটিমাত্র লোক তোমাদের সবাইকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে—আর তার কথাই অবিশ্বাস করবে তুমি! তুমি হচ্ছ একটা নির্বোধ মাথামোটা সুন্দরী মেয়েলোক। পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি, দারুণ বাঁচা বেঁচে যাবে সিমান্দজুনতাক। মহা ভুল করতে চলেছিল ও না বুঝে।'

'তার মানে?' সারা দেহের রক্ত এসে মুখে জমেছে অপমানিতা ডোডির।

'মানে হচ্ছে তোমার মত একটা বুদ্ধু মেয়েকে বিয়ে করতে হবে না আর ওকে। তোমাকে বিয়ে করার চেয়ে এদের হাতে খুন হয়ে যাওয়াও অনেক ভাল। দারুণ বাঁচা বেঁচে যাচ্ছে লোকটা। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে হত্যা করা হবে ওকে। এবং ওর মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী তা জানো? তুমি। তোমারই নির্বুদ্ধিতার জন্যে খুন করা হবে তোমার ভাই এবং বাবাকেও।' হঠাৎ স্কার্ফটা খুলে ফেলল রানা গলা থেকে। 'কেমন লাগছে আমাকে দেখতে?'

রানার গলার লাল দাগটা এখন নীলচে বেগুনি হয়ে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে। মিসিরের হাতের দাগ এটা, সহজে যাবার নয়।

'মিসির?' ফিসফিস করে বলল ডোডি। ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে ওর মুখ। ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ যেন সব রক্ত শুষে নিয়েছে ওর মুখ থেকে।

'নাম তো জানো দেখছি, চেনো ওকে?'

'ওদের বেশির ভাগ লোককেই চিনি আমি। আমাদের বাবুর্চি সেদিন বলছিল মিসির নাকি গর্ব করেছে ওর কাছে, এই ভাবে মানুষ খুন করেছে সে অনেক। আমি···আমি গল্প মনে করেছিলাম।' আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ডোডি রানার গলার দিকে, চোখ ফেরাতে পারছে না কিছুতেই।

'এখনও কি তোমার বিশ্বাস ওরা নিরীহ কতকগুলো ভদ্রলোক, ধর্ম প্রচার করতে এসেছে এখানে?' বলল রানা নাটকীয়ভাবে। 'কায়েস আর দাউদকে চেনো?'

মাথা নাড়ল ডোডি। চেনে।

'আজ রাতে ওদের দু'জনকেই খুন করেছি আমি। আমার এক বন্ধুকে ঘাড় মটকে দিয়ে খুন করেছিল ওরা। ওদের দু'জনকে পাঠানো হয়েছিল আমাকে আর আমার বস্ কমোডোর জুলফিকারকে খুন করতে। তাদেরও একজনকে খুন করেছি আমি। খুব সম্ভব ওর নাম গ্রান্ট—তুমি হয়তো চিনতেও

পারো। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না? এখনও তোমার বিশ্বাস যে আমরা কয়েকজন খোলা মাঠে গোল্লাছুট খেলছি?'

কাজ হলো এতে। আর যাই হোক অবিশ্বাস আর রইল না ডোডির চোখেমুখে। কিন্তু আতঙ্ক গেল না। বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল সে রানার দিকে। দৃষ্টিটা একবার গলার উপর এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, আবার স্থির হচ্ছে রানার মুখে এসে।

'আপনি…আপনি ওদের চেয়ে ভাল কিসে!' বলল সে, 'ভয়ঙ্কর লোক আপনি। অমানুষ গুণ্ডা! খুন করলেন আপনি ওদের?'

'তোমার বাবা কখন ফিরবেন বলে গেছেন?'

'না।'

'এরা এখানে কি করছে সে-সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই তোমার কোন ধারণা নেই?'

'না।'

রানা বিশ্বাস করল কথাটা। আবদুল গনি ইলাহুদে বুদ্ধিমান লোক। উনি নিশ্চয়ই জানেন যে এখানকার কাজ শেষ হলেও ছেড়ে দেয়া হবে না কাউকে। সবাইকে খুন করে চিরতরে মুখ বন্ধ করে দিয়ে যাবে ওরা। তাই মেয়েকে সরিয়ে রেখেছেন উনি এসবের মধ্যে থেকে। ও কিছুই জানে না বলে যদি বাঁচানো যায় মেয়েটাকে সেই আশায়।

'সিমান্দজুনতাক যে বেঁচে আছে সেকথা নিশ্চয়ই জানো তুমি?' বলল রানা। 'তোমার ভাইও বেঁচে আছে। আরও কয়েকজনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখানেই আছে ওরা, তাই না?'

মাথা নাড়ল ডোডি। আছে।

'কয়জন?'

'সাত আটজন। দু'জন বাচ্চা ছেলে।'

রানা বুঝল ওর চেনা চারজন ছাড়া আরও চারজন আছে। হয়তো এমন কিছু দেখে ফেলেছিল ওরা যাতে বন্দী করতে হয়েছে ওদের। ক্যাপ্টেন ইমরানের পক্ষে বন্দী না করে গলা কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়াই সহজ কাজ। তবু যে কেন বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ওদের সে কথা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। কারণ আছে এর পিছনে।

'কোথায় রাখা হয়েছে ওদের? রত্নদ্বীপে আর যাই হোক বন্দীশালার অভাব নেই নিশ্চয়ই?'

'মাটির নিচে আছে বন্দীশালা। গত চার মাস একবারও ওদিকে যেতে দেয়া হয়নি আমাকে।'

'এ-ই সুযোগ।' বলল রানা। 'কাপড়টা পরে নাও জলদি। নইলে ওদিকে যাবার সুযোগ আর পাবে না কোনদিনই।'

'পাগল হয়েছেন নাকি? বাবার কাছে শুনেছি তিন তিনজন গার্ড পাহারা দেয় দুর্গটা রাতের বেলায়,' বলল ডোডি। 'অসম্ভব! আমি এক পা নড়ব না এই ঘর থেকে। পিস্তল, রাইফেল, মেশিনগান আছে ওদের কাছে।'

'আমি জানতাম তুমি যাবে না!' বলল রানা তিক্ত হাসি হেসে। 'কেন যাবে? তোমার প্রিয়তম, তোমার ভাই, তোমার বাবা, সবাইকে আমার চোখের সামনে হত্যা করলেও ভুরু পর্যন্ত নড়াতে সাহস পাবে না তুমি। আমি জানতাম। ইন্দোনেশিয়ার মেয়েদের বীরাঙ্গনা বলে জানতাম আমি, কিন্তু এমন ভীতু, এমন…'

'হয়েছে, হয়েছে। আর রাগাবার চেষ্টা করতে হবে না।' বলল ডোডি। 'শুধু একটা কথার জবাব দিন। আপনি কমোডোর জুলফিকারের নাম উচ্চারণ করেছেন একবার। কি রকম দেখতে উনি?'

'বাঘের মত,' বলল রানা। 'না না, ঠাট্টা করছি না। কিন্তু এই প্রশ্ন কেন? চেনো তুমি তাঁকে?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দিন আগে।'

কমোডোরের বাঘা চেহারার বর্ণনা দিল রানা। এবং সবশেষে বলল রত্নদ্বীপের পশ্চিম ঘাটের কাছাকাছি কোথাও ইয়ট কর্ণফুলী নিয়ে কুস্তি করছেন তিনি এখন।

'ঠিক। সত্যি কথাই বলেছেন আপনি। আপনি ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সেরই লোক। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি কাপড় পরে নিচ্ছি এক মিনিটে।'

পেছন ফিরল রানা। বিছানা ছেড়ে উঠে গেল ডোডি। প্রথম কড়িকাঠের দিকে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করল রানা, তারপর বলল, 'তুমি কমোডোরকে চিনলে কি করে? আর তাঁর ওপর এত ভক্তিই বা কেন?'

'উনি আমাদের পরিবারের সবচেয়ে সম্মানিত বন্ধু। ওঁর পিঠেই ঘোড়া চালানো শিখেছি আমি ছোট বেলায়। বাবার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন উনি একবার নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে। যেমন সাহসী তেমনি মহৎপ্রাণ লোক কমোডোর জুলফিকার।' কাপড় পরতে পরতে কথা বলছে ডোডি। কোন কোন শব্দ জোরে হয়ে যাচ্ছে, কোনটা আস্তে। এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'নিন, চলুন।'

নয়

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে পাতালপুরীতে নেমে এল ওরা হাত ধরাধরি করে। আলো জ্বালানো যাচ্ছে না, কাজেই বুঝতে পারেনি রানা কখন সিঁড়ি শেষ হয়ে গেছে। হোঁচট খেল সে। ডোডি হোঁচট খেল রানার পিঠে। সামলে নিয়ে ডান দিকের পথ ধরে চলল ওরা কিছুদূর।

'এবার বাঁয়ের দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে।' বলল ডোডি ফিস ফিস করে।

বামের দরজা দিয়ে ঢুকে বেশ বড়সড় একটা ঘর। সেই ঘরের পুবকোণে আরও নিচে নামার সিঁড়ি। ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

তিনজন গার্ডের একজনকে বেঁধে রেখে এসেছে রানা। দ্বিতীয় জন ছাতের

উপর Infra-red লেন্স ফিট করা বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে নজর রাখছে সমুদ্রের দিকটায়। যাতে কাজের সময় হঠাৎ কোন জেলে বোট কিংবা আর কিছু এসে ক্যাপ্টেন ইমরানকে বিরক্ত না করতে পারে। আর তৃতীয়জনের থাকার কথা দুর্গের নিচে যাবার পথে কোথাও। সিঁড়িমুখে যখন নেই, তখন নিশ্চয়ই নিচে গেছে লোকটা।

দশ-বারো ধাপ নামার পর আরেকটা ঘর। দুটো রাস্তা দু'দিকে চলে গেছে সে-ঘর থেকে। পুবকোণে আরও নিচে নামার সিঁড়ি। আরও কয়েক ধাপ নামার পর ডান দিকে ঘুরে গেছে সিঁড়িগুলো। আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে সেখানটায়। আঙুল ঠোঁটের উপর রেখে ডোডি কথা বলতে বারণ করল রানাকে। শেষ মাথায় এসে সাবধানে একটা চোখ বের করল রানা নিচে কি আছে দেখার জন্যে।

খাড়াভাবে নেমে গেছে সিঁড়িটা ষাট-সত্তর ধাপ। তিনটে কম পাওয়ারের বাল্‌ব্‌ জ্বলছে দেয়ালের গায়ে বিশ ফুট দূরে দূরে। শেষ মাথাটায় মনে হচ্ছে মিশে গেছে দুই দেয়াল। সোজা রেললাইন বরাবর চাইলে যেমন মনে হয় ঠিক তেমনি। সিঁড়ির শেষে খানিকটা ফাঁকা জায়গা—রাস্তা চলে গেছে দুইদিকে। ফাঁকা জায়গাটায় একটা টুলের উপর বসে আছে একজন অল্পবয়সী প্রহরী। দুই হাঁটুর উপর রাখা আছে একখানা অটোমেটিক কারবাইন।

সরে এল রানা। কানে কানে জিজ্ঞেস করল ডোডিকে, 'এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় যাওয়া যায়?'

'বোটহাউসে।' বলল ডোডি।

তাই আশা করছিল রানা। আগেই সন্দেহ হয়েছিল ওর, দুর্গের নিচে দিয়ে বোটহাউসের সঙ্গে সংযোগ আছে। বাইরে থেকে বুঝবার কোন উপায় নেই। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে রত্নদ্বীপকে বাছাই করা হয়েছিল।

'নিচে নামার আর কোন রাস্তা নেই?'

'না, এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।' বলল ডোডি।

'কিন্তু এই সিঁড়ি দিয়ে পাঁচ কদম নিচে নামলেই ঝাঁঝরা হয়ে যাব রাইফেলের গুলিতে। একজন প্রহরী বসে আছে নিচে। দ্যাখো তো চিনতে পারো কিনা?'

একনজর দেখেই বলল ডোডি, 'উইলি। অ্যামেরিকান ইহুদি। অসহ্যরকম হীন চরিত্রের গায়েপড়া লোক।'

'কেন, বেয়াদবি করেছিল কোনদিন?'

'হ্যাঁ। শাস্তিও দেয়া হয়েছিল ওকে তার জন্যে। একা পেয়েই জড়িয়ে ধরেছিল একদিন...'

'গুড্‌। ওকে ডাকো।'

'কি?'

'ডাক দাও ওকে। বলো, ওকে বুঝতে না পেরে অবিচার করেছিলে তুমি ওর ওপর। বাবা নেই এখন। ভুলের মাসুল দিতে এসেছ তুমি সেই সুযোগে।'

'অসম্ভব!'

'ডোডি!'

'অসম্ভব! কিছুতেই এই কথা বলতে পারব না আমি। আমার মুখ দিয়ে বেরই হবে না একথা। তাছাড়া বিশ্বাস করবে না ও…'

'খুব বিশ্বাস করবে। তোমাকে দেখলেই বুদ্ধি লোপ পাবে ওর, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উদয় হবে না ওর মনে। রাতদুপুরে তোমার মত সুন্দরী মেয়ে দেখলে যে কোন পুরুষ মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যেতে বাধ্য।'

'আপনিও তো পুরুষ মানুষ। কই, আপনার মাথা তো খারাপ হয়নি?'

'আমার মাথা খারাপ করে রেখেছে আরেকজন। সোফিয়া লোরেন। নাও, তাড়াতাড়ি করো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হলো ডোডিকে। দেয়ালের সাথে সেঁটে গিয়ে প্রস্তুত হলো রানা। একবার ডাক দিতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে উপর দিকে রওনা হলো উইলি। প্রস্তুত আছে কারবাইনটা। কিন্তু ডোডিকে দেখেই ভুলে গেল সে সতর্কতার কথা। একেক লাফে তিন সিঁড়ি করে উঠতে আরম্ভ করল। শেখানো কথাগুলো মাত্র আরম্ভ করেছিল ডোডি কিন্তু কার কথা কে শোনে! এত রাতে ওকে ডাকতে দেখেই বুঝে নিয়েছে উইলি সবকিছু। নিশ্চয়ই অনুতপ্ত ডোডি ইলাহুদে প্রথমে ওর দুই হাত ধরে ক্ষমা চাইবে, ডুকরে কেঁদে উঠবে ওর বুকে লুকিয়ে। তারপর…

তারপর…

দড়াম করে মারল ওকে রানা ঘাড়ের একপাশে। সেই সাথে বাম হাঁটুটা উঠে গেল উপর দিকে উইলির তলপেট বরাবর। 'কোঁৎ' করে একটা সামান্য শব্দ করেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ল উইলি প্রিয়তমার পায়ের কাছে। কারবাইনটা তার আগেই ধরে ফেলেছে রানা। উইলির পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ঠেসে দিল রানা ওর মুখের মধ্যে, তারপর অবশিষ্ট রশি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলল ওর হাত-পা।

খিলখিল করে হেসে উঠল ডোডি। রানা বুঝল হিস্টিরিয়ার পূর্বলক্ষণ। মাঝ রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে ডাকাতের মত একটা লোকের মুখে খুন খারাবির কথা শুনে, আর এইমাত্র নিজের চোখে মারামারি দেখে মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারছে না ডোডি ইলাহুদে।

বোটহাউসটা আসলে প্রকাণ্ড। বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। পাড় ধসে গিয়ে এই বোটহাউসের সৃষ্টি ঠিকই, কিন্তু বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায় আসলে সেটা কিছুই নয়, বোটহাউসের লোক দেখানো সামান্য অংশমাত্র। প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া একটা খালপাড়ের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে দুর্গের নিচ দিয়ে চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। কর্ণফুলীর সমান কয়েকটা ইয়টের জায়গা হবে সেখানে। আরও জায়গা থাকবে। সমুদ্র থেকে বোটহাউসে ঢুকেই সোজা চলে আসা যায় দুর্গের নিচে। অবশ্য যদি লোহার গেটটা খোলা থাকে। গেটটা বন্ধ থাকাতেই বুঝতে পারেনি রানা যে দুর্গের নিচে রয়েছে এই বোটহাউসের বেশির ভাগ। বহুদিনের পুরানো মরচে ধরা গেট—বিশেষ শক্তপোক্ত বলে মনে

হলো না রানার কাছে।

কেউ নেই বোটহাউসে, গেটটা খোলা। রানা বুঝল সবাই এখন ব্যস্ত আছে অন্যত্র। অনেকগুলো স্পেয়ার ডাইভিং ইকুইপমেন্ট দেখতে পেল রানা যত্রতত্র ছড়ানো। একটা কম্প্রেসার, আউটলেট ভাল্‌ভ্‌ লাগানো স্টীলের রিজারভয়ের, একখানা দুই সিলিন্ডারের ডাব্‌ল অ্যাকটিং এয়ার-পাম্প, গোটা তিনেক হেলমেট, এয়ার টিউব, ভারী জুতো—সবকিছুই আছে। স্কুবা ইকুইপমেন্ট আছে, লাইফ কাম টেলিফোন লাইন আছে। কম্প্রেসড এয়ার সিলিন্ডার আছে। অর্থাৎ ডীপ সি ডাইভিংয়ের জন্যে যা যা দরকার সব আছে এখানে। প্রয়োজনীয় সব জিনিস নিয়ে কাজে গেছে ওরা; এখানে যা আছে সেগুলো বাড়তি।

মনে মনে এদের কর্মতৎপরতা আর একনিষ্ঠতার প্রশংসা না করে পারল না রানা।

একটা উঠানমত জায়গা পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাতের বাঁয়ে দশগজ গেলেই উপরে ওঠার সেই লম্বা খাড়া সিঁড়ি। খালি পড়ে আছে উইলির টুলটা। আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে একটা ঘর পাওয়া গেল। স্যাঁতসেঁতে একটা ঘর, কয়েকটা চেয়ার-টেবিল পাতা, একপাশে একটা চৌকিও ফেলা আছে। খুব সম্ভব উইলির বিশ্রামের জন্যে।

এই ঘরেরই একটা দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড একটা কাঠের দরজা, তাতে প্রকাণ্ড একখানা তালা ঝোলানো। চাবি ছাড়া এই তালা খুলতে হলে বিহাইভ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দরকার। কারার এই কাষ্ঠ-কপাট ভেঙে ফেলে ভীমকারার ওই ভিত্তি নেড়ে দেয়ার চেষ্টা করে দেখল রানা কল্পনার সাহায্যে, কাজ হলো না কিছুই। এর জন্যে কাজী নজরুলের কবিত্বশক্তি দরকার। রানার দরকার বিহাইভ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। থাকুক বন্দীরা আরও একটা দিন। ফিরে এল সে স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে ডোডি ইলাহুদের কাছে।

গলা দিয়ে ঘড়ঘড় মত একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ হচ্ছে উইলির। চোখ গরম করে ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে সে ডোডির দিকে, খুব সম্ভব গালমন্দ দিয়ে চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে দিচ্ছে সে ওর, কিন্তু মুখের ভেতর রুমাল ঠাসা থাকায় ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। রানার দেয়া পিস্তলটা ওর দিকে ধরে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ার্ত ডোডি।

'নিচে সেলের মধ্যে যাদের আটকে রাখা হয়েছে তারা কি সবসময় ওর মধ্যেই থাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা ডোডিকে।

'না। সকালবেলা ওদের ল্যান্ডিং স্ট্রীপে ছেড়ে দেয়া হয় ঘণ্টা খানেকের জন্যে। গার্ড থাকে অবশ্য। সমুদ্র থেকে দেখা যায় না জায়গাটা। আমাকে সেই সময় ঘর থেকে বেরোতে নিষেধ করে দিয়েছে বাবা আর ওসমান খান সাহেব।'

'ওসমান খানও আসে নাকি এখানে?' একটু অবাক হলো রানা।

'আসেন তো! প্রায়ই আসেন। বাবার সঙ্গে রীতিমত বন্ধুত্ব ছিল ওঁর।'

'ছিল মানে? এখন নেই?'

'না…মানে, আছে…বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু…এইসব কাজ করবার পর ততটা হৃদ্যতা আর নেই। ঠিক জানি না, আমার তাই মনে হয়।'

'তোমার বাবাকে এসবের মধ্যে ওসমান খানই টেনে এনেছে, না?'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোক হঠাৎ বদলে গেলেন। একেবারে হঠাৎ। স্ত্রী মারা যাওয়ার একমাসের মধ্যে ফট করে বিয়ে করে বসলেন আবার। আশ্চর্য, এরকম লোক ছিলেন না আগে উনি। খুব সম্ভব কুসংসর্গে পড়ে এই অবস্থা হয়েছে ওঁর।'

সবারই এক কথা। সার্জেন্ট, সুদীরু, ডোডি ইলাহুদে সবাই ওসমান খানকে অত্যন্ত ভদ্র ও ভাল লোক বলে মনে করে। তাদের ধারণা সাময়িকভাবে কুসংসর্গে পড়ে অন্যায় কাজের দিকে পা বাড়িয়েছে। এমালি খানের পিঠের দাগগুলো না দেখলে এদের ধারণা পাল্টাবে না।

'আমার চেহারার বর্ণনা দিয়ে এখান থেকে Sirrus-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল কাল বিকেলে। সেই রেডিও ট্রান্সমিটারটা কোথায়?'

'আপনি ওটার কথা জানলেন কি করে?'

'আমি সব জানি। মিস্টার নো-অল। কোথায় ট্রান্সমিটারটা?'

'হলঘরের মধ্যেকার সিঁড়ি ঘরে। কিন্তু চাবি মারা আছে ঘরটায়।'

'সেজন্যে চিন্তা কোরো না। মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলেই খুলে যাবে।'

উইলির পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল রানা। উঠে দাঁড়িয়েই লাথি চালাল সে। প্রস্তুত ছিল রানা। খটাং করে হাঁটুর নিচে হাড়ের উপর রানার জুতোর একটা মাঝারি গোছের ঠোকর খেয়েই ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল ওর রুমাল ঠাসা মুখ। দ্বিতীয়বার আর চেষ্টা করল না সে কোনরকম কৌশলের। বেয়োনেট ফিট করা অটোমেটিক কারবাইনটা কাঁধে নিয়ে চলল ডোডি রানার পিছন পিছন।

চমৎকার RCA ট্রান্সমিটারটা দেখে খুশি হয়ে উঠল রানার মন। একমুহূর্ত দেরি না করে টুলের উপর বসে কাজ আরম্ভ করল সে। তারপর হঠাৎ কি মনে করে ঘর থেকে একটা সেফটিপিন নিয়ে আসতে বলল ডোডিকে। চট করে ব্লাউজ থেকে খুলে দিল ডোডি একটা সেফটিপিন। মুচকি হাসল রানা। বলল, 'আরেকটা জিনিস দরকার। তোমার বাবার বাথরুম থেকে একটা দাড়ি কামানো ব্লেড নিয়ে আসতে হবে।'

'বাবা তো দাড়ি কামান না!' বলল ডোডি অবাক হয়ে।

'তাহলে…'

'বুঝেছি।' রানাকে থামিয়ে দিয়ে আহত কণ্ঠে বলল ডোডি। 'আমাকে বিশ্বাস করেন না আপনি। কোন কথা যেন শুনতে না পাই সেজন্যে তাড়াতে চাইছেন আমাকে।' অভিমানে বুজে আসতে চাইছে ওর গলার স্বর। পিছন ফিরে বেরিয়ে যাচ্ছিল সিঁড়িঘর থেকে, কাঁধের উপর রানার হাতের স্পর্শ

পেয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাত রেখেছে রানা ওর কাঁধে।

'তোমাকে অবিশ্বাস করছি না আমি, ডোডি! আগামী বিশ ঘণ্টার মানসিক দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম। ঠিক আছে, দুঃখ পাচ্ছ যখন, থাক।'

ঢাকার হেড-অফিসে টিউন করল রানা। ঝাড়া পনেরো মিনিট কথা বলে গেল সে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করল প্রতিটা শব্দ। এখানকার গার্ডদের গতিবিধি, হোমিং ট্রান্সমিটারের ফ্রীকোয়েন্সি, রত্নদ্বীপের ও দুর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়ার পর বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করল নিজের প্ল্যান। লাহোর মেন্টাল হসপিটালের ব্যাপারে দু'একটা প্রশ্ন করল সবশেষে। একটি কথাও রিপিট করল না রানা, কাউকে রিপিট করতেও অনুরোধ করল না। কারণ ও জানে, প্রত্যেকটা শব্দ রেকর্ড হয়ে গিয়েছে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড-অফিসে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কর্ম চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যাবে ঢাকায়।

রানার বক্তব্যের অর্ধেকটা শুনেই দুই ভুরু কপালে উঠেছিল ডোডি ইলাহুদের, শেষটুকু শুনে ভুরুজোড়া মিলিয়ে গেল চুলের মধ্যে। উইলির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে কেউ ওর বুকের ভেতর। কথা শেষ করে টিউনিং ব্যান্ডটা আগের পজিশনে সেট করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। মাথার উপর দুই হাত উঠিয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল।

'ব্যস, খতম।' বলল রানা। 'এবার চললাম আমি।'

'চললেন!' আঁতকে উঠল ডোডি। 'চললেন আপনি আমাকে ফেলে রেখে?'

'যেতেই হবে।' বলল রানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'তোমাকে নিয়ে গেলে খুন করে ফেলবে আমাকে নিকো সিমান্দজুনতাক। তাই একাই যাব। আর এখন না গেলে কোনদিনই যাওয়া যাবে না আর।'

'ঠাট্টা রাখুন তো!' ধমকে উঠল ডোডি।

'ঠাট্টা নয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই দুর্গের নিশাচরেরা ফিরে আসবে। তার আগেই কেটে পড়তে হবে আমাকে।'

'পিস্তল তো আছেই...'

'ওদের কাছেও আছে। আমি একা, ওরা অনেক। গুড় বাই, ডোডি। যা শুনলে তার একটি কথাও কাউকে বলবে না। তোমার বাবাকেও না। খেয়াল রেখো, তোমার মুখ থেকে একটি কথা ফসকে বেরিয়ে গেলে তোমরা সবাই তো মারা যাবেই, আমিও মারা যাব। কমোডোরও।' দম নিল রানা। কোথা থেকে যেন একরাশ ক্লান্তি এসে ভিড় করেছে ওর মনের দরজায়। দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে চাইছে ওর দেহের ভেতর। মনটা শক্ত করে নিয়ে বলল, 'মনে রেখো, আমি যে এই দ্বীপে এসেছিলাম সেই কথা ঘুণাক্ষরেও ওদের টের পেতে দিলে চলবে না। টের পেয়ে গেলেই সবকিছু ভেস্তে যাবে। পাথরের মূর্তির মত চুপ হয়ে যেতে হবে তোমাকে, যদিও মনের ভেতর ছটফট করে গুমরে মরবে একরাশ দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তি। চলি।'

'কিন্তু উইলি? ওকে রেখে গেলে ও-ই তো সব...'

'ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। মেইন গেটের গার্ডটাকেও।' বলে পায়ের সাথে বাঁধা খাপ থেকে ছুরিটা বের করে হালকা করে এক টান দিল রানা নিজের বাহুতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোল খানিকটা। বেয়োনেটের গায়ে লাগিয়ে দিল রানা সে-রক্ত। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা বাইরে।

প্রথম প্রহরীর রাইফেলটা পড়ে আছে যথাস্থানে। ওটাকে তুলে ফেলে দিল রানা সমুদ্রে। এবার দ্বিতীয় প্রহরীর কারবাইনটা রাখল আগের জায়গায়। জুতোর গোড়ালি দিয়ে চেপে চেপে গোটাকয়েক দাগ ফেলল ভেজা মাটিতে। তারপর ডোডিকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানটায় আজ রাতে কি হয়েছিল বলো তো?'

'মারামারি। কোন কারণে ঝগড়া হওয়ায় এরা দু'জন মারামারি করতে করতে কিনারে এসে পড়েছিল, তারপর পা ফসকে দু'জনই পড়ে গেছে সমুদ্রে।' বলল ডোডি। এবং সেইসাথে যোগ করল, 'হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আমি দু'জন লোককে হলঘরে চিৎকার করে ঝগড়া করতে শুনেছিলাম। অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছিল ওরা। ধস্তাধস্তির আওয়াজও পেয়েছি। কিন্তু ঘর থেকে বের হতে সাহস পাইনি। তারপরের ঘটনা জানি না।'

'গুড। সত্যবাদী মেয়ে তুমি। ভুলেও কখনও মিথ্যে কথা বোলো না। পাপ হয়। এবার সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। যাও।'

হাঁটতে হাঁটতে প্রথম প্রহরীকে যে ঝোপের আড়ালে বেঁধে রেখেছিল রানা সেই পর্যন্ত চলে এসেছিল ডোডি, 'যাও' শুনে থমকে দাঁড়াল। দুই সেকেন্ড চুপ করে থাকল, তারপর হঠাৎ বলল, 'ইচ্ছে করলেই এদের দু'জনকে আপনি ধাক্কা দিয়ে সাগরে ফেলে দিতে পারতেন, ইচ্ছে করলেই নিজের হাত না কেটে উইলির হাত কেটে বেয়োনেটে রক্ত মাখাতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি আপনি। নিজের হাত কেটেছেন তার বদলে। অদ্ভুত চরিত্রের লোক আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনাকে বুঝতে পারা আমার সাধ্য নয়। তবে এটুকু বুঝেছি কর্তব্যের খাতিরে যতটা দরকার তার বেশি একবিন্দুও কষ্ট দিতে চান না আপনি মানুষকে। আপনাকে ভুল বুঝে কটু কথা বলেছি—মাফ করে দেবেন।'

কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়েছিল রানা নিজেকে উপহাস করে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে ডোডি। মনে মনে হাসল রানা। সে যে কবে এত মহৎ লোক হয়ে গেছে টেরই পায়নি আগে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিল রানা। তিন মিনিটের মধ্যে ঘাটে এসে ভিড়ল কর্ণফুলী।

'স্লীপ ইজ গুড, ডেথ ইজ বেটার, বাট দা বেস্ট থিং উড হ্যাভ বিন নট টু হ্যাভ বিন বর্ন, অ্যাটল।' বললেন কমোডোর জুলফিকার।

প্রথম এক চোখের একটা কোণ খুলেছিল রানা, ধাক্কার চোটে এবার বহু কষ্টে দুই চোখ খুলল। হাত বাড়ালেন কমোডোর উঠতে সাহায্য করবেন বলে।

'উঠে পড়ো, রানা। এসে গেছি।'

লজ্জিত মুখে উঠে পড়ল রানা কারও সাহায্য ছাড়াই। রত্নদ্বীপ থেকে ফিরেই সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছে সে কমোডোরকে। তারপর তাঁর আদেশে নিচে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। উপরে থেকে লাভ হত না কিছুই, এই ভয়ঙ্কর এলাকায় ইয়ট চালনায় কোনরকম সাহায্য করতে পারত না সে কমোডোরকে। দুই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেছে ওরা মালাদ্বীপে। রাত শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, কিন্তু ভোর হতে দেরি আছে এখনও। দুই ঘণ্টার অসম্পূর্ণ ঘুমে আরও অনেক অবসন্ন দুর্বল লাগছে রানার শরীরটা। ইয়ট ছেড়ে ডাঙায় উঠে পড়তে হবে এবার।

একমিনিট ধাক্কাধাক্কির পর ঘুম ভাঙল এমালির। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে বলল রানা ওকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চোখেমুখে পানি ছিটিয়ে বেরিয়ে এল সে বাইরে।

এই কয় ঘণ্টা চুপচাপ বসে ছিল না ফজল সুদীরু। খুঁজেপেতে পুরানো কালের একটা চলনসই জেটি বের করে ফেলেছে সে। সেখানেই ঘাটের প্রায় গায়ে ভিড়িয়ে নোঙর করা হয়েছে কর্ণফুলী। জেটির কাছাকাছিই একটা পাকা দালানের কয়েকটা ঘর পরিষ্কার করে রেখেছে ফজল। ইয়ট ঘাটে ভিড়তেই টানাটানি করে সবার বিছানাপত্র নিয়ে তুলেছে সেসব ঘরে। একটা দিন মালাদ্বীপে থাকতেই হবে যখন, শুধু শুধু ইয়টের মধ্যে থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ে নাচানাচি করার কি দরকার—পিঠের নিচে শক্ত মাটি পেলে এক ঘণ্টায় চার ঘণ্টার বিশ্রাম হবে। ফজলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি কথাও না বলে নেমে পড়ল ওরা সবাই। খশখশ দিয়াশলাই ঠুকে মোমবাতি জ্বেলে দিল সে সবার ঘরে।

প্রায় বিনা বাক্যব্যয়ে যে যার ঘরে ঢুকে পড়ল। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়েই একটা সিগারেট ধরাল রানা। মনে মনে গতরাত্রির প্রত্যেকটা ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখল সে। কোথাও কি কোন ভুল হয়ে গেল? কোথাও কি সামান্যতম কিছু ভুল রয়ে গেল ওর? মনে তো পড়ছে না। টানতে টানতে ছোট হয়ে গেল সিগারেট, অনেক ভাবল সে, কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারল না রানা। ঘুমের রেশ রয়ে গেছে চোখে। এখন পরিষ্কার করে কিছুই চিন্তা করা যাবে না। ঘুম পেলে ঘুমিয়ে নেয়াই ভাল।

মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা জোর করে দূর করে দিয়ে চোখ বুজল রানা আলো নিবিয়ে। খুট করে শব্দ হলো দরজায়। চোখ খুলে দেখল ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে এমালি খান। বাম হাতে একটা মোমবাতি জ্বলছে।

'এখন ভাগো।' বলল রানা। 'ঘুমোচ্ছি আমি।'

'ভিতরে আসতে পারি?' ঘরের মধ্যে অর্ধেক ঢুকে এসে জিজ্ঞেস করল এমালি। জিজ্ঞেস করা না করা এখন সমান কথা।

'ভেতরে তো এসেই পড়েছ। আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখলে বলতাম বড্ড ক্লান্ত আমি, তাছাড়া রাত-বিরেতে পুরুষ মানুষের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া কোন রমণীর পক্ষে উচিত নয়, অপূর্ব-সুন্দরী রমণী হলে তো একেবারে

বেআইনী। যাক, কি ব্যাপার? কি চাও?'

রানার বিছানার উপরই পায়ের কাছে বসে পড়ল এমালি। ওকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে খুব। সারামুখে, বিশেষ করে দুইচোখে বিষণ্ন একটা ছায়া পড়েছে। প্রাণবন্ত মুখটা পাণ্ডুর।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, রানা?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, এমালি? বিশ্বাস করব না কেন?'

'তুমিই জানো কেন! কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। আমার কোন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না। না, ঠিক তা নয়, জবাব দিচ্ছ, তবে রেখে ঢেকে। ঠিক যা আমাকে জানানো দরকার তাই জানাচ্ছ, তার বেশি একটি কথাও না। কেন? কেন আমাকে বিশ্বাস করো না তুমি? কি করেছি আমি?'

'অর্থাৎ সত্যবাদী না আমি। এই তো বলতে চাইছ? দ্যাখো, মাঝে মাঝে একটু আধটু বাড়িয়ে বলি আমি হয়তো, একটু আধটু মিছে কথাও যে বলি না তা নয়। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ না থাকলে সাধারণত আমি মিছে কথা বলি না। বিশেষ করে তোমার মত মেয়ের সামনে মিথ্যে কথা আমি এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করি সবসময়।'

'কেন? আমার মত মেয়ের সামনে মিথ্যে কথা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করো কেন?'

'ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, এমালি। কেন এই কথাটা বললাম আমি নিজেই জানি না ভাল করে। যদি বলি তোমার মত লাবণ্যময়ী, মিষ্টি, আকর্ষণীয় মেয়ের কাছে মিছে কথা বলা যায় না, তাহলে খাটো করে ফেলা হবে তোমাকে। যদি বলি সুখ নেই তোমার জীবনে, কেউ নেই তোমার, কোথাও ঠাঁই নেই, এমন কেউ নেই যার স্নেহ-মমতা-ভালবাসায় সিক্ত থাকবে তুমি সর্বক্ষণ, তোমার সম্বন্ধে এইরকম কল্পনা করতে অসম্ভব খারাপ লাগে, তোমাকে দুঃখী; অসুখী দেখতে ইচ্ছে করে না আমার—তাহলে খেলো হয়ে যাবে কথাগুলো। কিন্তু আসলে এটাই সত্য। যাকে মানুষ মনের সমস্ত সমীহ শ্রদ্ধা দিয়ে মহিমামণ্ডিত করে তোলে তার সামনে মিছে কথা বলবে কি করে?... দেখলে, কথাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেমন? কিছুতেই ঠিক কথাটা বলতে পারছি না।...যদি বলি সত্যিকার বন্ধু বা বান্ধবীর কাছে মানুষ মিথ্যে কথা বলে না, তাহলে প্রশ্ন উঠবে আমি একজন সাধারণ স্পাই আবার কোটিপতির স্ত্রীর বন্ধু হলাম কবে? কথা দিয়ে তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করা সম্ভব নয়, এমালি। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো বা না-ই করো কিছুই এসে যায় না আমার, শুধু একটা কথা মনে রেখো, আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না কোনদিন, আর যতক্ষণ আমি তোমার আশেপাশে আছি, কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না তোমার। নারীর স্বাভাবিক ইনটুইশন বলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তুমি একথা, কিংবা হয়তো পারোনি।'

'পেরেছি।' বলল এমালি। স্থির হয়ে আছে ওর হাজার বছরের পুরানো দুই চোখ রানার চোখের উপর। মুখটা থমথমে গম্ভীর। 'তোমার হাতে প্রাণটা

সঁপে দিতেও দ্বিধা হবে না আমার।'

'একবার দিয়ে বসলে আর ফেরত না-ও পেতে পারো।'

'এমন কিছু দামী জিনিস ওটা নয়। হয়তো ফেরত চাইবই না।'

'তাহলে মহা ধনী হয়ে যাব আমি।' বলল রানা।

চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল এমালি রানার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে মাথাটা নিচু করে কোলের উপর রাখা নিজের হাতের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর মাথা তুলে বলল, 'তুমি হয়তো ভাবছ কেন এসেছি আমি?'

'না। আমি জানি কেন এসেছ। গল্পটা শুনতে চাও তুমি। বিশেষ করে শুরু এবং শেষটা।'

মাথা নেড়ে সায় দিল এমালি। 'আমার ভয়ানক অস্বস্তি লাগছে, রানা। এই বাস্তব নাটকে আমিও জড়িয়ে পড়েছি। আমারও একটা ছোট্ট রোল আছে। মাঝে মাঝে এক আধ সীনে দুই-পাঁচ মিনিটের জন্যে স্টেজে যাচ্ছি, আমার পার্ট অভিনয় করে চলে আসছি। একটু-আধটু আঁচ করতে পারছি, কিন্তু পুরো নাটকটা কি নিয়ে, কি তার বিষয়বস্তু, কাহিনী কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। অবস্থাটা কল্পনা করো, বুঝতে পারবে কেমন অস্বস্তি লাগছে আমার।'

'এই নাটকের শুরুটা কিছুই জানো না তুমি?'

'কিচ্ছু না। বিশ্বাস করতে পারো।'

বিশ্বাস করল রানা। কারণ ও জানে এমালি রুসমানের পক্ষে জানাটা অস্বাভাবিক।

'তবে শোনো।' শুরু করল রানা একটা সিগারেট ধরিয়ে।

'কোটিপতি ওসমান খানের টাকার অভাব ছিল না। কিন্তু টাকা এমনই একটা জিনিস যে কেউ একবার স্তূপ করতে পারলে আর থামতে চায় না। দেখতে দেখতে স্তূপটাকে পাহাড় পর্বত বানিয়ে ফেলবার প্রবল ইচ্ছে হয় তার মধ্যে। এবং এই ইচ্ছেই সরিয়ে নিয়ে এসেছে ওসমান খানকে আইনের সুনিয়ন্ত্রিত পথ থেকে। এত দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে যে আর ফিরবার কোন পথ নেই।

'লোক দরকার। টাকা ঢাললে লোকের অভাব হয় না। জোগাড় হয়ে গেল জলদস্যু ক্যাপ্টেন ইমরান, কায়েস, দাউদ, মিসির, গ্রান্ট, এবং আরও অনেকে। ডাকাতি আরম্ভ হলো ভারত মহাসাগরে। জেলে নৌকা নিয়ে কৌশলে থামানো হয় জাহাজ, তোমাকে মাতারামের কোন হোটেলে নামিয়ে দিয়ে কাছাকাছিই প্রস্তুত থাকে Sirrus, জাহাজের লোকদের চোখ বেঁধে ফেলার পর Sirrus গিয়ে লাগে জাহাজের গায়ে, নির্জন কোন দ্বীপে নাবিকদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসে ওদের লম্বকে। ক্যাপ্টেন ইমরান জাহাজটা চালিয়ে নিয়ে আসে ওদের গোপন আস্তানায়। এখন প্রব্লেম হচ্ছে কোথায় লুকোনো থাকে জাহাজগুলো যাতে নিশ্চিন্তে মাল উদ্ধার করা যায়? আধুনিক জাহাজের স্ট্রংরুম ভাঙতেই লেগে যায় পুরো একদিন, তারপর মাল

সরাতে গেলেও সময় চাই, তিরিশ কোটি টাকার সোনা সরাতে হলে অন্ততপক্ষে দুটো দিন সময় চাই। তাই লুকিয়ে রাখে ওরা জাহাজটা।'

'কিন্তু··· কিন্তু একটা জাহাজ তো বিরাট ব্যাপার। লুকোবে কোথায়?' বলল মন্ত্রমুগ্ধ এমালি।

'তুমিই বলো দেখি? একটা প্রকাণ্ড সমুদ্রগামী জাহাজকে আশেপাশে কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়?'

'আমি জানব কি করে? আমার মাথায় তো আসছে না। দক্ষিণ মেরু ছাড়া তো আর কোন জায়গার কথা মাথায় আসছে না আমার। এতবড় একটা জাহাজ লুকানো তো সোজা কথা নয়!'

'খুব সোজা, এমালি। লক্ষ লক্ষ জায়গা আছে। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন জাহাজ লুকিয়ে রাখা যায়। বিলজ ভাল্‌ভ আর ইঞ্জিনরুম নন-রিটার্ন ভাল্‌ভ খুলে দিলেই লুকিয়ে ফেলা যায় যে কোন জাহাজ।'

'তুমি বলতে চাও ডুবিয়ে দেয়?'

'হ্যাঁ। রত্নদ্বীপের পুবে সাতু লাগিতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে তিনটে জাহাজকেই। মাঝরাতে খুলে দেয়া হয়েছে ভাল্‌ভগুলো, তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই অসংখ্য বুদ্বুদ তুলে তলিয়ে গেছে ওগুলো।'

'রত্নদ্বীপ···রত্নদ্বীপ···' উত্তেজিত হয়ে উঠল এমালি। 'আবদুল গনি ইলাহুদে থাকেন ওখানে! উনিও কি···'

'হ্যাঁ। উনিও আছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে না হলেও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন উনিও। গতকাল বিকেলে গিয়েছিলাম আমি ওখানে হেলিকপ্টারে করে। দেখা হয়েছে। কিন্তু কোনরকম কথা বের করতে পারিনি। তাঁর মেয়ের কাছ থেকেও না।'

'তাঁর মেয়ে? ডোডি ইলাহুদের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। বাপ-বেটি থাকে রত্নদ্বীপের অরক্ষিত দুর্গে। চমৎকার মেয়ে। কিন্তু প্রাণভয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে ওর মুখ। সারাক্ষণ মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে সে গত তিন-চার মাস।'

'কেন? ওর ভয় কিসের?'

'ওর বড় ভাই আবদুর রশিদ ইলাহুদে আর হবু স্বামী নিকো সিমান্দজুনতাক প্লেন ক্র্যাশে মারা গেছে বলে খবর রটানো হয়েছে, না? আসলে বন্দী করে রাখা হয়েছে ওদের। এদের বন্দী করে রেখে বাপ-বেটি দু'জনকেই ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে। টাকা দিয়ে কেনা যেত না এদের, তাই এই কৌশল করতে হয়েছে ওসমান খানকে। এখন রত্নদ্বীপটা ব্যবহার করছে ওরা ইচ্ছেমত, টুঁশব্দ করতে পারছেন না ন্যায়নিষ্ঠ সত্যবাদী আবদুল গনি ইলাহুদে। বুঝেছ?'

বুঝেছে এমালি। মুখে যতই প্রশ্ন তুলুক মনে মনে সে জানে কথাগুলো মোটেই অযৌক্তিক নয়, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল সে। 'কিন্তু সবার মুখ তো আর বন্ধ রাখা সম্ভব নয়! মানুষ এভাবে গায়েব হয়ে যাবে, কেউ···'

'ভুলে যাচ্ছ কেন, এরা রীতিমত আটঘাট বেঁধেই নেমেছে। একটা মাস্টার-মাইন্ড কাজ করছে এর পিছনে। কেউ বলতে পুলিস বোঝাতে চাইছ তো? সার্জেন্ট আহমেদ সুদীরুকেও হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে ওরা। টাকা দিয়ে যাদের কেনা যায় না তাদের হাতের মুঠোয় আনতে হলে ব্ল্যাকমেল ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। ফজলের ছোট দুই ভাই মাছ ধরতে গিয়ে নৌকাডুবিতে মারা যায়নি, ওদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে সার্জেন্ট আহমেদ সুদীরুকে বাগে আনবার জন্যে। সমস্ত ছোটখাট দুর্ঘটনা চাপা দেয়া হয়েছে এই কৌশলে। পুলিস হাতে থাকলে আর পুলিসের ভয় থাকবে কি করে?'

'হতেই হবে।' বলল এমালি ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে। 'এ-ই হয়েছে! সবকিছু মিলে যাচ্ছে। এমন কি সময় পর্যন্ত!'

রানা বুঝল মনে মনে হিসেব করে দেখছে এমালি কবে কবে ওকে বন্দরে নামিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল Sirrus এবং সেইসব তারিখের সঙ্গে জাহাজ খোয়া যাবার তারিখের, জেলে বোটগুলো খোয়া যাবার তারিখের সম্পর্ক বুঝতে পারছে। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব কথা।

'কিন্তু…' আপন মনেই বলল এমালি। 'কিন্তু এখন আর বুঝতে পেরে কি লাভ! রানা, এবার তোমার ওপর আক্রমণ চালাবে ওরা। সাতু লাগির আশেপাশে কিছু একটা সন্দেহ করেছ তুমি জানে ওরা। হয় পালিয়ে যাবে…'

'কিন্তু আমরা যে সাতু লাগি বা রত্নদ্বীপকে সন্দেহ করছি একথা তো আর জানে না ওরা?' বলল রানা।

'জানে। হুইল হাউসে কমোডোর বলেছেন আমাকে। তোমার সামনেই তো। মনে নেই?' একটু অবাক হলো এমালি।

রানাও অবাক হলো নিজের বোকামি বুঝতে পেরে। এই প্রশ্ন করাই উচিত হয়নি ওর। গত চব্বিশ ঘণ্টার অমানুষিক পরিশ্রমকেই দায়ী করল সে মনে মনে।

'হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু পালাতে পারবে না ওরা। আগামী দুই দিনের মধ্যেও ওদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে রাতে Triton-কে ডুবিয়েছে ওরা সে রাতে নিশ্চয়ই কাজ করতে পারেনি? পরের দুইদিন কি পরিমাণ ঝড়বৃষ্টি গেল তা তো জানোই—এর মধ্যে সাতু লাগির মত এলাকায় ডুবুরি নামানো অসম্ভব। আসলে কাজ আরম্ভ করেছে ওরা গত রাতে। এখনও স্ট্রংরুম ভাঙার চেষ্টাতেই ব্যস্ত—মাল উদ্ধার করতে পারবে না ওরা আগামী রাতের আগে। যার জন্যে এত কষ্ট এত পরিশ্রম, সে জিনিস ফেলে রেখে কিছুতেই যাবে না ওরা। যদি কালকের মত কুয়াশা থাকত তাহলে হয়তো দিনের বেলায়ও ডাবল শিফটে কাজ চালিয়ে যেতে পারত—কিন্তু আজ দুপুর নাগাদ রোদ উঠে পড়বে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, কুয়াশার লেশমাত্র থাকবে না দুপুরের পর থেকে,' একসাথে এত কথা বলে নিজের ভুল সংশোধন করল রানা। একটা কথা ফসকে বেরিয়ে গিয়ে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল সেটা কেটে গেল বেমালুম।

'পালিয়ে যাবে না বুঝতে পারলাম, কিন্তু আক্রমণ করতে বাধা

কোথায়?' বলল এমালি একটু চুপ করে থেকে।

'বাধা নেই। বাধা দেবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। তাই কৌশল করেছি আমরা একটা। সার্জেন্ট সুদীরুকে দিয়ে ওদের খবর দিয়েছি যে আমরা মুনা আর মালাদ্বীপের দিকে যাচ্ছি, এখান থেকে বানজুয়াঙ্গি গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে আনব। ওরা মনে করেছে এতক্ষণে আমরা বানজুয়াঙ্গির দিকে রওনা হয়ে গেছি। ফলে প্রচুর সময় আছে মনে করবে ওরা—ধীরেসুস্থে উদ্ধার করবে লুটের মাল।'

'রত্নদ্বীপে কি পাওয়া গেল আজ রাতে?' জিজ্ঞেস করল এমালি।

'বিশেষ কিছুই না। তবে যথেষ্ট।' সব কথা বলা ঠিক হবে না মনে করে সত্যের কানে একটু মোচড় দিল রানা। 'আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সাঁতরে গিয়ে বোটহাউসে ঢুকেছিলাম আমি। ভেতরে বিরাট ব্যাপার-স্যাপার। প্রচুর ডীপ সী ডাইভিং-এর যন্ত্রপাতি দেখলাম।'

'ডাইভিং ইকুইপমেন্ট কেন?'

'বাহ্, সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে—সীতা কার বাপ? রত্নদ্বীপের বোটহাউসটাই তো ওদের ঘাঁটি। ওখানে থেকেই ডাইভিং বোটে করে ডুবুরি নিয়ে গিয়ে সাতু লাগিতে ডুবিয়ে দেয়া জাহাজ থেকে মাল তোলা হয়।'

'ব্যস, এই দেখেই ফিরে এলে?'

'আর বিশেষ কিছু দেখার ছিল না। দুর্গের ভেতরটাও দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দু'একটা লম্বা সিঁড়ি আছে দুর্গের ভেতর, ঠিক ওটার পায়ের কাছে অটোমেটিক কারবাইন হাতে নিয়ে বসে ছিল একটা গার্ড। আর এগোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মনে করে কেটে পড়লাম।'

'খোদা! কি সাংঘাতিক সব ব্যাপার!' বলল এমালি। 'অথচ··· অথচ একটা ট্রান্সমিটারও নেই যে বাইরে থেকে সাহায্য চাইবে তুমি কারও। কি করবে এখন? কি করতে যাচ্ছ তুমি, রানা?'

'দিনের বেলাটা কিছুই করব না। শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করব আর তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে বিকেল বেলাটা বেড়াব তোমার সাথে সাগর পারে। কিন্তু রাতের বেলা আরম্ভ হবে কাজ। কর্ণফুলী নিয়ে রত্নদ্বীপের দুর্গ আক্রমণ করব আমরা আজ। সেলুনের একটা ফাঁপা জায়গায় দুটো বেরেটা সাব-মেশিনগান লুকানো আছে। ওই দুটো নিয়েই আক্রমণ চালাব আমি আর কমোডোর। বোটহাউসের দরজা বিশেষ শক্ত নয়, দেখে এসেছি। বন্ধ থাকলেও অসুবিধে নেই, মড়মড় করে ঢুকে পড়ব আমরা কর্ণফুলী নিয়ে। যদি আলো না দেখি, তাহলে অপেক্ষা করব আমরা দূরে কোথাও—যেই আলো জ্বলে উঠবে বোটহাউসের মধ্যে অমনি বুঝব ডাইভিং শেষ করে ফিরে এসেছেন মহারথীরা। আমার যতদূর বিশ্বাস আজই তিন জাহাজের সমস্ত ধনরত্ন একত্র করে ভেগে পড়বার চেষ্টা করবে ওরা। ঠিক যখন লোডিং চলছে সে সময় আমরা ঢুকে পড়ব ভেতরে। অবাক হয়ে যাবে ওরা এরকম অতর্কিত আক্রমণে। সেই বিস্ময়েরই সুযোগ নেব আমরা আসলে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ব দু'জন দুটো সাব-মেশিনগান নিয়ে।'

'মারা পড়বে! ঠিক মারা পড়বে তুমি, রানা!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল এমালির চোখ। পায়ের দিক থেকে উঠে চলে এল সে মাথার কাছে, 'প্লীজ! রানা! আমি বলছি, ঠিক মারা পড়বে তুমি। এই অসম্ভব কাজ করতে যেয়ো না কিছুতেই। আমার কথা রাখো। আমি অনুরোধ করছি, যেয়ো না তুমি।'

'যেতেই হবে আমাকে, এমালি। হাতে যে সময় নেই! এছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের।'

'প্লীজ, রানা!' চকচক করছে এমালির চোখদুটো। কান্নার পূর্বাভাস। 'আমার খাতিরে...দয়া করো আমাকে না হয়।'

'না,' টপ করে এক ফোঁটা গরম পানি পড়ল রানার কপালে। 'অন্য যে-কোন কাজ বলো, বিনাদ্বিধায় করব আমি তোমার খাতিরে। তোমার জন্যে সব করতে পারব আমি। শুধু এই একটি ব্যাপারে বাধা দিয়ো না তুমি আমাকে।'

উঠে দাঁড়াল এমালি। হাতদুটো আলগাভাবে ঝুলছে দুই কাঁধ থেকে। চোখের পানি গোপন করবার চেষ্টা করল না সে। শুধু বলল, 'এমন ভয়ঙ্কর উদ্ভট আত্মঘাতী প্ল্যান জীবনে শুনিনি আমি,' বলেই মোমবাতিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল রানা চিৎ হয়ে শুয়ে। সত্যিই এমন ভয়ঙ্কর প্ল্যানের কথা রানাও শোনেনি কোনদিন। ভাগ্যিস এই প্ল্যানমাফিক কাজ করতে হবে না তাকে।

দশ

রাত পৌনে এগারোটা।

বেলা পৌনে এগারোটা পর্যন্ত সেঁটে ঘুম দিয়েছে মাসুদ রানা। তারপর স্বর্ণোজ্জ্বল আটটি ঘণ্টা কাটিয়েছে এমালি রুসমানের সাথে। কেবল কথা আর কথা। আর স্বপ্ন।

নিজের হাতে রান্না করেছে এমালি। ফাই-ফরমাশ দিয়ে খাটিয়ে মেরেছে ফজল আর রানাকে। খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট ফুঁকছেন কমোডোর জুলফিকার—মাঝে মাঝে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু ভাগিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁকে বকাঝকা দিয়ে।

দুপুরে একসাথে খাওয়া দাওয়া সেরে ফজল চলে গেছে ওর কামরায় গোপন ট্রান্সমিটারের কাছে, কমোডোর গোটা কয়েক নারকেল গাছের ছায়ায় জুতমত খাটিয়া পেতে নিয়ে নাক ডাকিয়েছেন, আর রানা বেরিয়ে পড়েছে এমালিকে নিয়ে। পাহাড়ে, জঙ্গলে, সাগরপারে টৈ-টৈ করে বেড়িয়েছে ওরা সারাটা দিন। হাওয়ায় ভেসে গিয়েছে প্রহরগুলো।

গল্প আর ফুরোতেই চায় না। গল্প আর হাসি। হঠাৎ হাতেহাতে ছোঁয়াছুঁয়ি

হয়ে গেছে দু'জনের কখনও। দু'জনেই সচকিত হয়ে ভেবেছে—এ কী হলো! এমন লাগছে কেন? ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমেছে মালাদ্বীপে। আঁধার হয়ে এসেছে এমালির মুখ। প্রাণবন্ত তাজা ফুল সারাদিন ঝাঁঝাল রোদে ফেলে রাখলে যেমন শুকিয়ে আসে, ঠিক তেমনি শুকিয়ে এসেছে এমালির মুখ। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল হাসি, ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল কথা। গত তিন চার ঘণ্টা একটি কথাও বলেনি এমালি কারও সঙ্গে।

রাত পৌনে এগারোটা। আর পনেরো মিনিট পরেই রওনা হবে কর্ণফুলী রত্নদ্বীপের উদ্দেশে। নিজের ঘরে এসে প্রস্তুত হচ্ছে রানা, এমন সময় ঘরে ঢুকল এমালি।

'আমিও যাব।' হঠাৎ জেদ ধরল এমালি।

'তা হয় না, এমালি। তোমাকে থাকতেই হবে। আমি দুঃখিত, কিছুতেই সঙ্গে নিতে পারব না তোমাকে,' বলল রানা। 'হাওয়া খেতে যাচ্ছি না আমরা, তুমি তো জানোই। গোলাগুলি চলবে। আমার চোখের সামনে তোমাকে গুলি খেয়ে মরতে দেখতে চাই না আমি।'

'নিচে থাকব না হয় আমি।' করুণ মিনতি এমালির চোখে। 'তোমাদের কাজে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করব না, কোন ক্ষতিও হবে না আমার। আমাকে সাথে নাও রানা, প্লীজ!'

'না।'

'আমার জন্যে সব করতে পারবে বলেছিলে, মনে আছে?'

'এইভাবে আমাকে বিপদে ফেলা উচিত হচ্ছে না তোমার, এমালি। তোমার ভালর জন্যে সবকিছু করতে রাজি আছি আমি। ক্ষতি করবার জন্যে কিছুই করতে রাজি নই। তুমি তা ভাল করেই জানো, এমালি। তোমার অমঙ্গল আমি চাই না।'

বিচিত্র দুই চোখ মেলে চাইল এমালি রানার চোখের দিকে।

'আমার জন্যে এতটা ভাব তুমি!' নিচু ফ্যাসফেঁসে অথচ কোমল এমালির কণ্ঠস্বর।

মাথা নাড়ল রানা।

'তোমার কাছে আমার এত দাম!'

মাথা নাড়ল রানা আবার।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এমালি। অনেকক্ষণ। আরও কিছু বলবার জন্যে ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কথা বের হলো না। গালদুটো কুঁচকে গেল খানিকটা। তারপর হঠাৎ এক পা সামনে এগিয়ে এসে দুই হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরে ভেঙে ফেলবার উপক্রম করল ঘাড়টা। অন্তত মিসিরের আক্রমণের পর এই আক্রমণটা সেই রকমই লাগল রানার কাছে। কিন্তু আসলে ঘাড় ভাঙার চেষ্টা করছে না এমালি, বুঝতে পারল রানা, যাকে কোনদিন আর দেখতে পাবে না তার প্রতি এটা শেষ বিদায় আলিঙ্গন। নিশ্চয়ই এমালি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছে সাতু লাগির পানিতে ভেসে যাচ্ছে রানার লাশ···উপুড় হয়ে রয়েছে আড়ষ্ট শরীরটা···

দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল রানার। ঠিক যখন এই মায়াবী পৃথিবীর মায়া-মমতা-বন্ধন কতমধুর, নারীর উষ্ণ কোমল আকর্ষণ কত অদ্ভুত, এই জীবন কত লোভনীয়, তবু মায়া কাটাতে হয় মানুষকে, ইত্যাদি কথা ভাবতে গিয়ে ছটফট করে উঠল রানার মনের ভেতরটা—তখন ছেড়ে দিল ওকে এমালি। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দড়াম করে এমালির ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। হঠাৎ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগায় চেয়ে দেখল রানা বুকের কাছে শার্টটা ভিজিয়ে দিয়ে গেছে মেয়েটা।

আলো দেখেই সোজা এগিয়ে গেলেন কমোডোর। গেটটা বন্ধ, কিন্তু ইংরেজী 'T' র মত একটা রেখা দেখা যাচ্ছে। স্রোতের বেগ, বাতাসের গতি, জোয়ারের উচ্ছ্বাস—সবকিছু হিসেব করে সাবধানে এগোতে হচ্ছে, কারণ সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই সবকিছু ভেস্তে যেতে পারে। বোটহাউসের মুখটা বড়জোর বিশফুট—হিসেবে গোলমাল হলেই পাথরে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে কর্ণফুলী।

হুইল হাউসের দু'পাশের দরজাই খোলা। রানা দাঁড়িয়ে আছে ডানদিকের দরজার কাছে। হাতে বেরেটা সাব-মেশিনগান। কমোডোরের বাম পাশে মেঝেতে রাখা আছে আরেকটা সাব-মেশিনগান। একটি বাতিও জ্বালা হয়নি সারা ইয়টে। ফ্লাইং ডাচম্যানের ভৌতিক জাহাজ যেন এটা।

লোহার দরজা খুলল না, হিঞ্জ থেকে ভেঙে খসে এল। ঢুকে পড়ল কর্ণফুলী বোটহাউসের মধ্যে। ঢুকেই ইঞ্জিন নিউট্রাল করে দিয়ে পাঁচ ইঞ্চি সার্চলাইটটা অন করে দিলেন কমোডোর। থমকে গেল ভেতরের সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য। লাফিয়ে বেরিয়ে এল রানা ডেকের উপর। বামপাশের দরজা দিয়ে ওপাশে বেরিয়ে গেছেন ততক্ষণে কমোডোর। হাতে সাব-মেশিনগান।

আপন গতিতে ঘাটে এসে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল কর্ণফুলী। ডাইভিং বোটে মাল তোলা হচ্ছিল—থমকে গেছে সবাই। কেউ বাক্স মাথায় নিয়ে, কেউ আরেকজনের মাথায় এক বাক্স তুলে দিতে গিয়ে। ক্যাপ্টেন ইমরান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সুপারভাইজ করছিল, জমে গেল সে পাথরের মূর্তির মত। আরও দু'জন তার পাশে ছিল, তারাও।

'খবরদার!' চিৎকার করে সাবধান করল রানা। এগিয়ে গেল কয়েক পা যাতে ওর হাতে কি আছে দেখতে পায় ক্যাপ্টেন। 'সামনে এগিয়ে এসো, ক্যাপ্টেন ইমরান। তোমরা তিনজন। আর সবাইকে জানিয়ে দাও, কেউ যদি এক পা নড়ে তাহলে তোমাদের তিনজনকেই শেষ করে দেব। খুন করতে দ্বিধা করব না সেকথা নিশ্চয়ই টের পেতে বাকি নেই তোমার? কাজেই সাবধান। মাত্র পনেরো বছরের জেল হবে তোমার—তার চেয়ে তোমাকে এখানেই শেষ করে দেয়ার সুযোগ পেলে বেশি খুশি হব আমি। কথাটা বিশ্বাস করতে পারো।'

'বিশ্বাস করি।' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আদেশ দিল ক্যাপ্টেন ইমরান যেন কেউ না নড়ে। 'তোমাকে সেদিন Triton-এর ডেকের উপরই খুন করা উচিত ছিল মিসিরের। তাহলে আর এতকিছু ঘটত না।'

‘চেষ্টার ত্রুটি করেনি মিসির। কিন্তু পারেনি। তুমিও চেষ্টা করে পারোনি, ক্যাপ্টেন ইমরান। বাঙালী এক গর্দভ স্পাইয়ের সাথে টেক্কা দিয়ে হেরে গেল তোমাদের ইহুদি ধুরন্ধর ব্রেন। এই শয়তান দুটো কে? ইসরাইল ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের লোক না?’ অবাক হয়ে চাইল লোক দু’জন রানার মুখের দিকে। রানা বুঝল ঠিকই আঁচ করেছে সে। ‘কেমন চুনকালি পড়বে এবার তোমাদের দেশের মুখে কল্পনা করতে পারো? যাক, একজন একজন করে উঠে এসো এই ইয়টে। হ্যাঁ তুমি আগে, কিন্তু সাবধান…’

‘একচুলও নড়বে না! সাবধান!’ কথা বলে উঠল কেউ রানার একহাত পিছন থেকে। শিরদাঁড়ার উপর পিস্তলের নলের চাপ অনুভব করতেই বুঝতে পারল রানা স্বপ্ন নয়, সত্যি। ‘এবার এক পা সামনে বাড়ো। তারপর ডান হাতটা সরিয়ে নাও মেশিনগান থেকে।’

এক পা সামনে বাড়াল রানা, ডান হাতটা সরিয়ে নিল ট্রিগারের উপর থেকে—কারণ এ আদেশ অমান্য করা যায় না। ব্যারেলের কাছে বাম হাতটা রইল কেবল।

‘এবার ডেকের উপর নামিয়ে রাখো ওটা।’

আদেশ পালন করল রানা। কারও আদেশ ছাড়াই ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলল দুই হাত, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে এমালি। ভেজা কাপড়।

‘বাহ্, এমালি খান!’ পরাজয়ের গ্লানি ফুটে উঠল রানার মুখে। ‘তোমাকে তো আশা করিনি! গ্ল্যাড টু মিট ইউ।’ মুখের ভাব পরিবর্তন হলো না এমালির। চোখদুটো স্থির হয়ে আছে ওর মুখের উপর। ‘হঠাৎ কাঠ ফুঁড়ে বেরোলে কি করে?’

‘সাঁতরে উঠেছিলাম আমি কর্ণফুলীতে। আফটার কেবিনে লুকিয়ে ছিলাম এতক্ষণ।’

‘তাই নাকি? তা ভেজা জামা-কাপড়গুলো এবার বদলে ফেললেই পারো।’

কোন জবাব দিল না এমালি এ কথার। ক্যাপ্টেন ইমরানের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল এবার।

‘খেলনাটা আপনিও নামিয়ে রাখুন, রিটায়ার্ড কমোডোর জুলফিকার।’

‘যা বলছে করুন, স্যার।’ কমোডোর তার দিকে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চাইতেই বলল রানা। নামিয়ে রাখলেন তিনি সাব-মেশিনগান।

এবার বাঁকা হাসি ঠোঁটে টেনে এনে বেশ খানিকটা কাছে এগিয়ে এল তিনজন। কমোডোরকে আদেশ দিতেই সার্চলাইটটা নিবিয়ে দিলেন তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গে বোটহাউসের উজ্জ্বল আলোয় প্রত্যেকের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল রানা। ঝটপট ছয়-সাতটা পিস্তল বেরিয়ে পড়ল ছয় সাতজনের হাতে। ডাইভিং বোটের হুইল হাউস থেকে একখানা অটোমেটিক কারবাইন তাক করে ধরল একজন এই দিকে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে [illegible]

কণ্ঠে বলল রানা, 'আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলে তোমরা!'

'নিশ্চয়ই! তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।' বলল ক্যাপ্টেন ইমরানের পাশের দামী পোশাক পরা লোকটা। 'এমন কি ঠিক কতটা কয় মিনিটে পৌঁছবে তা-ও জানতাম আমরা।'

'কি করে?'

'এটাও যে না বোঝে তাকে গর্দভ আখ্যা দিলে তার দুঃখ পাওয়া উচিত নয়। এমালি। এমালি খানের কাছ থেকে সবকিছু জানতে পেরেছি আমরা।'

'তার মানে, মিসেস এমালি খানকে তোমরাই পাঠিয়েছিলে?'

'কেবল পাঠিয়েছিলাম তা নয়, টোপ হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। সঙ্গে একখানা ছোট ট্রান্সমিটার আর ওই পিস্তলটাও দিয়ে দিয়েছিলাম পলিথিন ব্যাগে ভরে। তোমরা তো বেশ ফার্স্টক্লাস ট্রান্সমিটার ব্যবহার করো হে! ওই ক্ষুদ্র সংস্করণটা তোমাদেরই ইয়টের ইঞ্জিনরুম থেকে উদ্ধার করেছিলাম আমরা গতকাল বিকেলে।' হেসে উঠল লোকটা। 'মাছের তেলেই মাছ ভাজা আর কি! মাতারাম ছাড়ার পর তোমাদের প্রতিটা গতিবিধি জানতে পেরেছি আমরা। সার্জেন্টের বাচ্চা ফজল সুদীরুকে খতম করে দেবার জন্যে মিসিরকে পাঠানো হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। কেমন লাগছে এখন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ অপারেটার, মেজর মিস্টার মোহাম্মদ মাসুদ রানা?'

'ভাল লাগছে না।' সত্যি কথাটা বলে ফেলল রানা। 'এখন আমাদের নিয়ে কি করা হবে জানতে চাই।'

'কেন, সেটা কি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে খুব?' আবার হাসল লোকটা। 'ডুডু খাও নাকি এখনও তুমি? যাক, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এই জায়গা খুঁজে বের করলে কি করে তুমি?'

'খুন করে ফেলো, কথা বের করতে পারবে না।'

'তাহলে আমি ইসরাইল ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স চীফ পাকিস্তান ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স চীফের ডান পায়ের হাঁটুর নিচে একটা গুলি করব প্রথমে, দুই মিনিট অপেক্ষা করে ডান পায়ের হাঁটুর নিচে আরেকটা গুলি করব। তারপর অপেক্ষা করব আরও এক মিনিট...'

'ঠিক আছে। বলছি, Triton-এ ট্রান্সমিটার নিয়ে লোক ছিল আমাদের।'

'ওসব জানা আছে আমাদের। রত্নদ্বীপ খুঁজে বের করলে কি করে?'

'খুব সহজে। বীচক্র্যাফটটা সমুদ্রে ফেলে দেয়ার পর মাটিতে যে দাগ পড়েছিল সেটা মুছে ফেলা উচিত ছিল তোমাদের। হেলিকপ্টার থেকে দাগটা পেয়েছিলাম আমি।'

'ব্যস? এই?'

'ডোডি এবং আবদুল গনি ইলাহুদেকে আরও একটু সুখে রাখা উচিত ছিল তোমাদের। বাকিটুকু ওদের চেহারা দেখেই বোঝা গেছে।'

'আর কিছু নেই?' জিজ্ঞেস করল ইসরাইল ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ। মাথা নাড়ল রানা।

'আমার মনে হয় ও ঠিকই বলছে, স্যার। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।' বলল ক্যাপ্টেন ইমরান। 'ওর কাছ থেকে যা জানার জানা গেছে। মাসুদ রানাকেই তো প্রথম, স্যার?' বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না কর্মবীর ক্যাপ্টেন ইমরান।

মাথা ঝাঁকাল INI চীফ। চট করে বলল রানা, 'দুটো প্রশ্ন আছে আমার। তোমাদের মত আমিও প্রফেশনাল। জেনে মরতে চাই আমি।'

'দুই মিনিট।' মৃদু হেসে বলল INI চীফ। 'তাড়াতাড়ি সারতে হবে। কাজ পড়ে আছে আমাদের।'

'ওসমান খান কোথায় ওর তো এখানে থাকা উচিত ছিল, নেই কেন?'

'আছে। দুর্গের বৈঠকখানায় গল্প করছে আবদুল গনি ইলাহুদের সঙ্গে। পশ্চিম ঘাটে নোঙর করা আছে Sirrus.'

'আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ইসরাইলের এর মধ্যে কি ইন্টারেস্ট?'

'কি ইন্টারেস্ট মানে? ইসরাইল ছাড়া আর কার ইন্টারেস্ট থাকবে এর মধ্যে? সবটাই আমাদের ইন্টারেস্ট। মুখে বড় বড় বুলি ঝাড়ছি আমরা ঠিকই, কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে ফতুর হয়ে গেছি আমরা গত আরব ইসরাইল যুদ্ধে। একেবারে দেউলিয়া। তাই বিভিন্নভাবে টাকা জোগাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার উপর ভার পড়েছে এদিকটার। আরও বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দিকে কাজ করছে। হুকুম হয়েছে যে-কোন পন্থায়, পাপ-পুণ্য-ন্যায় অন্যায়ের বাছ বিচার না করে যেমনভাবে পারি টাকা জোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে দেশে…'

'তাই বলে ডাকাতি?'

'তোমাদের কাছে এটা ডাকাতি। আমাদের কাছে এটা মহান দেশপ্রেম। আমরা কয়েকজন দেশপ্রেমিক লোক দেশের স্বার্থে দখল করে নিচ্ছি এক আধটা জাহাজ বুদ্ধি এবং শক্তিবলে, এতে অন্যায়ের কি আছে? দেশের কাজ করছি আমরা। এবং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গেই করছি, কি বলো? যাক আর দেরি করা যায় না।'

এমালির দিকে ফিরল রানা। পিস্তলটা এখনও ধরা আছে রানার দিকে। বলল, 'আমাকে এখুনি মেরে ফেলবে এরা, এমালি। তুমিই যখন ধরিয়ে দিলে, তখন না হয় তোমার হাতেই মরি। মারো!' পিস্তল ধরা হাতটা ধরল রানা। খানিকটা উপরে তুলে ঠিক হার্ট বরাবর এনে দিয়ে ছেড়ে দিল হাতটা। 'মারো এবার।'

সারা বোট-হাউসের প্রত্যেকটা চোখ এখন রানার উপর। ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন কমোডোর জুলফিকার। 'তুমি খেপেছ, রানা! মেরে ফেলবে ও! ও তো ওদেরই একজন!'

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি এমালির চোখে। আঙুলটা সরে গেল ট্রিগার থেকে। ধীরে ধীরে খুলে গেল হাত। খসে পড়ল পিস্তলটা ডেকের উপর। এমালির বাম হাতটা ধরল রানা। বলল, 'পারলে না, মিসেস এমালি খান। পারলে না তুমি। অন্যলোক দরকার। তোমার দ্বারা…'

প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিল রানা। ছিটকে হুইল-হাউসের মধ্যে গিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল এমালি। সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল রানাও। কমোডোরও একলাফে চলে এলেন ভিতরে। দড়াম করে মেঝের উপর আছড়ে পড়েই আগে থেকে ফিট করে রাখা মাইক্রোফোনটা হাতে তুলে নিল রানা।

'খবরদার! কেউ গুলি ছুঁড়বে না!' গমগম করে উঠল রানার গলা বোট-হাউসের মধ্যে। 'একজন গুলি ছুঁড়লেই সবাই মারা পড়বে। তোমাদের প্রত্যেকের পিঠের দিকে লক্ষ্য করে ধরা আছে একটা করে সাব-মেশিনগান। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াও সবাই, মুখ ঘুরলেই দেখতে পাবে।'

এবার হাঁটু গেড়ে উঠে বসল রানা। হুইল-হাউসের জানালা দিয়ে অতি সাবধানে একটা চোখ বের করল সে। একনজর দেখেই নির্ভয়ে উঠে দাঁড়াল এবার। কমোডোরকে বলল, 'উঠে পড়ুন, স্যার। খেল্ খতম।'

বেরিয়ে এল রানা বাইরে। বারোজন ভূত দাঁড়িয়ে আছে মেশিন-পিস্তল হাতে। কালো ইউনিফরম, কালো টুপি, কালো জুতো পরা প্রকাণ্ড চেহারার বারোজন লোক। সারা মুখে আর হাতে কালি মাখা। চোখের সাদা অংশটুকুতে কেবল কালি মাখাতে পারেনি—চকচক করছে। মেশিন-পিস্তলগুলো স্থির নিষ্কম্প।

'সবাই হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দাও।' হুকুম দিল মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ানো একজন ভূত। 'সাবধান! আমার লোকগুলো হাইলি ট্রেনড স্পেশাল কম্যান্ডো। বিন্দুমাত্র সন্দেহের ওপরেই গুলি ছুঁড়বে এরা। জখম বা কানা-খোঁড়া করবার ট্রেনিং এদের দেয়া হয়নি—এরা কেবল হত্যা করতে জানে।'

নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করল সবাই ভূতটার কথা। টপাটপ হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে পাথরের মূর্তি বনে গেল সব ক'জন।

'এবার দুই হাত ঘাড়ের পেছনে তুলে ফেলো।'

সবাই আদেশ পালন করল। কেবল একজন বাদে। ক্যাপ্টেন ইমরান। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

কাউকে কিছু বলতে হলো না। ক্যাপ্টেন ইমরানের সবচেয়ে কাছে যে ভূতটা ছিল নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল সে। মেশিন-পিস্তলের বাঁট দিয়ে কিছু একটা করল সে। আধ মিনিট পর পাঁজরে লাথি খেয়ে ক্যাপ্টেন ইমরান যখন মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তখন দুই পাটির তিন দুগুণে ছয়টা দাঁত তার অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঘাড়ের পেছনে হাত তুলে দাঁড়াল সে-ও।

'মেজর মাসুদ রানা?' জিজ্ঞেস করল কম্যান্ডো লীডার।

'প্রেজেন্ট প্লীজ।' হাত উঠাল রানা।

হেসে ফেলল কম্যান্ডো লীডার। বলল, 'ক্যাপ্টেন সিরাজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, স্যার।'

'গুড! দুর্গের খবর কি, ক্যাপ্টেন?'

'আমাদের হাতে।'

'Sirrus?'

'আমাদের হাতে।'

'বন্দীরা?'

'দু'জন গেছে ছাড়িয়ে আনতে।'

'গুড,' বলল রানা। 'এদেরকে দেয়ালের দিকে মুখ করে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিন। তারপর এক এক করে বেঁধে ফেলুন। কর্ণফুলীর ইঞ্জিনরুমে বাঁধা আছে দুটো, ওদেরও নিয়ে আসতে বলুন। কেবিনে একজন ঘুমোচ্ছে, তাকে যেন ডিসটার্ব না করা হয়।'

এক মিনিটের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল সবাই পশ্চিম দিকে মুখ করে। কর্ণফুলী থেকে নেমে এল ওরা তিনজন। দুইজন কম্যান্ডো গেল বন্দী দু'জনকে নিয়ে আসতে। কমোডোরের পরিচয় দিতেই ঝটাং করে বুট ঠুকে দেখার মত এক স্যালুট লাগাল ক্যাপ্টেন সিরাজ। খুশিতে উদ্ভাসিত কমোডোরের মুখ। পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি ক্যাপ্টেনের।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মাই বয়।' বয়টা কমোডোরের চেয়ে ঝাড়া একহাত বেশি লম্বা। 'ওয়েল ডান। ফার্স্টক্লাস অপারেশন। ঠিক সময়মত পৌঁছেছ তোমরা।' চোখ পড়ল তাঁর সিঁড়ির দিকে। 'এই দ্যাখ, এসে পড়েছে সবাই।'

সবাই মানে চারজন পরাজিত গার্ড, তার পিছনে ওসমান খান, তার পিছনে মেশিন-পিস্তল হাতে ক্যাপ্টেন সিরাজের চারজন লোক এবং সবশেষে ডোডি আর আবদুল গনি ইলাহুদে। এগিয়ে গেলেন কমোডোর।

'এই যে ওসমান, এই যে গনি। গ্ল্যাড টু মিট ইউ অ্যালাইভ। আরে, আমার চাচুমণি দেখছি কত বড় হয়ে গেছে!' ডোডির থুতনি নেড়ে দিলেন কমোডোর। 'তোমরা সব বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছ কেন? বুঝতে পারছ না, রানার এক ঘোড়ার চালেই মাত হয়ে গেছে ব্যাটারা? আর কোন চিন্তা নেই।'

'কিছু বুঝতে পারছি না আমি, জুলফিকার।' বললেন আবদুল গনি ইলাহুদে। 'কালো কালো সব লোক কেন? তুমিই বা এলে কোত্থেকে? তোমার লোক এরা? ধরে ফেলেছ ওদের সবাইকে? আমার ছেলে রশিদ কোথায়? আর সিমান্দজুনতাক? ব্যাপারটা...'

কড়াৎ করে দূরে একটা শব্দ হলো। রানা বুঝল বি-হাইভ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করা হচ্ছে এখন।

'এক্ষুণি এসে যাবে ওরা। আর কোন ভয় নেই, গণি। সবকিছু এখন আমাদের কন্ট্রোলে।' ওসমান খানের দিকে ফিরলেন কমোডোর। 'ওসমান তুমি...'

'কেন এই কাজ করতে গেলে, জুলফিকার?' কাতর কণ্ঠে বলল ওসমান খান। 'খোদা! কেন করলে? তুমি জানো না, জুলফিকার, কি ক্ষতি করেছে আমার।'

'মিসেস খানের কথা ভাবছ তো? মানে আসল মিসেস ওসমান খান? করাচীতে নিয়ে আসা হয়েছে ওঁকে আজ বিকেলে। রীতিমত ভাল আছেন উনি।'

'কি যা তা বলছ, জুলফিকার! আমার স্ত্রী...'

'জানি, বাবা, সব জানি,' বললেন কমোডোর দুই হাত তুলে। 'তোমার স্ত্রী এখন করাচীতে। এমালি হচ্ছে এমালি রুসমান, আগেও তাই ছিল, এখনও তাই আছে। ও তোমার স্ত্রী নয়, বিয়েই হয়নি তোমার এমালির সঙ্গে। সব জানি। তোমার স্ত্রী ছিলেন লাহোর মেন্টাল হসপিটালে, একদল ইহুদি জলদস্যু তাঁকে কিডন্যাপ করে লুকিয়ে রেখে ভয় দেখিয়েছে তোমাকে—সাহায্য না করলে মেরে ফেলবে তোমার স্ত্রীকে। ফলে বাধ্য হয়েছ তুমি ওদের সাহায্য করতে। মাঝখান থেকে হঠাৎ একদিন তোমার স্ত্রী পালিয়ে গেলেন ওদের হাত থেকে ছুটে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করল ওরা তাঁর খালাতো বোন এমালিকে। বয়সে ছোট হলেও এমালি ছিল তাঁর অসম্ভব আদরের বোন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল এদের মধ্যে। এমালিকে খুন করবার ভয় দেখাতেই ওদের হাতে আবার ধরা দিলেন মিসেস মারিয়া খান। কিন্তু এমালিকে ছাড়ল না ওরা। কাজের সুবিধের জন্যে মিসেস মারিয়ার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে দিল এবং কয়দিন পরই তোমার সঙ্গে এমালির বিয়ের গুজব উঠল পত্রিকায়। তিনজনকেই ব্ল্যাকমেলের ফাঁদে আটকে ফেলা গেল। মারিয়া পালাবার চেষ্টা করলেই এমালিকে মেরে ফেলা হবে, এমালি কথা না শুনলে মারিয়াকে মেরে ফেলা হবে, আর ওসমান কথামত না চললে মারিয়া, এমালি দু'জনকেই মেরে ফেলা হবে।'

'তুমি এতসব খবর জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করলেন বিস্মিত ওসমান খান।

'কৃতিত্ব আমার নয়। রানাই প্রথম সন্দেহ করে এই ব্যাপারটা। ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে তোমরা যে অভিনয় করেছ সেটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল ও। কিন্তু তোমার কান্নাটা বিশ্বাস করেছিল। একজন লোক যদি তার প্রথম স্ত্রীর জন্যে এই পরিমাণ আবেগ পোষণ করে তাহলে স্ত্রীবিয়োগের দু'মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করে বসতে পারে না। তাহলে কি পারে? বিয়ের অভিনয় করতে পারে। কাজেই আমাকে খবর নিতে বলা হয়েছিল মিসেস মারিয়া খানের মৃত্যুর ব্যাপারে।

'আমি খোঁজ নেয়ার ব্যবস্থা করলাম। লাহোরে মারিয়ার কবর খুঁড়ে বড়সাইজের একটা কাপড়ের পুতুল পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হলো যে ডাক্তার ঘুষ খেয়ে ডেথ সার্টিফিকেটে সই করেছিল, তাকে। দু'তিন ঘা লাগাতেই স্বীকার করেছে ডাক্তার সব কথা। ওই ডাক্তারেরই প্রাইভেট নার্সিং হোমে একটা তালামারা ঘরে রাখা হয়েছিল মিসেস মারিয়াকে।' হঠাৎ ওসমান খানের চোখের দিকে চাইলেন কমোডোর। 'কিন্তু তুমি আমাদের জানাওনি কেন, ওসমান? কেন তুমি সাহায্য চাইলে না আগেই?'

'মারিয়া ওদের হাতের মুঠোয়, পান থেকে চুন খসলেই খুন করে ফেলবে—সেই অবস্থায় তুমি হলে কি করতে, জুলফিকার?'

'কি করতাম জানি না, তবে কিছু একটা করতাম। তোমার মত চাল মাত হয়ে বসে থাকতাম না। তুমি সহযোগিতা না করলে বলছ মারিয়াকে মেরে ফেলত ওরা, কিন্তু সহযোগিতা করে যেতে থাকলে কি করত শুনি? ছেড়ে

দিত? বিশ্বাস কর সে কথা?' অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল ওসমান খান। 'যাক, যা হবার হয়ে গেছে, চুকে গেছে সব।'

বন্দীদের নিয়ে আসা হলো।

এতক্ষণ নিচে রানার কেবিনে শুয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল ফজল সুদীরু। বেচারা গত চব্বিশ ঘণ্টা চোখের পাতা এক করতে পারেনি বলে ডাকেনি ওকে রানা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে এল সে ডেকের উপর। ক্যাপ্টেন সিরাজ চট করে রানার দিকে চাইতেই হাত উঠিয়ে ইশারা করল রানা। ছোট দুই ভাইকে দেখেই স্থান-কাল-পাত্র ভুলে তড়াক করে লাফিয়ে নামল ফজল ডাঙায়, তারপর ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল দু'জনকে দুই হাতে। ওদিকে ছেলে ও হবু জামাইকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে আছেন আবদুল গনি ইলাহুদে। দুই চোখে তাঁর আনন্দাশ্রু! একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল রানা চুপচাপ।

এমালি এসে দাঁড়াল রানার সামনে।

'তুমি জানতে, রানা। তুমি···তুমি সব জানতে আগে থেকে। আমার ওপর নজর রেখেছিলে তুমি প্রতিটা মুহূর্তে!'

ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন কমোডোর কথাটা কানে যেতেই।

'ঠিক বলেছ। ও সব জানত। কিন্তু কিভাবে জানল তা জানবার সুযোগ হয়নি আমার। একটু খুলে বলো দেখি, রানা।'

'মিস্টার ওসমান খানের ডিনারেই ব্যাপারটা আঁচ করলাম আমি, স্যার। সার্জেন্ট সুদীরুর কাছ থেকে ওঁর সম্বন্ধে এত প্রশংসা শুনেছি যে সেইরাতে Sirrus-এ ওঁর ব্যবহার আমার কাছে ভয়ানক সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। যে ভদ্রলোক প্রথম স্ত্রীকে এত গভীর ভাবে ভালবাসতে পারেন তিনি আরেকজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করতেই পারেন না। তাছাড়া এমালির মত একজন আত্মসম্মান বোধ সম্পন্না মহিলার কাছে শোবার ঘর থেকে প্রথম স্ত্রীর ফটো নিয়ে আসবার প্রস্তাব দিলে তার পক্ষে চড় লাগিয়ে দেয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তা না করে নিয়ে এল সে ছবিটা। বুঝলাম দুইজনই অভিনয় করছে—কারও আদেশ পালন করছে মাত্র। কার? ব্যস, চলল আমার চিন্তা।'

'চলল তো বুঝলাম, কিন্তু কিভাবে কোন্ পথে কোন্ দিকে চলল একটু খুলেই বলো না শুনি। তাড়াহুড়োর কি আছে?'

'মিসিরের কথা ভাবছি, স্যার। সুরাংদ্বীপে ফজলকে খুঁজে খুঁজে মরছে সে এখন। আমার বোধহয় রওনা হয়ে···'

'আরে, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। ক্যাপ্টেন সিরাজকে বলে দিয়েছি, তিনজন কম্যান্ডো পাঠিয়ে দিচ্ছে সে এক্ষুণি, ধরে নিয়ে আসবে। তোমার গল্প তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো।'

'এমালিকে যে ওরা পাঠাবে আমি জানতাম। তার উপর অত্যাচার করা হয় আমাদেরকে এইরকম একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছিল INI টীম। আমাদের ডিনারের সুযোগে ওরা কর্ণফুলীতে এসে ট্রান্সমিটার ফিট করে

গিয়েছিল যাতে আমরা হেড অফিসের সঙ্গে যা কথা বলি সব জানতে পারে ওরা। কিন্তু দৈবাতের কথা বলা যায় না। দৈবাৎ যদি গোপনে ট্রান্সমিটারটা আবিষ্কার করে আমরা নষ্ট করে দিই তাহলে আমাদের কার্যকলাপ গতিবিধি জানতে পারছে না। তাই গ্রাউন্ড তৈরি করে রেখেছিল ডিনারের সময়ই, যাতে ট্রান্সমিটার গেলে এমালিকে পাঠানো যায়। ওসমান খানের অত্যাচারে বেচারি পালিয়ে এসেছে—এ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ হবে না।

'ওজন আলীকে হত্যার পর নিশ্চিন্ত মনে ট্রান্সমিটার নিয়ে চলে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু যখন দেখা গেল আমি বেঁচে ফিরে এসেছি তখন এমালিকে পাঠানো ছাড়া আর কোন উপায় ওদের কাছে ছিল না। কাজেই পিঠের উপর গোটাকয়েক চাবুকের বাড়ি মেরে এমালিকে পানিতে নামিয়ে দিল ওরা। জামাকাপড়ের সাথে পলিথিন ব্যাগের মধ্যে একটা মাইক্রো-ট্রান্সমিটার আর একখানা পিস্তল দিয়ে দিল। বলল, এ কাজটা না করলে খুন করে ফেলা হবে মারিয়া খানকে।'

মাথা নাড়ল এমালি। দুই চোখে বিস্ময়। 'ঠিক বলেছ। তাই বলেছিল ওরা।'

'আমার চোখের কোন ডিফেক্ট নেই, তোমার পিঠে চাবুকের দাগগুলো তো দেখেই ছিলাম, আরও কিছু চোখে পড়েছিল আমার। ক্ষতগুলো নকল ছিল না, সত্যিকার চাবুকের দাগ—কিন্তু তার আশেপাশে সূচ ফোটানোর দাগও দেখতে পেয়েছিলাম আমি। চাবুক মারার আগে অ্যানেসথেটিক ইঞ্জেকশন দিয়ে নেয়া হয়েছিল পিঠে। প্রশ্ন জাগল এদের মধ্যে এত দয়ালু ভালমানুষ কে? ওসমান খান?'

এইবার ওসমান খানের অবাক হওয়ার পালা। এক-পা এগিয়ে এলেন তিনি।

'আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমিই চাপাচাপি করায় ইঞ্জেকশন দিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল ওরা। আপনি জানতেন যে বাধ্য করা হচ্ছে আমাকে…'

'একদিনেই সবকিছু জানতে পারিনি। ধীরে ধীরে জেনেছি। আর এ-ও আন্দাজ করতে পেরেছি আপনারই জন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দখল করা জাহাজের ক্রুদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল ওরা। আপনি বলেছিলেন: মারতে পারবে না ওদের, নইলে কোনও হুমকিতে সহযোগিতা করব না আমি। আপনার জন্যেই চারজন বন্দী বেঁচে আছে এখনও—নইলে ওদের কচুকাটা করে সাগরে ভাসিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না ক্যাপ্টেন ইমরান। যাক, যে কথা বলছিলাম, তোমার পিঠের একটা ক্ষতচিহ্নের উপর আঙুল বুলিয়েছিলাম আমি—ছয় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা। যন্ত্রণার চোটে একলাফে ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চোখের পাপড়ি পর্যন্ত কাঁপেনি তোমার। কাজেই বুঝতেই পারছ, তোমাকে বিশ্বাস করবার প্রশ্নই ওঠে না।

'তোমাকে বলেছি, কর্তব্যের খাতিরে মাঝে মাঝে মিছেকথা বলি আমি, মাঝে মাঝে সত্যিটাই একটু ঘুরিয়ে বলি। তুমি সাঁতরে এসে কর্ণফুলীতে উঠেই আমাদের সাবধান করলে, ভয়ানক বিপদ আমাদের মাথার উপর, রাত

বারোটার সময় লোক পাঠাবে ক্যাপ্টেন ইমরান, পালিয়ে যাওয়া দরকার। আমি বললাম দেড় ঘণ্টার মধ্যে মাতারাম ছেড়ে চলে যাব আমরা। ব্যস, ওমনি কেবিনে গিয়েই জানালে তুমি ওদের দেড় ঘণ্টার মধ্যে চলে যাচ্ছি আমরা মাতারাম ছেড়ে। কাজেই নির্ধারিত সময়ের একঘণ্টা আগেই আমাদের খুন করবার জন্যে নৌকা বেয়ে চলে এল কায়েস, দাউদ আর মিসির। কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য, ওরা পৌছবার আগেই নোঙর তুলে রওনা হয়ে গেলাম আমরা। প্রস্তুত ছিলাম আমরা আগে থেকেই। মারা পড়ল দুইজন। তোমার ভূমিকা সম্পর্কে কোন সন্দেহই রইল না আর।

'খানিক পরে তুমি জানবার চেষ্টা করলে কোথায় যাচ্ছি আমরা। আমি বললাম, সুরাং আর মালাদ্বীপের কাছাকাছিই আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান আছে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা প্রথমে যাব সুরাংদ্বীপে তারপর যাব মালাদ্বীপে। ব্যস, কফি করবার ছলে কেবিনে গিয়ে খবরটা জানিয়ে দিলে তুমি ওদের। আজ সারাটা দিন কোন্ দ্বীপে ছিলাম আমরা বলো দেখি?'

'সুরাংদ্বীপ।'

'উহুঁ! সুরাংদ্বীপে যাই-ইনি আমরা। আসলে মালাদ্বীপে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল ফজলকে, আমরাও আজ সারাদিন মালাদ্বীপেই ছিলাম। পাছে তোমার পাঠানো খবর পেয়ে ওরা আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত নেয়, তাই এই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। কিন্তু আসলে এটা বেশি সাবধানতা হয়ে গিয়েছিল—সুরাং এবং মালাদ্বীপের দিকে যাচ্ছি শুনে খুব একপেট হেসেছিল ওরা, আক্রমণ করবার কথা চিন্তাও করেনি।

'ফজলকে নামিয়ে দিতেই তুমি জিজ্ঞেস করলে এবার আমরা মালাদ্বীপের দিকে যাচ্ছি কিনা, আমি বললাম, না, আমরা চলেছি রত্নদ্বীপের দিকে। চমকে উঠলে তুমি এবং ছুটলে নিজের কেবিনের দিকে খবরটা ওদের দেবে বলে, কিন্তু তার আগেই কফি খাইয়ে দিলাম আমি তোমাকে এককাপ। এমন ঘুম পেয়ে গেল তোমার যে বিছানা পর্যন্তও পৌছতে পারলে না, মেঝের উপরই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে।'

'কি বললে! মেঝেতে শুয়ে ছিলাম আমি! কিন্তু...'

'কিন্তু তিন মিনিট পর জনাব মাসুদ রানা তোমার কেবিনে ঢুকে শুইয়ে দিয়েছিল তোমাকে বিছানার উপর।' বলল রানা। 'তোমার হাতটাও পরীক্ষা করে দেখলাম সেই সুযোগে—দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার চিহ্ন গায়েব। আমি আর ওজন আলী ডিনার খেতে যাবার কিছুক্ষণ আগেই। খুব সম্ভব রাবার ব্যান্ড দিয়ে কষে বেঁধে দাগটা তৈরি করা হয়েছিল নিতান্ত অসাবধানতাবশত আমাকে দেখাবার জন্যে। তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল এমালি।

'তোমার ট্রান্সমিটার আর পিস্তলটাও খুঁজে বের করেছিলাম আমি অনায়াসে। মালাদ্বীপে কাল রাতে আমার ঘরে ঢুকেছিলে তুমি ইনফরমেশনের জন্যে। আমার কথা শুনে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে তুমি। আমাকে নির্ঘাত মারা পড়ব আমি রত্নদ্বীপের দুর্গ আক্রমণ করলে। কিন্তু মুখে কিছু

বলতে পারলে না। কান্নাকাটি করে আমাকে ঠেকাবার চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিলে। তোমাকে ইনফরমেশন দিয়েছিলাম আমি ঠিকই, কিন্তু ঠিক ততটুকুই, যতটুকু আমি তোমার মারফত জানাতে চেয়েছিলাম ক্যাপ্টেন ইমরান অ্যান্ড পার্টিকে। তুমিও সুবোধ বালিকার মত ছুটলে তোমার ঘরে খবরটা…'

'মাসুদ রানা!' বাধা দিল এমালি। 'তোমার মত এমন জঘন্য চরিত্রের, দুইমুখো সাপ…'

'ওদের কয়েকজন লোক রয়ে গেছে Sirrus-এ!' বলল ওসমান খান হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায়। 'পালাবে ওরা! পালিয়ে যাবে…'

'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে ওদের,' বলল রানা। 'Sirrus এখন আমাদের কন্ট্রোলে।'

'কিন্তু Sirrus কোথায় আছে বা কোন্‌দিকে চলেছে জানলেন কি করে আপনি? আপনারা যখন মালাদ্বীপে, আমরা তখনও এসে পৌঁছোইনি। আপনি কি করে…'

'Sirrus, এর টেন্ডারটার কি অবস্থা এখন, মিস্টার খান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেন?' অবাক হলো ওসমান খান। 'এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? অকেজো হয়ে গেছে ওটা। বিগড়ে গেছে ইঞ্জিন।'

'পেট্রোল ট্যাঙ্কের মধ্যে এক সের চিনি ঢেলে দিলে যে-কোন ইঞ্জিনই বিগড়ে যাবে, মিস্টার খান। গ্যাঙওয়েব লাইটটা ভেঙে আসার পর আবার গিয়েছিলাম আমি Sirrus-এ পানির নিচে দিয়ে। ইঞ্জিনের ভালভগুলোর সর্বনাশ হয়ে গেছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু উপায় ছিল না ওটা নষ্ট না করে দিয়ে। একটা হোমিং সিগন্যাল ট্রান্সমিটারও নিয়ে গিয়েছিলাম আমি সাথে করে। লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম ওটা টেন্ডারের মধ্যে—এখনও নিয়মিত সিগন্যাল পাঠাচ্ছে ওটা। অকেজো টেন্ডারটা তুলে নিয়েছেন আপনারা Sirrus-এ, ফলে আপনাদের গতিবিধি আমাদের অজানা ছিল না।'

'বুঝলাম না কিন্তু ঠিক,' বলল ওসমান খান।

'আমার ট্রান্সমিটারের ফ্রীকোয়েন্সি আমার জানাই ছিল। এদিকে মাতারাম থেকে রওনা হয়েই ফজলকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাদের আফটার লকারে ইচ্ছাকৃতভাবে এদিক ওদিক ছিটিয়ে রাখা যন্ত্রপাতি জোড়া লাগিয়ে একখানা পোর্টেবল রেডিও ট্রান্সমিটার তৈরির কাজে। আপনাদের ডিরেকশন বোঝার জন্যে লুপ এরিয়েল ছিল তাতে। লুপটা এদিক-ওদিকে ঘুরিয়ে সিগন্যালটা যেদিক থেকে সবচেয়ে জোরে পাওয়া যাচ্ছে সেদিকে ফেরালেই বোঝা যাবে আপনারা ঠিক কোন্‌খানটায় আছেন। বুঝলেন না?'

মাথা নাড়ল ওসমান খান।

'মালাদ্বীপে ফজলকে নামিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম আমরা রত্নদ্বীপে। এখান থেকে সিঁড়িঘরের RCA ট্রান্সমিটারের সাহায্যে গতরাতে খবর দিয়েছিলাম হেড অফিসে। আপনারা কখন পৌঁছলেন, ক্যাপ্টেন সিরাজ?'

'রাত নয়টায় পৌঁছেছি আমরা, স্যার। রাবারের ডিঙিতে করে ঢুকেছি বোটহাউসের খোলা দরজা দিয়ে। তারপর থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে।'

গলা পরিষ্কার করলেন আবদুল গনি ইলাহ্‌দে। তিনিও জুটে গেছেন এই জটলায়। বললেন, 'কিন্তু তুমি তো মালাদ্বীপ থেকেই তোমাদের হেড অফিসে খবর দিতে পারতে। ট্রান্সমিটার তো ছিলই। তবু আবার রত্নদ্বীপ থেকে ট্রান্সমিট করবার দরকার হলো কেন?'

'দরকার হলো এইজন্যে যে হাতে সময় কম, কাজ অনেক। এই দুর্গের খুঁটিনাটি বর্ণনা জানানোর দরকার ছিল। বোটহাউসটার আয়তন, অবস্থিতি ইত্যাদি জানাতে হয়েছে আমার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। ক্যাপ্টেন সিরাজকে প্রত্যেকটা কাজ করতে হয়েছে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে। কাজেই দুর্গের মধ্যে ঢুকে সব দেখেশুনে তারপর পুরো ডেসক্রিপশন দিতে হয়েছিল আমাকে। ডোডি ছিল আমার সঙ্গে, তাই দুর্গটা ঘুরেফিরে দেখতে অসুবিধে হয়নি কোন।'

'ডোডি ছিল!' বিস্মিত হলেন আবদুল গনি ইলাহ্‌দে। 'কই আমাকে তো কিছু...'

'উনি মানা করে দিয়েছিলেন,' বলল ডোডি। 'কাউকে কিছু বলতে বারণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন উনি আমাকে।' এবার ফিরল সে রানার দিকে। 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। এই কয় ঘণ্টা কি পরিমাণ যন্ত্রণা আর অস্বস্তি ভোগ করেছি তা আমিই জানি। দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে আমার, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'আমারও,' বলল এমালি। 'গত ত্রিশ ঘণ্টা নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি আমি, রানা। সব জানতে তুমি অথচ একটি কথাও বলোনি। কেন আমাকে এত কষ্ট দিলে বলো তো?'

'এমনি,' বলল রানা। 'মেয়েদের কষ্ট দিতে আমার খুব ভাল লাগে। ওদের কষ্ট দিলে কেষ্ট মেলে।'

'সত্যিই তুমি একটি জঘন্য চরিত্রের লোক, রানা। মন বলতে কোন পদার্থ নেই তোমার।'

মৃদু হাসল রানা। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'বাহ্! এই তো কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নমুনা!' বলে উঠলেন হঠাৎ কমোডোর জুলফিকার। উনি মনে করেছেন সত্যি সত্যিই ভুল বুঝে ছোটলোক ভাবছে এমালি তাঁর ভাতিজাকে। 'রানা নিজের মুখে কিছু না বললে আমিই বলব। চিরজীবনের জন্যে ঋণী হয়ে থাকা উচিত তোমার রানার কাছে।

'এক নম্বর কারণ : তুমি যদি নিয়মিত মেসেজ ট্রান্সমিট না করতে তাহলে সন্দেহ জাগত ওদের মনে, কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে, কাজেই আমরা পৌঁছবার আগেই এখানকার সবাইকে শেষ করে দিয়ে কেটে পড়ত। দ্বিতীয় কারণ : আমরা ওদের ফাঁদে পড়ে আটকে গিয়েছি, উদ্ধারের কোন আশা নেই—এইরকম একটা অবস্থা না করতে পারলে ওদের স্বীকারোক্তি পাওয়া

যেত না কিছুতেই। এখন ইচ্ছে করলেই আমরা সমস্ত পৃথিবীকে এই স্বীকারোক্তি শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারি। সব কথা টেপরেকর্ডারে রেকর্ড হয়ে গেছে। তৃতীয় কারণ বোটহাউসের প্রত্যেকটা লোকের মনোযোগ কর্ণফুলীর উপর নিয়ে আসতে চেয়েছিল রানা, যাতে ক্যাপ্টেন সিরাজ আর তার দলবল সবার অলক্ষ্যে এগিয়ে এসে পজিশনমত দাঁড়াতে পারে। নইলে অনর্থক রক্তপাত হতে পারত—সে রক্ত তোমারও হতে পারত। চতুর্থ কারণ তুমি যদি রওনা হওয়া থেকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকটা গতিবিধি ঠিক ঠিক রিলে না করতে তাহলে রীতিমত যুদ্ধ করে জয় করতে হত আমাদের। বোটহাউসের দরজা ভাঙার সাথে সাথেই গোলাগুলি আরম্ভ হয়ে যেত—কয়জন ইন্তেকাল করত আল্লাই মালুম। কিন্তু তা হয়নি কেন? ওরা জানত পুরোটা ব্যাপার ওদের আয়ত্তের মধ্যে আছে, ওরা জানত ফাঁদ পাতায় কোন গোলমাল নেই—ধরা পড়ে যাচ্ছি আমরা ওদের জালে, ওরা জানত তুমি গোপনে উঠে পড়েছ কর্ণফুলীতে—যদিও আমরাও সবই জানতাম, এমন কি তুমি যাতে আমাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাও সেজন্যে হুইলহাউসের দরজা খুলে রেখেছিলাম আমরা। ওরা জানত পিস্তল আছে তোমার কাছে, এবং পিস্তল দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা যাবে খেপা লোক দুটোকে।' দম নিলেন কমোডোর। কিছু একটা বলবার জন্যে মুখ হাঁ করেছিল ওসমান খান, তাকে সুযোগ না দিয়েই চট করে আবার কথার খেই ধরলেন তিনি। 'পঞ্চম কারণ : ক্যাপ্টেন সিরাজের লোকজন ঘটনাস্থল থেকে প্রায় একশো গজ দূরে ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ঠিক সময়মত কি করে ওরা একসাথে এগিয়ে এল বলো তো? এদের প্রত্যেকের কানে হেডফোন ছিল আর পকেটে পোর্টেব্‌ল রিসিভার ছিল একটা করে। বোটহাউসের দরজা ভাঙা পর্যন্ত তোমার রানিং কমেনট্রির প্রতিটা শব্দ শুনতে পেরেছে ওরা। ঠিক কখন এগোতে হবে তা আর বলে দিতে হয়নি কাউকে। তোমার কাছে যে ট্রান্সমিটারটা আছে ওটা কর্ণফুলী থেকে চুরি করা মাল। ওটার ফ্রীকোয়েন্সি জানা আছে রানার। তাও তুমি কফি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বার পর ভালমত পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে সে। তারপর সেই ফ্রীকোয়েন্সিটা জানিয়ে দিয়েছে হেড-অফিসে এখানকার RCA ট্রান্সমিটারের সাহায্যে।' একটু থামলেন কমোডোর, তারপর বললেন, 'এই সবকিছুই করেছে রানা অনর্থক রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। এখনও কি তোমার ধারণা জঘন্য চরিত্রের লোক ও, মন বলতে কোন পদার্থ নেই ওর? নিষ্ঠুর, নির্বিকার, জল্লাদ?'

চকচক করছে এমালির দুই চোখ। রানার একটা হাত তুলে নিল সে নিজের হাতে, তারপর বলল, 'আমার ধারণা তুমি একটা অসহ্য রকমের ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক টাইপের লোক, রানা! বিচ্ছিরি রকমের ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী লোক।' অস্বস্তি বোধ করল রানা। এদিক ওদিক চাইল নিরুপায় সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে। নিচু খশখশ গলায় বলল এমালি, 'বোকা। তুমি এত বিশ্বাস করো আমাকে! যদি গুলি করে বসতাম! যদি গুলি বেরিয়ে যেত পিস্তলটা থেকে! আমি···আমি তোমাকে খুন করেও তো ফেলতে পারতাম, রানা!'

'তা তুমি কিছুতেই পারতে না, এমালি।' বলল রানা। বেমালুম চেপে গেল সে, ওই পিস্তল থেকে গুলি বেরোলে জীবনে আর তিনকোনা লোহা ঘষবার ফাইলের প্রতি শ্রদ্ধা থাকত না ওর।

আজকের রাতটা অন্তত দুর্গে কাটিয়ে যাবার অনুরোধ করলেন আবদুল গনি ইলাহুদে। রাজী হয়ে গেলেন কমোডোর জুলফিকার। বন্দীদের সার বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দুর্গের হল ঘরে। ইসরাইল ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ রানার পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল রানা।

'বুদ্ধির খেলায় কে জিতল, জনাব? ইসরাইল না…'

কটমট করে চেয়ে রইল লোকটা রানার চোখের দিকে।

উত্তর দিল না।

কুউউ!

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৭৭

এক

হোটেল ইমপিরিয়াল। এককালে এটাই ছিল রিজ সিটির সবচেয়ে অভিজাত হোটেল। আগের সেই জৌলুস এখন আর নেই। দেয়ালের এখানে সেখানে প্লাস্টার খসে গিয়ে বেরিয়ে আছে লাল ইঁট। মুখ ব্যাদান করে আছে যেন। ভাঙা দেয়ালের যত্রতত্র সাঁটানো রঙবেরঙের ছায়াছবির পোস্টার। ওয়েস্টার্ন ছবির দাড়িওয়ালা বন্দুকবাজ ভিলেনদের পাশে প্রায় উলঙ্গ কোমর বাঁকানো নায়িকাগুলোর রঙ মাখা চেহারা দেখতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে উঠতি বয়সের ছোকরার দল। লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে WANTED লেখা পোস্টারগুলো সাঁটা হয়েছে দেয়ালের অপেক্ষাকৃত অক্ষত জায়গা বেছে। WANTED শব্দটা বাংলাদেশে সচরাচর চাকুরির নোটিশ বোঝালেও রিজ সিটিতে ব্যাপারটা তা নয়, এখানে বোঝানো হয় চোরছ্যাঁচড়, গুণ্ডা-বদমাশ, খুনে-ডাকাতকে খোঁজা হচ্ছে, খুঁজে দিলে পুরস্কার দেয়া হবে। নগদ টাকার গন্ধ থাকায় ভিড় জমে এগুলোর সামনেই বেশি।

হোটেলের সেলুন বারটায় আজকাল আর লোকজন তেমন ভিড় জমায় না। পরিবেশটা নোংরা, শ্বাসরুদ্ধকর। এখানে সেখানে পড়ে আছে আধপোড়া সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ। ধুলোবালিও ঠিকমত পরিষ্কার করা হয় না। কড়িকাঠের সাথে টাঙানো পুরানো আমলের ঝুল-বাতিগুলো এখনও জ্বলে, তবে কতদিন পরিষ্কার হয়নি তা ওরা নিজেরাও বলতে পারবে না। এত বড় বারটায় আলোর চেয়ে আবছা অন্ধকারেরই প্রাধান্য বেশি।

বাঁধা কিছু খরিদ্দার এখনও আছে বটে, তবে তাদের বেশির ভাগই রিজ সিটির মাস্তান। গুণ্ডা পাণ্ডাদের সর্দার গেরিট্রি ও তার সহকারীরাই আসর জমায় আজকাল এখানে নিয়মিত। বারম্যান, এককালে সে ছিল এই রাজকীয় হোটেলের মালিক, বহুদিন লন্ড্রির ছাপ না পড়া বুক সমান উঁচু একটা অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। সচ্ছলতার দিন হলে হয়তো সে কলপ লাগাত, এমন ধূসর বাদামী রঙে পরিণত হতে দিত না চুলগুলোকে।

ময়লা, ছেঁড়া একটা তোয়ালে হাতে নিয়ে গ্লাসগুলো এক এক করে মুছছে বারম্যান আর ঘন ঘন তাকাচ্ছে বারের এক কোণায় বসা নতুন মুখগুলোর দিকে। ছয়জন হোমরা-চোমরা চেহারার মানুষ দুটো টেবিল দখল করে বসে খাওয়া দাওয়া করছে। সাথে আবার আশ্চর্য সুন্দরী একটা মেয়ে। কারা ওরা? ভাবছে বারম্যান। এমন তো ঘটে না ইদানীং! হোটেল ইমপিরিয়ালে এত

উঁচুদরের ভদ্রলোক তো ঢোকে না আজকাল! ঢোকে না গেরিট্রির ভয়ে। কখন যে কাকে সে অপমান করে বসবে ঠিক নেই কোন। রোজকার মত ওই যে, আজও সে দলবল নিয়ে বসেছে জুয়া খেলতে।

হোটেলটা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের সাথেই। হোটেলের মতই করুণ চেহারা স্টেশনেরও। মার্কিন সেনাবাহিনীর ছাপ মারা লক্কড়মার্কা ট্রুপট্রেনটাকে এই স্টেশনে মানিয়েছে ভালই। চার বছর পেরোয়নি এখনও স্টেশন বিল্ডিংটার বয়স। এরি মধ্যে ভগ্নদশায় পৌঁছে গেছে। রোদ, বৃষ্টি, বরফ আর বাতাস কুরে কুরে খেয়েছে বিল্ডিংটাকে। গেটের মাথায় 'রিজ সিটি' লেখাটার অক্ষরগুলো এখন আর চেষ্টা করেও পড়া যায় না।

মান্ধাতা আমলের রেল ইঞ্জিন, কর্ড কাঠের জ্বালানি দিয়ে চলে। সাতটা কামরার পিছনে লাগানো ব্রেকভ্যানটা। ইঞ্জিনের দিক থেকে তিনটে কামরা চলাচলের জন্যে গ্যাঙ-ওয়ে দিয়ে জোড়া লাগানো। প্রথম গ্যাঙ-ওয়েতে দাঁড়িয়ে সার্জেন্ট নিকোলাস পেন্সিলের খোঁচা মেরে টিক্ চিহ্ন দিচ্ছে জিনিসপত্রের তালিকায় আর মাঝে মধ্যে মুখ তুলে দৃষ্টি ফেলছে হোটেলটার প্রবেশ পথের দিকে।

বেশ ক'দিন ধরে ট্রেনের ওপর সওয়ার হয়ে রয়েছে গোটা দলটা। আরও ক'দিন থাকতে হবে এর ভিতর বন্দী হয়ে। রিজ সিটিতে জ্বালানি অর্থাৎ কর্ড কাঠ ও পানি সংগ্রহের জন্যে থেমেছে ওরা, সেই সুযোগে তাজা কিছু খাবারের লোভটা দমন করতে পারেননি কর্নেল রুজভেল্ট। সাথীদের নিয়ে হোটেলে গিয়ে বসেছেন তিনি।

ছয় ফুটের ওপর লম্বা, তেমনি মোটাসোটা শরীর কর্নেলের। রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে গায়ের রঙ। চকচকে কালো চোখের মণি থেকে থেকেই ঝিলিক দিয়ে উঠছে। পরনে ইউনাইটেড স্টেটস ক্যাভালরির পোশাক। ব্যাকব্রাশ করা চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ চেহারায়। ওজনদার ব্যক্তিত্বের একটা ফ্রেম দিয়ে যেন বাঁধানো চেহারাটা।

বারের আরেক প্রান্তে ঘটছে অপ্রীতিকর ঘটনাটা। হৈ-হল্লা হচ্ছে। গেরিট্রি সঙ্গীদের নিয়ে মেতে আছে খেলায়, অন্য কোনদিকে তার খেয়াল নেই। এটা তার নিজের এলাকা, বহিরাগত কোন লাট সাহেব এখানে উপস্থিত থাক বা না থাক, সে গ্রাহ্য করে না।

ভারী বুটের আওয়াজ তুলে বারে ঢুকল এই সময় একজন লোক। দীর্ঘদেহী, পেশীবহুল, সরু করে ছাঁটা গোঁফ। পরনে কালো ইউনিফর্ম, বুকে আর কাঁধে লাগানো ইউ. এস. মার্শালের ব্যাজ। হাতে একটা ব্রীফকেস। রিজ সিটির মার্শাল লোকটা, জন ডেভিড।

বারের দু'দিকে তাকিয়ে বেখাপ্পা পরিবেশটা দেখে নিল মার্শাল। গেরিট্রিকে দেখে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল সামান্য। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা এগোল সে কর্নেলের দিকে।

চামচ ভরা সুপ ঠোঁটের কাছে তুলেছেন কর্নেল, বুট জুতোর আওয়াজ পাশে এসে থামল। ঘাড় ফেরালেন, চামচটা বাড়ি খেল গোঁফের সাথে। পাশে

বসা মেয়েটার মাথায় গরুর গাড়ির চাকার সাইজের ব্রিম হ্যাটটা নড়ে উঠল বেয়াড়া ভাবে।

মার্শালের আপাদমস্তক দেখলেন কর্নেল।

লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিল মার্শাল, 'মার্শাল, জন ডেভিড়।'

প্রশস্ত থাবা মেলে দিয়ে মার্শালের হাতটা ধরলেন কর্নেল, 'খুশি হলাম। আপনার জন্যে একটা এনভেলাপ আছে আমার কাছে।'

মার্শালের পাঁজরে ঠেকে আছে মেয়েটার ব্রিম হ্যাটের কিনারা, একটু চাপ বা ধাক্কা লাগলেই মাথা থেকে স্থানচ্যুত হবার আশঙ্কা। দেহটাকে বাঁকা করে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করছে মার্শাল। কিন্তু কর্নেল তার হাত ছাড়ছেন না। ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন তিনি মার্শালের দু'কোমরে দুটো পিস্তলের দিকে। তারপর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হাতের ব্রীফকেসটার উপর।

হাসল মার্শাল। 'খবর না দিলেও আসতাম। আপনাদের সাথে আমিও যাচ্ছি ফোর্ট হাম্বোল্ডে।'

মার্শালের হাত ছেড়ে দিলেন কর্নেল। ধারাল গলায় জানতে চাইলেন, 'জানা আছে আপনার ফোর্ট হাম্বোল্ডে কেন যাচ্ছি আমি?'

সিধে হয়ে দাঁড়াল মার্শাল। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা। সুন্দরী মেয়েটার ব্রিম হ্যাটের কিনারা এখন আর ঠেকে নেই পাঁজরে। চট করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

ছোট্ট একটা ভূমিকা করার সুযোগটা ছাড়ল না মার্শাল, 'এই রেল রাস্তাটার ওপর মহাবজ্জাত সিম্পসন খুন আর রাহাজানির মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। বন্দুক আর মদ বিক্রি করছে সে পিউতী ইন্ডিয়ানদের কাছে। নরক একেবারে গুলজার। সে এখন ফোর্ট হাম্বোল্ডে বন্দী, খবর পেয়েছি। আপনি ফোর্ট হাম্বোল্ডের জন্যে রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে যাচ্ছেন। আমি যাচ্ছি সিম্পসনকে বেঁধে নিয়ে আসতে।'

'হুঁ।' এতটুকু উৎসাহিত হলেন না কর্নেল। চেয়ারে পিঠ দিয়ে পা দুটো টেবিলের নিচে লম্বা করে দিলেন। ডান হাতটা ট্রাউজারের পকেটে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। মট মট করে আওয়াজ তুলে ফুটল কোমরের হাড়, বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন ক'বার। রীতিমত সংগ্রাম করে পকেট থেকে বের করলেন একটা সীল করা এনভেলপ। 'কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছে এটা, আপনাকে দেয়ার জন্যে।'

হাত বাড়িয়ে এনভেলপটা নিল মার্শাল। এরকম এনভেলপ মাঝেমধ্যেই দায়িত্বশীল কারও মাধ্যমে পাঠানো হয় তার কাছে, ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। সীল ভেঙে খুলল সে এনভেলপটা। এক গাদা কাগজ-পত্র, ফটোগ্রাফ ও নিউজপেপার কাটিং ভিতরে। WANTED হেডিং যুক্ত নোটিশ সব। দ্রুত প্রত্যেকটায় একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে এনভেলপে ভরে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সেটা মার্শাল।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' কর্নেল তার ডান পাশে বসা সুঠাম দেহের অধিকারী ভারিক্কি চেহারার লোকটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ইনি নেভাডার

গভর্নর।' বাঁ পাশে বসেছে যুবতী মেয়েটি। 'এ আমার বন্ধু আশরাফ চৌধুরীর মেয়ে, স্বাতী চৌধুরী।' পাদরীর পোশাক পরা গোবেচারা টাইপের লোকটা বসে আছে কর্নেলের পাশের টেবিলে। 'ইনি রেভারেন্ড জোসেফ কালাহান।' ওই টেবিলেই রেভারেন্ডের পাশে বসে আছে হাসিখুশি-চেহারার আর এক লোক। কর্নেল বললেন, 'হাসিটা দেখছেন ওর? ওই হাসি দেখেই কি ধরে নেয়া যায় না ও একজন ডাক্তার? ডা. মলিনেক্স।' ডা. মলিনেক্সের পাশে বসা লোকটা স্মার্ট! মুচকি মুচকি হাসছে মার্শালের দিকে চেয়ে। 'চেনো নাকি মার্শালকে, জোনাথন?'

'একমিনিট,' বলল মার্শাল, 'মনে পড়ছে সম্ভবত, বাতুঙ্গা ক্যাম্পে তুমি না লেফটেন্যান্ট ছিলে, জোনাথন?'

'কিন্তু এখন মেজর জোনাথন। ধীরে হলেও প্রমোশন পায় লোকে।' হাসিটা বিস্তৃত হলো মেজরের। 'বাতুঙ্গা ক্যাম্পে তুমিও তো সার্জেন্ট ছিলে, জন ডেভিড। কিন্তু এখন রিজ সিটির মার্শাল।'

ঠিক সেই সময় বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল গেরিট্রি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে চেয়ারটা। মানুষ নয়, প্রকাণ্ড একটা গরিলা যেন। বুনো জন্তুর মত দেখাচ্ছে তাকে। খচ্চরের চামড়ার প্যান্ট আর জ্যাকেট পরনে। ডান হাতটা পৌঁছে গেছে কোমরে ঝোলানো কোল্টের বাঁটে। বাম হাত দিয়ে টেবিলের সাথে চেপে ধরে রেখেছে মুখোমুখি বসা লোকটার কব্জি।

কোণাটায় আলো কম বলে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না ভাল। ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি উঁচু কলারওয়ালা কোট গায়ে, কপাল পর্যন্ত ঢাকা কালো স্টেটসন ক্যাপ।

মুখ ভর্তি লাল দাড়ি নেড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে গেরিট্রি বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, ধরা পড়ে গেছ বাপ। থুড়বো এখন তোকে।'

নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মার্শাল। দৃঢ় পায়ে এগোল ভিড়টার দিকে। 'কি হলো, গেরিট্রি?'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল গেরিট্রি। রক্তচক্ষু স্থির হয়ে রইল মার্শালের মুখের ওপর ক'সেকেন্ড। তারপর বলল, 'আপনি এখানে? তা ভালই হলো, মার্শাল! একটা পুঁচকে চোরকে পাকড়াও করেছি।'

'চোর?' গেরিট্রির পাশে গিয়ে দাঁড়াল মার্শাল। 'নাকি ভাল খেলে? কিছু টাকা জিতে নিয়েছে বুঝি তোমার কাছ থেকে?'

বীভৎস, কদাকার হাসি ফুটল গেরিট্রির মুখে। 'খেলে ভাল তা স্বীকার করতেই হবে। এ খেলায় জোচ্চুরিটাই ভাল খেলার লক্ষণ!'

কব্জি মুক্ত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে লোকটা। গেরিট্রির একজন সহকারী চেপে ধরে রেখেছে তার গর্দান। কব্জিতে চাপ দিয়ে লোকটার হাতের তালু ঘুরিয়ে আনল গেরিট্রি। কয়েকটা তাস দেখা গেল সেখানে। চমৎকার কৌশলে আটকে রেখেছে। সবচেয়ে ওপরেরটা হরতনের টেক্কা।

এক পা এগিয়ে টেবিলের ওপর থেকে বাকি তাসগুলো তুলে নিল

মার্শাল। উল্টো করা ছিল, চিৎ করে দিল সবগুলো। তর্জনী দিয়ে এলোমেলো করে দিতেই বেরিয়ে পড়ল ওগুলোর মধ্যে থেকে আর একটা হরতনের টেক্কা।

দুটো হরতনের টেক্কা উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করল মার্শাল। দুটোরই পেছন দিকে প্রায় অস্পষ্ট একধরনের চিহ্ন রয়েছে। 'হুঁ। কি এগুলো?' তাস দুটো দেখিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল মার্শাল।

'পুরানো কায়দা,' বলল লোকটা। 'কেউ ঢুকিয়ে রেখেছে ওটাকে তাসগুলোর সাথে। এমন কেউ যে জানে আমার হাতে আছে টেক্কাটা।'

'হুঁ। নাম কি তোমার? কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।'

লোকটার তীক্ষ্ণ দুই চোখের দৃষ্টি তিন সেকেন্ডের জন্যে স্থির হলো মার্শালের চোখের উপর। তারপর মুচকি হেসে বলল, 'নাম শুনে চিনবেন না। নতুন এসেছি, দেখেননি কোনদিন। রানা…আমার নাম মাসুদ রানা।'

অনেকটা আপন মনে মার্শাল বলল, 'চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে দেখেছি কোথাও। যাই হোক,' হাত পাতল মার্শাল, 'পিস্তলটা দাও।'

'নেই। ওসব জিনিস আমি সাথে রাখি না।'

'বিশ্বাস হয় না, সার্চ করব তোমাকে।'

অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে রানা বলল, 'দেখুন, অযথা ঝামেলা পছন্দ করি না আমি।'

বাড়ানো হাতটা ঝট্ করে ঢুকিয়ে দিল মার্শাল রানার কোটের ডান দিকের পকেটে। আছে। তবে কোন্ আগ্নেয়াস্ত্র নয়। হাতটা বের করতেই দেখা গেল সেখানে হরেক রকম সব তাসের টেক্কা।

'বাহ্!' মুচকি হাসল মার্শাল। 'কায়দাটা জানে এমন কেউ বুঝি এগুলো তোমার পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল?' মাসুদ রানার সামনে থাক করে রাখা টাকাগুলো ঠেলে দিল মার্শাল গেরিট্রির দিকে।

কিন্তু গেরিট্রি সেদিকে তাকাল না। 'সব টাকা ওখানে নেই, মার্শাল।'

'জানি আমি,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল মার্শাল, 'কিন্তু ওতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে। খেলায় চুরি করা একটা ফেডারেল অফেন্স। কাজেই ওসবে আমি নাক গলাতে যাচ্ছি না। কিন্তু তুমি যদি বাড়াবাড়ি করো…'

'তার মানে আপনার সামনে ঝামেলা করি তা চাইছেন না। ঠিক আছে, ওকে নিয়ে বাইরেই যাচ্ছি।' গলায় খুশির আমেজ গেরিট্রির। তার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সহকারী রানার গর্দানে তীব্র এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল।

রানার উদ্দেশে বুড়ো আঙুল বাঁকা করে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল গেরিট্রি।

একচুল নড়ল না রানা। আবার অস্থির ভঙ্গিতে আঙুল নেড়ে হুকুম করল গেরিট্রি। অসম্মতি জানাল রানা মাথা নেড়ে। আচমকা প্রচণ্ড এক চড় কষাল গেরিট্রি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রানার গালে। একটু নুয়ে ডান হাতের কনুই দিয়ে গুঁতো মারল নাকের পাশে। রানার ঠোঁটের কোণ থেকে সরু একটা রক্তের ধারা বেরিয়ে এল সাথে সাথে।

গর্জে উঠল গেরিট্টি, 'বেরো, শালা!'

'আগেই বলেছি,' অদ্ভুত শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল রানা, 'অযথা ঝামেলা আমি পছন্দ করি না।'

মুহূর্তে রক্ত চড়ে গেল গেরিট্টির মাথায়। রাগটা সামলাতে না পেরে দড়াম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানার বুকের ওপর। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা চেয়ারসহ মেঝেতে। খসে পড়ল মাথা থেকে হ্যাটটা। একটা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো সে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনেকেই ঘিরে দাঁড়াল দু'জনকে।

দূর থেকে ঘটনাটা দেখছেন কর্নেল। অসন্তোষের ছাপ চোখেমুখে।

হাস্যকর রকম অসহায় আর দুর্বল লাগছে মেঝের ওপর পড়ে থাকা রানাকে গেরিট্টির পাশে। নেংটি ইঁদুর যেন পড়ে গেছে সিংহের খপ্পরে। পরিণতিটা কি হবে জানা আছে সবার।

ফুঁসছে গেরিট্টি রানার নির্লিপ্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে। বাধা দিচ্ছে না কেন ব্যাটা? বাধা না পেলে মেরে সুখ আছে? বীর বিক্রমে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে রানার মাথার কাছে। ডান পা তুলল। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে নেমে এল পা'টা রানার মাথায়। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল দুর্বল চিত্তরা। কিন্তু যারা চোখ খোলা রেখেছিল তারা দেখল পলক পড়তে না পড়তে মাথা সরিয়ে নিয়ে নিজেকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে রানা। স্প্রীঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন সিধে হয়ে, সরে দাঁড়িয়েছে কয়েক হাত তফাতে।

'গেরিট্টি, বারণ করছি, অযথা ঝামেলা পছন্দ করি না আমি।'

ঝড়ের বেগে ছুটে এল গেরিট্টি। রানার দু'হাতের আওতায় পৌঁছেই হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বিদ্যুৎ খেলে গেছে রানার শরীরে। ডান পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড বেগে লাথি মারল ও গেরিট্টির তলপেট লক্ষ্য করে। আর্তনাদ বেরুল গরিলার অন্তস্তল থেকে। দেখা গেল দু'হাতে পেট চেপে ধরে শিরদাঁড়া বাঁকা করে কুঁজো হয়ে পড়েছে গেরিট্টি। টলছে। সিধে হয়ে দাঁড়াবার জন্যে সময় দিল তাকে রানা। টলতে টলতে সিধে হলো গেরিট্টি। কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই হাতের উল্টো পিঠের পাওনা চড়টা ফিরিয়ে দিল রানা গেরিট্টিকে। টাশ্‌শ্‌ করে পিস্তলের আওয়াজ তুলল চড়টা। পরমুহূর্তে কনুই দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল গেরিট্টির বুকে, সেই সাথে পা বাড়িয়ে দিল ল্যাঙ মারার ভঙ্গিতে। দড়াম করে মেঝের উপর পড়ল তিনমণী বস্তা। মাথা ঠুকে গেল ভয়ানক ভাবে, চেষ্টা করেও উঠতে পারল না আর। অন্ধকার দেখছে সে চোখে।

একে একে সকলের দিকে তাকাল রানা। মার্শালের দিকে চেয়ে রইল ঝাড়া দশ সেকেন্ড। নিস্তব্ধ, দম বন্ধ করা পরিবেশ। তিন পা এগোল রানা। তারপর ঝুঁকে পড়ে সামনে থেকে তুলে নিল ক্যাপটা। তোবড়ানো ভাঁজগুলো হাত দিয়ে সিধে করল ধীরে ধীরে। তারপর ওটা মাথায় পরে নিয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

নড়ল না কেউ। কথা ফুটল না কারও মুখে। এই মুহূর্তে ঠিক কি [illegible]

দরকার বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। জুতোর উচ্চকিত শব্দ তুলে ধীরে সুস্থে চলে যাচ্ছে রানা। মার্শালের চোখ দুটো কুঁচকে উঠেছে, এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার পিছন দিকে। হঠাৎ, কি মনে করে কোটের পকেটে ঢুকে গেল তার ডান হাত। তক্ষুণি বেরিয়ে এল হাতটা সীল ভাঙা এনভেলপটাসহ। ভিতর থেকে পেপার কাটিংগুলো বের করে দ্রুত দেখতে শুরু করল মার্শাল। WANTED লেখা নোটিশের নিচে ছাপা পাসপোর্ট সাইজের ছবি। হঠাৎ স্থির হলো চোখের দৃষ্টি একটা ছবির উপর।

'দাঁড়াও!' হুকুম করল মার্শাল বাজখাঁই গলায়।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা, কানে আওয়াজ ঢুকতেই মুহূর্তে স্থির একটা মূর্তি হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে।

ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানাকে মার্শাল। এতক্ষণে যেন লোকটার বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে বিঁধছে তার। দীর্ঘ, ঋজু একটা শরীর। চালচলনে স্মার্ট, সাবলীল। চোখের দৃষ্টিতে ড্যাম কেয়ার ভাব। নিজের চারপাশে আশ্চর্য একটা ভারী ও দুর্ভেদ্য আবহাওয়া সৃষ্টি করার অদ্ভুত গুণ আছে এই লোকের। অন্তর্ভেদী, নিষ্পলক চোখ, আত্মবিশ্বাসের ছাপ সুস্পষ্ট। শিরদাঁড়া সোজা রেখে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে আছে মার্শালের দিকে। যেন চোখের দৃষ্টি দিয়েই কাবু করে ফেলবে রিজ সিটির দোর্দণ্ড প্রতাপ মার্শাল জন ডেভিডকে।

কাটিংটার উপর চোখ ফিরিয়ে আনল মার্শাল। তারপর আবার তাকাল রানার দিকে। না, কোন ভুল হচ্ছে না।

দ্রুত পা বাড়াল মার্শাল। দাঁড়াল গিয়ে কর্নেল ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের কাছাকাছি, রানার কাছ থেকে তিন হাত দূরে।

'নামটা আবার বলো তো হে?'

'মাসুদ রানা।'

'নিবাস?'

'ইউনাইটেড স্টেটস।'

'আদি নিবাস?'

'ভারত।'

মিষ্টি একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর, আগ্রহে ভরপুর, জানতে চাইল মাঝখান থেকে, 'বাঙালী নাকি?' বাংলা ভাষায় করল সে প্রশ্নটা।

কর্নেলের পাশে বসা মেয়েটির দিকে চাইল রানা। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ওর মধ্যে, যেন বোঝেনি সে প্রশ্নটা।

মার্শালের ডান হাতটা ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে সামনে চলে এল কোমরের এক পাশ থেকে পিস্তলসহ। 'হ্যান্ডস আপ!' স্বাতীর দিকে তাকাল সে। 'আপনি বোধ হয় জানতে চাইছেন, ও বাঙালী কিনা, তাই না? না, বাঙালী নয় ও, ওর জন্ম কেরালায়।'

ঘটনাটা নাটকীয় মোড় নিয়েছে, উঠে দাঁড়িয়েছেন কর্নেল রুজভেল্ট। 'চেনেন তাহলে ওকে?'

রানার চোখে চোখ রেখে মার্শাল বলল, 'আরও আগেই চিনতে পারা উচিত ছিল।' পিস্তলটা একটুও নড়ল না রানার বুকের দিক থেকে।

ভারী দেহটা নিয়ে কর্নেল এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন মার্শালের পাশে। পিস্তলটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল মার্শাল। বাঁ হাতের কাটিংটা দেখাল। কম দামী ক্যামেরায় তোলা হলেও ছবিটা যে রানার তাতে সন্দেহ নেই। কপালে ঝুলে পড়া চুলের কয়েকটা গোছা তর্জনী দিয়ে সরিয়ে গ্রীবা উঁচু করে তাকালেন কর্নেল রানার দিকে। শ্যেন দৃষ্টি ফুটল চোখে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকালেন মার্শালের দিকে। বললেন না কিছু। বগলের নিচে ঢোকানো হাতের ছড়িটা চেপে ধরলেন শুধু।

পেপার কাটিংয়ে লেখা নোটিশটা পড়তে শুরু করল মার্শাল। 'বেআইনী জুয়া খেলা, চুরি, জালিয়াতি, খুন আর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের জন্যে খোঁজা হচ্ছে।'

মেজর জোনাথন তিক্ত মন্তব্য করল, 'কেন যে এই এশিয়ানগুলোকে জায়গা দেয় সরকার—দেশটাকে নরক করে ছাড়ল এরাই!'

মার্শাল পড়তে শুরু করল আবার। 'জয়ন্ত সিং ওরফে মিরানা ঘুনচী ওরফে আফতাব মির্জা আর এখন মাসুদ রানা। আর ক'টা ওরফে আছে হে তোমার?' ঘুরে দাঁড়ানো রানার দিকে তাকাল মার্শাল। 'নেভাডা ইউনিভার্সিটিতে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের লেকচারার ছিলে তুমি, তাই না?'

'ইউনিভার্সিটি!' স্পষ্ট বিস্ময় প্রকাশ পেল কর্নেলের কণ্ঠস্বরে। 'হতচ্ছাড়া এই পাথুরে এলাকায় ইউনিভার্সিটিও আছে নাকি আবার?'

'উন্নতির হাওয়া লেগেছে এদিকেও একটু একটু।' বলেই পড়তে শুরু করল আবার মার্শাল কাটিংটা। 'ইউনিভার্সিটির চত্বরে আন্দোলন পাকানোর জন্যে ওকে বরখাস্ত করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল, তার আগেই ফান্ড থেকে মোটা অঙ্কের টাকা চুরি করে হাওয়া হয়ে যায় এক দিন। ফাঁদে পড়ে রেলক্রসিংয়ের কাছে এক লোহালক্কড়ের দোকানে। কেরোসিনের ড্রাম উপুড় করে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় স্টোরে। গোলমালের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করে। ওকে দেখতে পেয়ে বাধা দিয়েছিল যারা, মোট সাতজন, খুন হয়ে যায় সবাই ওর হাতে।' রক্তচক্ষু মেলে রানাকে দেখে নিয়ে আবার পড়ে গেল মার্শাল। 'এরপর ওর খোঁজ পাওয়া যায় শার্পের রেলরোড রিপেয়ার শপে। ঘেরাও করা হয়। কিন্তু ওয়াগন ভর্তি এক্সপ্লোসিভে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এলাকাটা ধ্বংস করে দেয়। পালিয়ে যায় সেখান থেকেও। সেই শেষ, এরপর আর টিকিটিও দেখা যায়নি কোথাও ওর।'

ভাঙা নড়বড়ে গলায় মার্শালের পিছন থেকে কথা বলে উঠল গেরিট্রি। 'এই সেই লোক, রেল ক্রসিংয়ের দোকান পুড়িয়েছিল?' এখনও তলপেট খামচে ধরে আছে গেরিট্রি, কোন মতে উঠে এসেছে এইমাত্র।

'হ্যাঁ,' বলল মার্শাল, 'গেরিট্রি, আজ তোমার ভাগ্য ভাল যে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম। তা না হলে ও তোমাকে কয়েক হাজার ফড়িংয়ে রূপান্তরিত করে চারদিকের দেয়ালে গেঁথে ফেলত।' কর্নেলের দিকে তাকাল মার্শাল।

'কেমন বুঝলেন, কর্নেল রুজভেল্ট?'

'ওর ফাঁসি হওয়া উচিত!' মিলিটারিসুলভ সোজা-সাপটা রায় দিলেন কর্নেল।

'সবটা তো এখনও পড়িনি,' বলল মার্শাল। 'নোটিশটা অনেক বড়।' একটা প্যারাগ্রাফের উপর কড়ে আঙুল রাখল সে। 'শার্পের এক্সপ্লোসিভ ওয়াগনটা যাচ্ছিল সেক্রেমেনটোতে, ক্যালিফোর্নিয়ায়। ইউ.এস. আর্মি অর্ডন্যান্স ডিপোর সম্পত্তি ছিল ওটা।'

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো কর্নেলের মধ্যে। কোমরের বাতের ব্যথা ভুলে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, ছড়িটা বগল থেকে নামিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারলেন নিজের পায়ে, তারপর সেটা রানার দিকে তুললেন সবেগে। 'আমি গ্রেপ্তার করছি ওকে! মিলিটারি কোর্টে বিচার হবে ওর!' মার্শালের দিকে তাকালেন। 'আপনার কিছু বলবার আছে?'

'না না! বলবার কি থাকতে পারে! আর্মির একজন অফিসার ওকে মুঠোয় পেয়ে ছাড়তে চাইবেন না, এ তো জানা কথা!'

'কিন্তু মার্শাল, হেডকোয়ার্টারে ওকে পাঠাব কিভাবে এখন?'

মার্শাল মাথা দোলাল, 'তাই তো, একটা সমস্যাই বটে।'

মার্শাল থামতেই কর্নেল বিরক্তির সাথে বললেন, 'কি আশ্চর্য! এটাকে আবার সমস্যায় রূপ দিতে চাইছেন কেন? ওকে আমরা সাথে করে নিয়ে যাব ফোর্ট হাম্বোল্ডে।' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন তিনি দৃঢ় কণ্ঠে। 'ওখান থেকে যারা ফিরে আসবে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেব হেডকোয়ার্টারে।'

মার্শাল তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, 'হ্যাঁ, তাই করলেই হবে।'

'কিন্তু!' কর্নেল দু'কোমরে হাত রেখে মুখ বিকৃত করলেন। হঠাৎ উত্তেজনাবশত বেকায়দা ভাবে নড়াচড়া করায় কোমরের ব্যথাটা চেগিয়ে উঠেছে তাঁর। 'চোর-ছ্যাঁচড়দের বন্দী করে রাখার কলা-কৌশল জানা নেই আমাদের, মার্শাল। আমাদের কাজকর্ম হচ্ছে—ধরো তক্তা মারো পেরেক। আপনি যখন সাথে যাচ্ছেন, ওকে সামাল দিয়ে রাখার দায়িত্বটা আপনাকেই নিতে হবে।'

একগাল হাসল মার্শাল। 'সে আর বলতে! ঠিক ধরেছেন, এই কাজেই তো হাত পাকিয়েছি গত পাঁচটা বছর।' ফেটে পড়ার হাত থেকে অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলেন কর্নেল। 'সব জায়গায়?' পুরোপুরি অবিশ্বাস তাঁর কণ্ঠে। 'সব জায়গায় খুঁজে দেখেছ তুমি?'

অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট নিকোলাস। এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডাতেও দরদর করে ঘামছে সে, 'ইয়েস, স্যার।'

'এ হতেই পারে না,' গর্জে উঠলেন কর্নেল। 'দু'দুজন ইউ.এস. সি-র অফিসার পালের ভেড়া নাকি যে হারিয়ে যাবে, আর কেউ তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে না?'

'সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, স্যার। কেউ দেখেনি ওদের। গোটা

এলাকাটা…'

'অসম্ভব!' ছড়ি দিয়ে নিজের হাতের তালুতে কষে বাড়ি মারলেন কর্নেল। সাথে সাথেই গাল কুঁচকালেন ব্যথায়।

কর্নেলের চোখে চোখ রেখেছে সার্জেন্ট অতি কষ্টে। গলা কেঁপে গেল তার। 'গোটা এলাকায় কোথাও ওরা নেই, স্যার।'

সামনে এগিয়ে এল মার্শাল। 'অনুমতি দিলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি, কর্নেল। পঁচিশ ত্রিশ জন লোককে নামিয়ে দিই; শহরের প্রত্যেকটি গলি ঘুপচি চেনে ওরা।'

ঝট্ করে তাকালেন কর্নেল মার্শালের দিকে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ধমক খাবার ভয়ে পিছিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে মার্শাল।

আর্মিকে সাহায্য করতে চাইছে সিভিল ফোর্সের একজন মার্শাল। ভাবতেই পারছেন না কর্নেল। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন, 'দেখুন চেষ্টা করে। যাত্রার সময় বিশ মিনিট পিছিয়ে দিচ্ছি আমি। এর মধ্যে পাওয়া না গেলে ওদের ফেলেই রওনা হব আমরা।'

পাশে দাঁড়ানো হাত বাঁধা মাসুদ রানার বুকের দিকে আঙুল তুলল মার্শাল। 'আসামীটাকে ট্রেনে তোলার ব্যবস্থা করুন আপনি। ততক্ষণ আমি দেখছি কি করা যায়। এর ব্যাপারে কিন্তু খুব সাবধান…চার পাঁচজন গার্ড থাকা দরকার…'

'মাত্র চার পাঁচজন কি পারবে ওকে সামলাতে?'

মার্শাল বলল, 'পুরো ট্রেনের সবাই মিলে ওকে সামলাতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবে, কি জানেন, স্যার, খবরের কাগজের লোকেরা ছোট্ট একটা ব্যাপারকে যে রঙ মাখিয়ে এত বড় করে তোলেনি তাই বা বুঝব কিভাবে? তবু, সাবধানের মার নেই। কড়া পাহারায় রাখতে হবে ওকে।'

সার্জেন্ট নিকোলাসের দিকে তাকালেন কর্নেল। এই তাকানোটাই হুকুম। গট গট করে এগিয়ে গেলেন তিনি প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ইঞ্জিনের দিকে। ভোঁস ভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে ইঞ্জিনটা আকাশের দিকে।

'কোন হদিস পেলেন, স্যার?' মাথা বের করে সবিনয়ে জানতে চাইল ড্রাইভার।

'নাহ্।'

'স্টীম কি পুরোপুরি চালু রাখব, স্যার?'

'না রাখার কারণ?'

'না…মানে, বলছিলাম কি স্যার, ক্যাপ্টেন আর লেফটেন্যান্টকে রেখেই কি আমরা রওনা হব?'

'পনেরো মিনিট দেখব আর। এর মধ্যে না ফিরলে ওদের ফেলেই যেতে হবে। পরের ট্রেন ধরতে পারবে ওরা পনেরো বিশ দিন পর।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা দিলেন কর্নেল ব্রেকভ্যানের দিকে। ট্রেনের গা ঘেঁষে হাঁটছেন, ছড়িটা দিয়ে মৃদু ঘা মারছেন হাতের তালুতে।

ইঞ্জিনের দিক থেকে প্রথম কোচটার এক তৃতীয়াংশ জায়গা আগলাচ্ছেন

কুউউ!

বসবার জন্যে। মাঝের অংশটুকু দু'ভাগে বিভক্ত, গভর্নর আর স্বাতীর বেডরুম। শেষভাগটা অফিসারদের ডাইনিংরুম। দ্বিতীয় কামরার একটা অংশ কিচেন আর বাকিটা অফিসারদের বেড। কিচেনেই ঘুমায় স্টুয়ার্ড হেনরী আর কুক রোলো। তৃতীয় কোচটা সাপ্লাই ওয়াগন। চতুর্থ আর পঞ্চমটা ঘোড়ার বগী। ছ'নম্বর কোচটার চার ভাগের এক ভাগ রাখা হয়েছে সিপাইদের রান্না-বান্নার জন্যে। অবশিষ্ট এবং সপ্তম কোচটায় ওদের ঘুমোবার ব্যবস্থা। পুরো গাড়িটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন কর্নেল। তীক্ষ্ণ নজরে দেখলেন সব কিছু। পিছনে হাসির শব্দ হতেই ফিরে তাকালেন চট্ করে।

সাড়ম্বর সতর্কতার সাথে রানাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে সার্জেন্ট নিকোলাস। দড়ির একটা প্রান্ত সার্জেন্টের হাতে ধরা। অন্য প্রান্ত ছাগলের গলায় পরানোর মত করে রানার গলায় বাঁধা। হাত দুটো বাঁধা রয়েছে পিছমোড়া করে। হাস্যকর ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে রানা সার্জেন্টের পিছু পিছু। ওদেরকে ঘিরে ধরে এগোচ্ছে কৌতুকপ্রিয় কয়েকজন সিপাই। হাসছে তারা রানার দুর্দশা উপভোগ করে। কিন্তু রানা পুরোপুরি নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি, হাসির কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে এর মধ্যে।

কয়েক সেকেন্ড ধরে দৃশ্যটা দেখলেন কর্নেল। মুচকি হেসে এগিয়ে গেলেন ব্রেকভ্যানের দরজার দিকে।

খানিকপর ব্রেকম্যান টমাস রিচার্ডের সাথে কথা বলে ট্রেন থেকে নামতেই কর্নেল মুখোমুখি হলেন মার্শালের। 'ইজ দেয়ার এনি নিউজ?'

'দুঃখিত, কর্নেল। অন্তত রিজ সিটিতে নেই ওরা।' মার্শালকে ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে।

মনে মনে খুশি হলেন কর্নেল রুজভেল্ট। সিভিল ফোর্সের কাছে মাথা নত করতে হয়নি, যা হোক।

'কোর্টমার্শাল করব আমি ওদের। বরখাস্ত করব চাকরি থেকে।'

সশব্দে পা ঠুকলেন কর্নেল শক্ত প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে। বেকায়দা অবস্থায় পা পড়ায় ব্যথা পেলেন গোড়ালিতে, ককিয়ে উঠলেন ব্যথায়। 'অবশ্য কাজের লোক ছিল—সবচেয়ে করিৎকর্মা অফিসার ছিল ওই দুজনই। যাকগে, চলুন, মার্শাল, আর দেরি করা যায় না, সময় হয়ে গেছে রওনা হবার।'

এগিয়ে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ল মার্শাল। পিছনে ফিরে তাকালেন কর্নেল। সৈনিকরা উঠে পড়েছে সবাই। ঘোড়ার ওয়াগনের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সব ঠিকঠাক।

ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে তাকালেন কর্নেল। মাথা বের করে এদিকেই চেয়ে আছে ক্রিস্টোফার। হাত নেড়ে নির্দেশ দিলেন তাকে কর্নেল। ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ড্রাইভারের মাথাটা। স্টীম রেগুলেটার খোলার দরুন পরমুহূর্তে শোনা গেল স্টীম উদ্গিরণের চাপা হিস্ হিস্। গড়াতে শুরু করল চাকাগুলো। ক্যাচ-ক্যাচ, ক্যাচ—কুউউ—ঝিক-ঝিক, ঝিক-ঝিক, ঝিক-ঝিক···

ট্রেনের পাশে পাশে কয়েক কদম হাঁটলেন কর্নেল, তারপর উঠে

পড়লেন।

ক্রমশ গতি বাড়তে লাগল ট্রেনের। কুউউ···

দুই

সাঁই সাঁই বাতাসের শব্দ আর একটানা চাকার ঘড়ঘড়ানিতে হারিয়ে গেছে ইঞ্জিনের হুস হুস। বন্ধ শার্সিতে অবিরাম হামলা চালাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া। শেষ হয়ে গেছে সমতল ভূমি, ট্রেন এখন পুরোপুরি পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করেছে। সূর্যাস্ত দেখা যাচ্ছে না মেঘ আর পাহাড়ের আড়ালে। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বরফ, বরফ আর বরফ।

মনোরমভাবে সাজানো ড্রয়িংকোচে আরাম করে বসে আছে সবাই। প্রকাণ্ড দুটো হাতলওয়ালা আর্ম চেয়ারের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো সবুজ মখমলে মোড়া চেয়ার। জানালার এমব্রয়ডারী করা ভারী পর্দাগুলো সিল্কের দড়ি দিয়ে টাঙানো। নরম কার্পেটে পায়ের গোড়ালি অবধি ডুবে যায়। পালিশ করা ঝকঝকে মেহগনির টেবিলটার চারদিকে দাঁড় করানো আরও ক'টা চেয়ার। ডান পাশের লিকার কেবিনেটে পর্যাপ্ত মদের বোতল। গোটা কামরাটা সবুজাভ আলোয় স্নান করছে।

দু'জন বাদে সাতজনের হাতেই মদের গ্লাস। মার্শালের পাশে স্বাতী, তার হাতে মদের বদলে অরেঞ্জ-জুসের গ্লাস। আঁটো প্যান্ট আর জ্যাকেটের বদলে এখন পরেছে হলুদ শিফন, মাথায় চমৎকার খোঁপা। তবে দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে বাঁ হাতের প্রকাণ্ড ব্রেসলেটটা। কপালে মস্ত একটা টিপও পরেছে যত্ন করে। তার সামনে একটা কাউচে বসে আছেন কর্নেল। পাশে আর একটা কাউচ। তাতে গভর্নর জ্যাকসন। দুটো আর্ম চেয়ার দখল করে আছে ডা. মলিনেক্স আর মেজর জোনাথন। তৃতীয় চেয়ারটায় রেভারেন্ড জন কালাহান। হাতে একগ্লাস পানি, চিনি মেশানো। কামরার একমাত্র লোক যার হাতে কোন গ্লাসই নেই—সে হলো রানা।

নাইট কমপার্টমেন্টের প্রবেশ পথের ঠিক মুখটায় অত্যন্ত বেকায়দা অবস্থায় পড়ে আছে ও। কারও খেয়াল নেই ওর দিকে। ও যে একটা মানুষ তা জোর করে, ইচ্ছা করে সবাই ভুলে আছে—একজন ছাড়া। স্বাতী মাঝে-মধ্যে, তাও যেন ভুলক্রমে, তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ঠোঁটের কাছে গ্লাস তুলল মার্শাল। 'কল্পনাও করিনি আর্মি অফিসারেরা এমন বিলাসিতার মধ্যে ভ্রমণ করেন। আপনাদের সাথে যাবার সুযোগ পেয়ে সত্যি গর্ব অনুভব করছি।' স্বাতীর দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু ভার্জিনিয়া সিটি অত্যন্ত দুর্গম আর···খোলাখুলি বলাই ভাল···বিপজ্জনক জায়গা। গোটা হাম্বোল্ডকে বিস্ফোরক পদার্থ বললেও কম বলা হয়। ওখানে আপনি কি মনে করে···?'

স্বাতীর হয়ে উত্তর দিলেন কর্নেল রুজভেল্ট, 'ফোর্ট হাম্বোল্ডের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জনসনের বিশিষ্ট বন্ধু ওর বাবা আশরাফ চৌধুরী। আমারও বন্ধু। চৌধুরী এখন ফোর্ট হাম্বোল্ডে কর্নেল জনসনের আতিথ্যে আছে। বাবার সাথে দেখা করতে চাইল, তাই সাথে করে এনেছি স্বাতীকে।'

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে স্বাতী মার্শালের দিক থেকে। হোক মার্শাল, লোকটাকে পছন্দ হয়নি তার।

'তা গভর্নর, আপনি কি মনে করে…?'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল নেভাডার গভর্নর। সুঠাম দেহ, এক মাথা সাদা চুল, গোঁফ আর দাড়ি নিয়ে এই লোক ইউ.এস. সিনেটের জেনারেলের পদ অধিকার করে বসলেও বেমানান হবে না! 'ভিজিট দিতে যাচ্ছি ভার্জিনিয়া সিটিতে।' হাসছে গভর্নর। 'হাফ ইয়ার্লি ট্যুর।'

গভর্নরের উল্টোদিকে বসা ডাক্তারের দিকে তাকাল এবার মার্শাল।

কেউ কিছু বলার আগেই লোকটা কথা বলে উঠল। চওড়া শরীর, একটু বেঁটে, চেক স্যুট পরা হাসিখুশি চেহারা। 'ডাক্তার এডওয়ার্ড মলিনেক্স, আপনার খেদমতে হাজির, মার্শাল।'

'নিশ্চয়ই ভার্জিনিয়া সিটিতে ঢুঁ মারতে যাচ্ছেন? ভাল, ভাল! একটাই কাজ সারাক্ষণ ধরে করার সুযোগ পাবেন আপনি ওখানে।'

'কি সেটা?' সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকল ডাক্তার।

'ডেথ সার্টিফিকেট লেখার কাজ। এত বেশি লিখতে হবে যে আধ ঘণ্টাও বিশ্রাম পাবেন কিনা সন্দেহ। ভয় পাবেন না, চিকিৎসার পিছনে সময় নষ্ট করতে হবে না—স্বাভাবিক মৃত্যু একটাও পাবেন না আপনি ওখানে।'

হাসিখুশি ডাক্তারের চেহারা এতটুকু মলিন হলো না। 'কি জানেন, আসলে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। ফোর্ট হাম্বোল্ডের ডাক্তারের অবস্থা আমার জানা আছে।' চেহারা হাসিখুশি হলেও, ভিতরে এই লোক যে কংক্রিটের মত শক্ত, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে একচুলও নড়ানো যায় না তা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলেই বোঝা যায়।

ডাক্তারের পাশে বসেছে রেভারেন্ড। খর্বকায়, ছোটখাট চেহারা। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়বার মত ঠোঁট নাড়ছে, কখনও চোখ বুজে থাকছে, কখনও চোখ মেলে অদ্ভুত মিষ্টি হাসছে। মার্শালের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জিভের ডগা দিয়ে, ঢোক গিলল একবার। নার্ভাস, গোবেচারা টাইপের লোক।

কর্নেল তার হয়ে কথা বললেন, 'ওর চাচাতো ভাই প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি। বড় রকমের একটা পদবী পেয়ে যাচ্ছে রেভারেন্ড শিগ্গিরই ভার্জিনিয়া সিটিতে।'

'তাই নাকি!' মার্শাল অবাক হলো, না ব্যঙ্গ করল বোঝা গেল না। 'কিন্তু উনি কি পিউতী ইন্ডিয়ানদের মাঝখানে টিকতে পারবেন? আমার তো ভরসা হয় না।'

আর একবার ঢোক গিলল রেভারেন্ড। 'শুনেছি সাদা চামড়া দেখামাত্র

নাকি খুন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠে ইন্ডিয়ানরা, সত্যি নাকি?'

'কারেক্ট। হান্ড্রেড পার্সেন্ট। তবে, একটু ভুল হয়েছে আপনার,' বলল মার্শাল। 'দেখা মাত্র খুন আজকাল করে না ওরা। ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে, অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে জান কবচ করে।'

কেউ কোন মন্তব্য করল না।

কিভাবে যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে পরিবেশটা এরই মধ্যে। গাঢ় নীরবতা সেই যে নামল, তা আর ভাঙার কোন লক্ষণ দেখা গেল না দীর্ঘক্ষণ।

এক কোণে শুধু জ্বলছে কর্ড কাঠের গনগনে লাল কয়লা। রানার মাথাটা ঝুঁকে এসেছে বুকের কাছাকাছি। চোখের পাতা দুটো মোড়া। ঘুমায়নি সম্ভবত ও, কারণ, ওই বেকায়দা অবস্থায় বসে কুম্ভকর্ণেরও ঘুমুতে পারার কথা নয়। গলা খাঁকারি দিয়ে স্টুয়ার্ড হেনরী একবার ঢুকল ভিতরে। গ্লাস আর বোতল নাড়াচাড়া করার শব্দ হলো খানিকক্ষণ, তারপর আবার যেকে সেই।

নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠতে স্বাতী রীতিমত চিৎকার করে জানতে চাইল, 'কর্নেল, ট্রেন এত জোরে ছুটছে কেন?'

'ইউ.এস. আর্মি ঢিলেমি পছন্দ করে না, মা। তাছাড়া এমনিতেই দু'দিন পিছিয়ে আছি আমরা।' পদশব্দ শুনে তাকালেন দরজার দিকে।

কামরায় দ্বিতীয়বার প্রবেশ করছে স্টুয়ার্ড। 'ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে, স্যার।'

•

গভর্নর বসল আগে, কিন্তু মহীরুহের মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কর্নেল রুজভেল্ট না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল আর সবাই। দুটো টেবিলে চারটে করে চেয়ার পাতা। চাকচিক্যের দিক থেকে ডাইনিংরুমটা ডে-সেলুনটার মতই। খানাপিনার আয়োজনেও বিলাসিতার কমতি নেই। কর্নেলের সাথে বসল স্বাতী, গভর্নর আর মেজর জোনাথন। বাকি তিনজন অন্য টেবিলটায়।

সদাহাস্যময় ডাক্তারকে হঠাৎ কেন যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছে। মাথাটা নিচু, কারও দিকে খেয়াল নেই। ফোড়ন কাটল মার্শাল তার পাশ থেকে। 'ডাক্তারের আবার অসুখবিসুখ হলো নাকি?'

মুখ তুলল ডাক্তার মলিনেক্স। তাকাল এমনভাবে যেন মার্শালের কথা পরিষ্কার শুনতে পায়নি। কিন্তু কথা বলল এমন একটা বিষয়ে, যার সাথে প্রসঙ্গের কোন মিলই নেই। 'আমি আর রেভারেন্ড সুদূর ওহিয়ো থেকে আসছি, মার্শাল। ওখানেও আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।'

কালো হয়ে গেল মার্শালের মুখ। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে। ডাক্তার কোটের বুক পকেট থেকে রুমাল বের করে ঠোঁটের কোণা মুছছে, আসলে ওটা বাঁকা হাসি আড়াল করার চেষ্টা।

'আমার সম্পর্কে ভাল কিছু শুনেছেন, মনে হয় না,' বলল মার্শাল। 'লোকে খারাপ দিকটাই সব সময় তুলে ধরতে পছন্দ করে।'

ডাক্তার সবিনয়ে বলল, 'শান্তিরক্ষার জন্যে আপনি অসংখ্য মানুষ খুন করেছেন, কিন্তু সেগুলোকে বোধ হয় মার্ডার বলা চলে না, তাই না?'

ইন্ডিয়ানগুলো…'

'থামুন, ডাক্তার! খুন যে দু'একটা করিনি তা নয়। কিন্তু তার মধ্যে ইন্ডিয়ান নেই একটাও। আসলে কি জানেন, খুনেও মানুষের বিতৃষ্ণা আসে। এখন ওসব আর ভাল লাগে-না। একসময় আমি স্কাউট ছিলাম, ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধেও লেগেছি—তখনকার কথা ভুলে যেতে চাই। শান্তির জন্যে কাজ করতে চাই আমি এখন।'

ডাক্তার শব্দ করে হাসতে শুরু কল। মাথাটা হেলে পড়ল পিছনে। মার্শাল যেন মহা কৌতুককর কোন কথা বলেছে, হাসি থামতে চাইছে না তাই।

কটমট করে চাইল মার্শাল ডাক্তারের দিকে। মুখোমুখি বসা রেভারেন্ড কালাহান বিড়বিড় করে কি যেন বলছে, চিবুক ঠেকে আছে তার বুকের কাছে। আরেক জগতে অবস্থান পাদরী সাহেবের।

হাসি থামিয়ে ডাক্তার মার্শালের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'শান্তি চান? কোমরে তাহলে দুটো পিস্তল কেন আপনার?'

'ওহ্ হো!' মার্শাল সবজান্তার মত ভঙ্গি করল। 'বুঝেছি, এদুটো দেখেই ভয় আর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে আপনার।' অকারণ দোষারোপ, ডাক্তারের মধ্যে ভয় পাবার বা সন্দেহ করার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায়নি। 'আমার হাতে ধরা পড়ে যারা জেলে গিয়েছিল তাদের অনেকেই ছাড়া পেয়েছে—এই খবর পাবার পর দুটো পিস্তল সাথে না রেখে করি কি বলুন?' দু'কোমরের পিস্তলে আদর করে হাত বুলাতে লাগল মার্শাল।

ডাক্তার মলিনেক্স মাথার পিছনটা চুলকে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মুখ তুলল রেভারেন্ড কালাহান। পবিত্র হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। বলল, 'যাক এতদিনে সত্যিকার একজন শান্তিপ্রিয় লোক খুঁজে পেলাম তাহলে।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল ডাক্তার। হাত তুলে ফেলেছিল সে রেভারেন্ডের কাঁধে চাপড় মারার জন্যে, কিন্তু সামলে নিল সময় থাকতে।

মার্শাল নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছে। 'ব্যঙ্গ করছেন করুন। আপনারা জানেন কিনা জানি না, সরকারের কাছে আমি অনুমতি চেয়েছি আমাকে এই এলাকার ইন্ডিয়ানদের এজেন্ট বানিয়ে দেবার জন্যে। দেখা যাক কি উত্তর আসে। আমি চাই ওদের সাথে একটা সমঝোতায় পৌছুতে।' কথার ফাঁকে ফাঁকে কর্নেলের দিকে তাকাচ্ছে মার্শাল। 'একমাত্র আমাকেই এদিককার ইন্ডিয়ানরা একটু যা বিশ্বাস করে। তাই বলছি, একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব মধ্যস্থতা করা। আপনি কি বলেন, কর্নেল?'

আলোচনার প্রসঙ্গ সম্পর্কে কোন রকম ধারণা না দিয়ে মতামত জানতে চাওয়াটা যে শালীনতা বিরুদ্ধ এই জ্ঞানটুকুও কি তোমার নেই—ঠিক এই প্রশ্নটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েও কর্নেল নিজেকে সংবরণ করলেন। বললেন, 'বাজে কথা বলা বন্ধ করা উচিত আমাদের। বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকছি এখন আমরা।'

মুখ শুকিয়ে গেল ডাক্তারের। 'বিপজ্জনক এলাকা মানে? পিউতীদের

এলাকা নাকি?'

'হ্যাঁ,' মার্শাল তির্যক দৃষ্টি হানল ডাক্তারের দিকে। 'ওরা বিপজ্জনক হিসেবেই পরিচিত বটে।'

ডাক্তার হাসতে আরম্ভ করল। 'আপনি যখন আমাদের সাথে রয়েছেন, চিন্তার কিছু নেই নিশ্চয়ই? ওরা আপনাকে বিশ্বাস করে যখন।'

'একটু,' মার্শাল নখের উপর সিগারেট ঠুকে ঠোঁটে তুলল সেটা। 'পুরোপুরি বিশ্বাস করে তা কি দাবি করেছি?'

'চিন্তার কথা তাহলে!' কথাটা বলল বটে, কিন্তু এতটুকু চিন্তিত দেখাল না ডাক্তারকে। অভ্যাসমত পা নাচাতে লাগল সে।

সেলুনে ফিরে এসে বসল আবার সবাই। কফি সার্ভ করল হেনরী। জানালাগুলো বন্ধ করে ফিরে গেল সে। কামরার সবুজাভ আলোর সাথে যোগ দিয়েছে কয়লার লাল আভা। গাঢ়, থমথমে হয়ে উঠেছে পরিবেশটা। তাপমাত্রা উঠে এসেছে আশি ডিগ্রীতে।

একটা কনুইয়ের ওপর প্রায় সম্পূর্ণ দেহটা চাপিয়ে উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়ে আছে রানা। চোখ দুটো আধবোজা। আগের চেয়ে আরও বিদঘুটে রূপ ধারণ করেছে ওর অবস্থা।

রেভারেন্ডের সাথে নিচু গলায় কথা বলছিল ডাক্তার। মার্শালের সাথে চোখাচোখি হতেই শিরদাঁড়া সোজা করে বসল, তাকাল কর্নেলের দিকে অনুমতির দৃষ্টিতে, 'বহুত খাটাখাটনি আছে কাল। কর্নেল, যদি কিছু মনে না করেন...'

এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ কাত্ হলো কর্নেলের মাথা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার।

'কিসের আবার খাটাখাটনি আগামীকাল?' স্বাতী জানতে চাইল কর্নেলের পাশ থেকে।

হাসিটা লেগে আছে ডাক্তারের ঠোঁটে। 'মাত্র গতকালই তো বেশির ভাগ ওষুধপত্র তোলা হয়েছে ট্রেনে। ফোর্টে পৌঁছুবার আগেই সব ভাল করে গুছিয়ে নিতে হবে না?'

ডাক্তারের জবাবদিহি দেবার ভঙ্গি লক্ষ করে ভুরু কুঁচকে উঠল স্বাতীর। 'কি ব্যাপার, ডাক্তার? কি একটা রোগের কথা বলতে গিয়েও বললেন না আপনি। ফোর্টের খবর কি? রোগটা কি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে?'

হাসিটা দপ্ করে নিভে গেল ডাক্তারের ঠোঁট থেকে। বোকার মত তাকাল একবার সে কর্নেলের দিকে। হাত কচলাতে শুরু করল স্বাতীর দিকে চেয়ে। 'না, মানে...'

'ডাক্তার!'

শেষ ভরসাস্থল কর্নেল। সেদিকেই ফের তাকাল ডাক্তার। দেখাদেখি আর সবাইও।

প্রকাণ্ড মুখটা থমথম করছে কর্নেলের। চেহারার দিকে তাকিয়ে সাহস হলো না কারও কোন প্রশ্ন উচ্চারণ করতে। ধীরে ধীরে নিজেই মুখ তুললো

কর্নেল। সরাসরি তাকালেন স্বাতীর দিকে। গাম্ভীর্যের রেখাগুলো মিলিয়ে গেল মুখ থেকে, স্নেহ ও সহানুভূতি ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। 'ফোর্ট হাম্বোল্ডে শুধু রিলিফ নিয়ে যাচ্ছে না এই ট্রেন। গত ক'দিনে ওখানে যারা মারা গেছে তাদের জায়গা দখল করতে যাচ্ছে সেনাবাহিনীর লোকেরা। ফোর্ট হাম্বোল্ডে কলেরা দেখা দিয়েছে মহামারী আকারে।'

'কলেরা!' আঁৎকে উঠল স্বাতী। 'বাবা···

এক হাত দিয়ে টেবিলের কিনারা চেপে ধরলেন কর্নেল, আরেক হাত রাখলেন কোমরের ব্যথার ওপর, পায়ের উপর ভর দিয়ে দশাসই দেহটাকে অতি কষ্টে দাঁড় করালেন।

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সবাই। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে স্বাতী, কর্নেল তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা হাত রাখলেন তার কাঁধে। 'ভয়ের কিছু নেই, মা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তোমার বাবা নিরাপদেই আছেন জানি।'

গভর্নর, ডাক্তার ও জোনাথন আগে থেকেই জানে ব্যাপারটা। চমকে উঠেছে রেভারেন্ড। চোখ কপালে উঠে গেছে তার। হতভম্ব দেখাচ্ছে মার্শাল ডেভিডকেও।

রেভারেন্ড প্রতিবাদের সুরে বলল, 'এটা অনুচিত!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন কর্নেল। চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

কুঁকড়ে গেল রেভারেন্ড। আমতা আমতা করে বলল, 'মানে বলছিলাম কি, ওইটুকুন একটা মেয়েকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মহামারী এলাকায়, এটা ঠিক উচিত হচ্ছে না। এখনও যদি ফিরে যাওয়া যায়···'

'স্বাতীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াটা অনুচিত হচ্ছে তা আমি এই মুহূর্তে স্বীকার করতে রাজি নই,' ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বললেন কর্নেল, গম গম করতে লাগল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'কাজটা ভুল হয়েছে কিনা তা আমি পরে ভেবেচিন্তে দেখব। কিন্তু দয়া করে কেউ প্রলাপ বকবেন না। আমি সামনে এগুচ্ছি ব্যাক করার জন্যে নয়। তাছাড়া এত ভয় পাবার কি আছে? ডাক্তার এলাকাটাকে রোগ-মুক্ত ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমরা এই ট্রেন থেকে নামব না। ফোর্ট হাম্বোল্ডের মত এই ট্রেনও একটা নিরাপদ দুর্গ, পুরো একমাস কাটাতে পারব আমরা এর মধ্যে।'

কর্নেল থামতেই মার্শাল ফুট কাটল, 'কিন্তু, ডাক্তার তো রুগীদের চিকিৎসা করার জন্যে নেমে যাবেন। তিনিই যদি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পটল তোলেন, কি হবে আমাদের দশা?'

ডাক্তার তাকাল স্বাতীর দিকে। অভয় দিয়ে বলল, 'মার্শালের কথায় ভয় পেয়ো না, স্বাতী, কলেরা আমার কিছু করতে পারবে না। কলেরায় একবার আক্রান্ত হয়ে কলেরা-প্রুফ হয়ে গেছি আমি, আর কখনও ধরবে না রোগটা আমাকে।'

হাস্যকর বেকায়দা অবস্থা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করল রানা, 'কোথায় রোগটা ধরেছিল আপনাকে, ডাক্তার?'

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল সবাই ওর দিকে।

উঠে দাঁড়াতে গেল মার্শাল চোখমুখ লাল করে, হাত নেড়ে নিষেধ করল তাকে ডাক্তার। 'ভারতে। রোগটা সম্পর্কে ওখানেই জ্ঞানার্জন করি আমি,' বেশ গর্বের সাথে, সহাস্যে বলল ডাক্তার। 'কেন?'

'এমনি। জ্ঞানার্জন করেন, না? কবে?'

স্তম্ভিত সবাই রানার ব্যঙ্গ করার স্পর্ধা দেখে।

হাসিটা ধরে রাখতে পারল না ডাক্তার মুখে। অপ্রতিভ দেখাচ্ছে তাকে। 'আট দশ বছর আগে। কিন্তু কেন?'

'আপনি আমার ওয়ান্টেড নোটিশটা শুনেছেন। মেডিসিন সম্পর্কে অল্পস্বল্প জানি। সেজন্যেই কৌতূহল হচ্ছিল, আর কোন কারণ নেই।' কিন্তু রানার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি দেখে কারও বুঝতে বাকি রইল না, ডাক্তারকে ডাক্তার বলেই মনে করছে না ও।

অবিশ্বাসের ও বিমূঢ় দৃষ্টিতে রানাকে ক'সেকেন্ড দেখল ডাক্তার, কর্নেলের দিকে তাকাতে গিয়েও তাকাল না, ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল দরজার দিকে।

পিছন থেকে মৃদু শব্দ হলো হাসির।

ডাক্তার অদৃশ্য হয়ে যেতে হাসিটাও অদৃশ্য হলো মার্শালের। 'ব্যাপার সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।' কপালে চিন্তার রেখা ফুটল তার। 'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ক'জন মারা গেছে, কর্নেল?'

কর্নেল অত্যন্ত নিচু গলায় লক্ষ্মী-মা, সোনা-মা ইত্যাদি বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন স্বাতীকে। মার্শালের প্রশ্ন তার কানেই যায়নি যেন।

উত্তর দিল মেজর জোনাথন, 'ছয় ঘণ্টা আগে শেষ খবর পেয়েছি। পনেরোজন নেই। ছিয়াত্তর ঘণ্টায় পনেরোজন। পরবর্তী ছয় ঘণ্টায় আরও ক'জন কমেছে ধারণা করতে পারছি না। ডাক্তারের ধারণা, তিনভাগের দু'ভাগ কিংবা চারভাগের তিনভাগ অথবা এর মাঝামাঝি কিছু সংখ্যক লোক বেঁচে নেই।'

মার্শাল বলল, 'ফোর্ট পাহারা দিতে সক্ষম লোকের সংখ্যা তাহলে দশ পনেরোজনের বেশি হবে না। চমৎকার একটা সুযোগ এটা দাগুর জন্যে। সে যদি জানতে পারে...'

'দাগু?' জানতে চাইল জোনাথন। 'কুখ্যাত রক্তখেকো সেই পিউতী-চীফ দাগুর কথা বলছ?'

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল।

'দাগুর শ্বেতাঙ্গ বিতৃষ্ণার কথা সবাই জানে, বিশেষ করে ইউ.এস. সি-র লোকদের দু'চোখে দেখতে পারে না সে। কিন্তু সাময়িক ভাবে ফোর্ট অরক্ষিত হয়ে পড়লেই যে সে ওটাকে দখল করার জন্যে মেতে উঠবে, অত বড় বোকা সে নয় বলেই মনে করি আমি।' মেজর মাথা দোলাল এদিক ওদিক। 'আগুপিছু চিন্তা করে দেখবে সে। তা যদি দেখে, ফোর্টের দিকে এক পা-ও বাড়াবে না এই অবস্থায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে দাগু ভীতু। সে বুদ্ধিমান, এই

কথাই বোঝাতে চাইছি আমি।'

কর্নেল স্বাতীকে বসিয়ে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে এলেন। 'ভোর হোক, সর্বশেষ খবর জানার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'কিভাবে?' এক মিলিমিটার উপরে উঠল মার্শালের একদিকের ভুরু। 'তা কিভাবে সম্ভব?'

'ট্রেনে একটা পোর্টেবল ট্রান্সমিটার আছে। লাইনের পাশে টেলিগ্রাফের তারে ট্রান্সমিটারের তার ক্লিপ দিয়ে আটকে দিলেই হবে, পশ্চিমের শেষ দুর্গ, এমন কি ওগডেনের সাথেও যোগাযোগ করতে পারব আমরা এইভাবে।' স্বাতীর দিকে মুখ তুললেন তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আবার সে। 'স্বাতী!'

'আমি···আমি অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করছি, কর্নেল।' দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফেরাল স্বাতী, সরাসরি তাকাল মার্শালের দিকে। চিবুক নেড়ে ইঙ্গিতে দেখাল রানাকে। 'মার্শাল, ও কি সারারাত এখানে এ ভাবে পড়ে থাকবে, কিছু খাওয়া-দাওয়া করবে না?'

'বহুত বড় বজ্জাত ব্যাটা, একটু শাস্তি পাক না,' বলল মার্শাল। 'সকাল বেলা না হয় ওর বাঁধন কেটে দেয়া যাবে।'

'স-কা-লে!'

স্বাতীর কথায় কান না দিয়ে মার্শাল বলতে শুরু করল, 'সকালে এমন একটা ভয়ঙ্কর এলাকায় পৌঁছে যাব আমরা, পিউতীদের ভয়ে আজরাইলও যেখানে সাহস পাবে না ট্রেন থেকে নামতে। বরফ আর পিউতী, এই দুটো জিনিস ছাড়া খোদার দুনিয়ার আর কিছু নেই ওখানে। ট্রেন থেকে বদমাশটা নরকে যেতেও রাজি হবে, কিন্তু মুক্তি দিয়ে ওখানে নামিয়ে দিতে চাইলেও নামতে রাজি হবে না।'

'কিন্তু ওকে আপনি সারাটা রাত এখানে ফেলে রাখবেন এভাবে?' সবাইকে অবাক করে দিয়ে জবাবদিহি চেয়ে বসল স্বাতী। 'কেন?'

চেয়ে রইল মার্শাল স্বাতীর দিকে। শান্ত চোখে দেখছে।

কারও দিকে না তাকিয়েও অনুভব করছে স্বাতী, সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে। রানার মত একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের জন্যে বেশি দরদ দেখানো হয়ে যাচ্ছে তার।

মুচকি হাসি ফুটল মার্শালের ঠোঁটে। 'একটা কুকুরের ওপর এত কেন মায়া, মিস স্বাতী? ওর পরিচয় কি আপনি জানেন না?'

'জানি,' জোর দিয়ে বলল স্বাতী। 'আইনের চোখে ওর পরিচয় ও একটা মানুষ। আইনের লোক হয়ে আপনি আইনের মুখে চুনকালি দিচ্ছেন, মার্শাল।' নিজের উত্তেজনা অনুভব করে এবং উচ্চকিত গলা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল স্বাতী। কিন্তু যা একবার শুরু করেছে সে, তা শেষ না করে থামাও যায় না। 'আমি যতদূর জানি, ইউনাইটেড স্টেটস-এর আইন অত্যন্ত মানবিক। আদালতে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেয়া বা দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। মার্শাল, আপনি বেআইনী কাজ করছেন।' কথা শেষ করে রানার

দিকে একবার তাকাল স্বাতী, তারপর হাইহিলের শব্দ তুলে দ্রুত বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

করতালিতে চারদিক মুখর করে তুলতে ইচ্ছা করলেও সুযোগ না থাকায় ইচ্ছাটাকে দমন করতে বাধ্য হলো রানা।

স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই। কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কোন কথা যোগাল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল জোনাথন, মুচকি হেসে বলল সে, 'বুঝতে পেরেছ তো, ডেভিড, আইন সম্পর্কে জ্ঞানদান করে গেল মেয়েটা তোমাকে? বলবার মত কিছু নেই তোমার, স্বভাবতই, তাই না?'

ঘাড় ফিরিয়ে মেজরের দিকে তাকাল মার্শাল। লম্বা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মদের বোতল ধরতে ধরতে কি বলল বিড় বিড় করে ঠিক বোঝা গেল না।

ঘুটঘুটে অন্ধকার সাদা বরফে প্রতিফলিত হয়ে নীলচে হয়ে গেছে। দূরের বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ের চূড়াগুলো সাদা ভাল্লুকের মত দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এক পাশে পাইনের বন, আরেক পাশে নদীটা। যদিও বরফে ঢাকা নদীটাকে চেনার যো নেই এখন। ধবধবে সাদা বরফের মোড়কে আবৃত পাইন গাছগুলোর উপর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসছে। ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া পাহাড়ের কোল বেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এগোচ্ছে রিলিফ ট্রেন।

ডে-কমপার্টমেন্টটা সবচেয়ে আরামদায়ক হলেও আরামটা উপভোগ করার মত অবস্থায় নেই রানা। দেহটা কাত্ হয়ে আছে ওর। রশিগুলো আরও চেপে বসেছে কব্জিতে। খোলা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে গেল একবার, তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরের শিরায় শিরায়। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার খায়েশ হলো না আর। ঘুমুতে যে চেষ্টা করবে, তারও উপায় নেই। তন্দ্রা মত এলে শরীরটা একটু বাঁকাচোরা হয়, সাথে সাথে তীব্র ব্যথায় কলজে পর্যন্ত চমকে ওঠে, কুঁচকে ওঠে মুখ।

ঘুম নেই আরও একজনের চোখে। বাঙ্কের নরম বিছানায় পা ঝুলিয়ে পিঠ খাড়া করে বসে আছে স্বাতী। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে অসহিষ্ণুভাবে ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে দরজার দিকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল হঠাৎ। বাঙ্ক থেকে নামল গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে। পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে থামল।

দরজা খুলে প্যাসেজ-ওয়েতে বেরিয়ে এল স্বাতী। গভর্নরের কামরার দরজায় কান রাখতে ভিতর থেকে ভেসে এল নাসিকা গর্জনের একটানা আওয়াজ। পা বাড়াল নিশ্চিন্ত মনে।

ডে-কমপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভিতরে তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ধরা পড়ে গেল স্বাতী। ঘাড় বাঁকা করে ওরই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে রানা। যেন জানত, আসবে স্বাতী। কষ্টের বিন্দুমাত্র নেই চেহারায়।

সঙ্কোচ বোধ করল স্বাতী। অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বোকার মত বলে ফেলল, 'কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার?'

'না-না! অসুবিধে কিসের, অসুবিধে হবে কেন?' মুচকি হেসে পাল্টা

বাংলায় বলল রানা।

থতমত খেয়ে অবিশ্বাস ভরা চোখে চেয়ে রইল স্বাতী।

'আপনি বাঙালী?'

'এবং বাংলাদেশী,' বলল রানা। 'কিন্তু কথাটা বোলো না কাউকে। আমি জানি, নিষেধ করলে তুমি বলবে না কাউকে।'

'আপনার নিষেধ মানব ভাবছেন কেন?'

'তা ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু ব্যাখ্যাটা শুনে ভীষণ লজ্জা পাবে তুমি,' বলল রানা হাসতে হাসতে। 'সে যাক। এত সাহস পেলে কোত্থেকে তুমি? মার্শাল যদি টের পায়...'

'পাক!' রাগ চাপল না স্বাতী। আমার কথা আপনাকে অত ভাবতে হবে না।'

'কি ভাবতে হবে তাহলে আমাকে?'

'কিছুই ভাবতে হবে না!' রানার উপরই চটে উঠল স্বাতী। 'এত দুর্ভোগের পরও তেজ দেখেছি এতটুকু কমেনি।'

'ভুল,' বলল রানা। 'এতই ভেঙে পড়েছি যে কান্নাকাটি করছিলাম এতক্ষণ। তবে এখন একটু আরাম বোধ করছি তা অস্বীকার করব না।'

'আরাম বোধ করছেন? এই জঘন্য অবস্থায় থেকেও?'

বলল রানা, 'হ্যাঁ—এই কথা ভেবে যে একজন অন্তত আছে যে আমার কষ্টের কথা ভেবে ঘুমুতে পারছে না।'

চমকে উঠল স্বাতী, প্রতিবাদ করল সাথে সাথে, 'মিথ্যে কথা! কে বলল আপনার জন্যে আমি ঘুমুতে পারছি না? জাস্ট মানবতার খাতিরে জানতে এসেছি...'

'ওই হলো।'

'মানে?' ফোঁস করে উঠল স্বাতী সাপের মত।

'মানে যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তেপ্পান্ন আর কি,' বলল রানা। 'বাঙালী মেয়েদের শ্রদ্ধা করি আমি, আরও এক ডিগ্রি বাড়ল সেটা। কিন্তু সে যাক। জাস্ট মানবতার খাতিরে দেখতে এসেছ—তারপর?'

চুপ করে রইল স্বাতী।

'মার্শালের ভয়ে গলা শুকিয়ে থাকলে কেটে পড়াই বরং ভাল।'

'মার্শালের কথা আমার এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে,' বলল স্বাতী। 'আপনার জন্যে কিছু করবার থাকলে বলুন আমাকে।' রানার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। দেখেও দেখল না স্বাতী। 'কিচেনে কিছু খাবার আছে এখনও।'

'দু'একদিন অভুক্ত থাকলে মানুষ মরে না। ধন্যবাদ!' গম্ভীর হলো রানা।

'ড্রিঙ্ক?'

খসে পড়ল গাম্ভীর্যের খোলস। 'কী অদ্ভুত শব্দ! মধুবর্ষণ করল যেন কানে।' বলল রানা। 'কিন্তু খাব কিভাবে? তুমি যদি যত্ন করে চামচ দিয়ে গলায় ঢেলে দিতে রাজি হও...'

'যত্ন শব্দটা প্রত্যাহার করুন।'

'কি?' ঠিক যেন বুঝতে পারল না রানা স্বাতীর কথা।

'লাই পেয়ে মাথায় উঠুন তা আমি চাই না,' বলল স্বাতী।

'সেক্ষেত্রে যত্ন না করে বাঁধনটা খুলে দেবে কি আমার?'

'তারপর হাত খোলা পেয়ে…!'

'তোমার অমন সুন্দর গলাটা পেঁচিয়ে ধরার লোভ সামলাতে পারব না, এই ভাবছ? বিশ্বাস করো, সে রকম ইচ্ছা আজ আমার নেই। হাত দুটো দেখছ তুমি আমার?' কোনমতে পিঠ ঘুরিয়ে হাত দুটো দেখাল রানা স্বাতীকে। নীল হয়ে গেছে বাঁধনের চারদিকের চামড়া। বেয়াড়াভাবে কেটে বসে গেছে মাংসের সাথে রশি। 'তোমার সাথে আমি একমত, মার্শাল বড় নিষ্ঠুর লোক।'

হাত দুটোর অবস্থা দেখে রাগে লাল হয়ে উঠেছে স্বাতীর মুখ। কিন্তু রানার আচরণে বিস্ময়ের মাত্রাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে তার। 'আপনাকে কিন্তু সাধারণ চোরটোর মনে হয় না।'

'নইও তো সাধারণ!' বলল রানা, 'শোনোনি মার্শাল কি বলেছে আমার সম্পর্কে? খুনী, ডাকাত…'

'থামুন,' বলল স্বাতী। 'বড্ড বেশি কথা বলেন আপনি। শুনুন, খুলে দিতে পারি রশি, কিন্তু আগে প্রতিজ্ঞা করুন যে…'

পাঁচ সেকেন্ড মাথা নিচু করে রাখল রানা। তারপর মাথা উঁচু করে বলল, 'অনেক কষ্টে অট্টহাসিটা দমন করলাম। এরপরও যদি হাস্যকর কোন কথা বলো, চেপে রাখতে না পেরে হেসে উঠব, সে-হাসির শব্দে মার্শাল পিস্তল উঁচিয়ে ছুটে এলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

'যাচ্ছে তাই!' বিরক্তির সাথে বলল স্বাতী। 'মার্শালের ভয় কত দেখাবেন আর?' এগিয়ে এল সে।

এক মিনিটের মধ্যে বাঁধনমুক্ত করল রানাকে স্বাতী। হাত দুটোর শিরায় রক্ত চলাচল চালু করার জন্যে ম্যাসেজ করতে হলো ঝাড়া চার মিনিট। এক গ্লাস হুইস্কি এনে দিল ওকে স্বাতী। এক চুমুকে গ্লাসের অর্ধেকটা খালি করে ফেলল ও। টেবিলে সেটা নামিয়ে রেখে পায়ের বাঁধন খুলতে শুরু করল নিজেই।

লাফ দিয়ে সরে গেল স্বাতী। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দিশেহারার মত চাইল এদিক ওদিক। তারপর কি মনে করে সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। প্রায় তখুনি ফিরে এল সে। তখনও পায়ের বাঁধন খোলা হয়নি রানার। পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলতেই ও দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে স্বাতী, হাতে উদ্যত পিস্তল।

হাসি হাসি মুখটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার। 'কষ্ট করে ওটা আবার আনতে যাবার কি দরকার ছিল?'

'কর্নেল বলেছেন ইন্ডিয়ানরা যদি কখনও আমাকে ধরতে আসে…!' হঠাৎ থামল স্বাতী, চেঁচিয়ে উঠল রাগে, 'তুমি একটা মিথ্যেবাদী! প্রতিজ্ঞা করোনি আমার কাছে যে…?'

‘গুণ্ডা-বদমাশদের বিশ্বাস করার মত বোকামি কেউ করে?’ পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গিয়ে একটা হাত ধরল স্বাতীর। টেনে এনে দাঁড় করাল একটা চেয়ারের কাছে। দু'হাত স্বাতীর কাঁধে রেখে চাপ দিয়ে বসাল তাকে চেয়ারটায়। নিজেও বসল মুখোমুখি একটা চেয়ারে।

‘শান্ত হও। পালাব না আমি। পা দুটোকে একটু আরাম দিচ্ছি শুধু। হাঁটুটা দেখতে চাও আমার?’

‘না!’ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল স্বাতী।

‘সত্যি কথা বলতে কি, আমিও দেখাতে চাই না,’ বলল রানা। ‘তোমার মা কি বেঁচে আছেন এখনও?’

‘কি বললে?’ চমকে গেল স্বাতী।

‘সব কথা জেনে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছি। বেঁচে আছেন তিনি?’

নিস্পৃহ কণ্ঠে স্বাতী জবাব দিল, ‘আছেন।’

‘কিন্তু খুব সুস্থ নেই বোধ হয়।’

‘মানে? তুমি জানলে কেমন করে? তাছাড়া…’

‘ও কিছু না, সন্দেহটা মিটিয়ে নিতে চাইছি শুধু।’

‘সন্দেহ?’

‘হবে না? তোমার মায়ের অবস্থা ভাল হলে কি তিনিও তোমার সাথে আসতেন না? তিনি নেই দেখেই বুঝতে পেরেছি, তাঁর অবস্থাও ভাল নয়। ভুল করেছ, স্বাতী। বাবাকে দেখতে যাবার চেয়ে তোমার উচিত ছিল মায়ের পাশে থাকা। আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে কলেরা আর পিউতী, দুই বিপদের মধ্যে মাথা গলাবার পারমিশন দিল কে তোমাকে? কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে। ভাল কথা, কর্নেল, গভর্নর, মেজর জোনাথন—এদের সবাইকে তুমি ভালভাবে চেনো?’

‘অবশ্যই।’

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করল রানা। টেবিলে সেটা নামিয়ে রেখে রশি তুলে নিয়ে আবার পায়ে বাঁধতে শুরু করল আগের মত করে। ‘চিনলেই ভাল। আর কিছু জানতে চাই না আমি।’ উঠে দাঁড়াল রানা। রশির আরেক টুকরো ধরিয়ে দিল স্বাতীর হাতে। হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে একটার উপর রাখল আরেকটা কোনাকুনিভাবে। ‘আরও একটু নারীত্বের পরিচয় দাও এবার। ঢিলে করে বেঁধো আগের চেয়ে।’

বাঁধতে বাঁধতে মৃদু কণ্ঠে স্বাতী বলল, ‘নিজের ব্যাপার ছাড়াও অন্য কারও ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ, ভাবতে আশ্চর্য লাগছে!’

‘নেই কাজ তো খৈ ভাজ!’ বলল রানা, ‘একটু গবেষণা করার চেষ্টা করছিলাম আর কি মেঝেতে পড়ে পড়ে।’ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল রানা বাঁধা কব্জি দুটো। দেখতে পেল না।

শেষ গেরোটা দিয়ে রানার সামনে চলে এল স্বাতী। বসতে সাহায্য করল ওকে আগের জায়গায়। তারপর ধরে ধরে শুইয়ে দিল। চলে গেল একটা কথাও না বলে।

নিজের কামরার দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাঙ্কের উপর উঠে বসল স্বাতী। চোখ বন্ধ করে বসেই রইল। কেমন লোকটা! আজ রাতে আর ঘুম আসবে না ওর।

রোগা পটকা শরীর, কালি আর তেলে একাকার, অস্বাভাবিক লম্বা দুটো পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নাকের ডগা চুলকাচ্ছে ফায়ারম্যান চার্লস জ্যাকসন। এই হিমশীতল ঠাণ্ডাতেও দরদর করে ঘামছে। সারাক্ষণ ফায়ার-বক্সের খোলা মুখটার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রাক্ষুসে ইঞ্জিনটার পেটে অবিরত কাঠ ঠাসতে ঠাসতে শীতকে ভাগিয়েছে সে গায়ের ত্রিসীমানা থেকে। শেষবারের মত আরও কিছু কাঠ ভরে দিল সে উজ্জ্বল লাল কয়লাগুলোর ওপর। তারপর ঝটকা মেরে ফায়ার-বক্সের মুখটা বন্ধ করে দিল। লাল আভার অনুপস্থিতিতে অন্ধকার হয়ে গেল ইঞ্জিনরুম। একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে মুখ মুছল জ্যাকসন।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস্টোফার। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। রুমটা অন্ধকার হয়ে যেতে ঘুরে দাঁড়াল সে, এগিয়ে এল জ্যাকসনের কাছে। শব্দটা ভেসে এল হঠাৎ এই সময়। প্রচণ্ড একটা যান্ত্রিক খটখটানি স্তব্ধ করে দিল ইঞ্জিনের হিস হিসকে। শব্দের উৎসের উদ্দেশেই সম্ভবত, খিস্তি করল ক্রিস্টোফার।

জ্যাকসন উত্তেজিত। 'কি হয়েছে?'

উত্তর দেবার সময় নেই তখন ক্রিস্টোফারের। ব্রেক হ্যান্ডেলটার উপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। লাইনের ওপর থেমে যাওয়া চাকার বিকট ঘষটানি আর বাম্পারে বাম্পারে বাড়ি লাগার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, সব মিলিয়ে আকাশ ভেঙে পড়তে শুরু করল যেন মাথার উপর।

প্রথমে তীব্র ঝাঁকুনি খেল, পরপর কয়েকবার ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল থরথর করে গোটা ট্রেনটা। যে যেখানে ছিল, পড়ে গেল ওলট-পালট খেয়ে। ঘুম ভেঙে যাবার পর হাতের কাছে যে যা পেল ধরে ফেলে তাল সামলাল কোনমতে।

'হতচ্ছাড়া স্টীম রেগুলেটারটা গোলমাল শুরু করেছ আবার,' মিনমিনে সুরে বলল ক্রিস্টোফার, 'যদ্দূর মনে হচ্ছে, নাটগুলো ঢিলে হয়ে খুলে গেছে। রিচার্ডকে বেল বাজিয়ে বলে দাও ব্রেকটা শক্ত করে চেপে ধরে থাকতে।' টিমটিমে লণ্ঠনটা হুক থেকে নামিয়ে নষ্ট রেগুলেটারটায় মন দিল সে। 'ফায়ার-বক্সের মুখটা খুলে দাও। লণ্ঠনের আলোর চেয়ে কয়লার আলোয় সব দেখা যাবে ভাল করে।'

মুখটা খুলে দিয়ে বাইরে তাকাল জ্যাকসন উঁকি দিয়ে। 'সবাই আসছে!' কথাটা বলেই সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল সে।

'মরুক গে!' বিড়বিড় করে বলল ক্রিস্টোফার।

লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে নামল একটা ছায়ামূর্তি। এদিক ওদিক দেখল সে। এই ফাঁকে পরে নিল মাথায় মাঙ্কি ক্যাপটা। ইঞ্জিনরুমের দিকে নয়, লোকটা

তীরবেগে ছুটল টেলিগ্রাফের লাইন ধরে নিকটবর্তী পোস্টটার দিকে।

অত্যন্ত গাঢ় ঘুম কর্নেলের। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিলেন তিনি মেঝের উপর। ভয়ানক ব্যথা পেয়েছেন কোমরে। কোনমতে ইঞ্জিন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে টেনে তুললেন নিজেকে পাদানির উপর।

'ক্রিস্টোফার!' বজ্রকণ্ঠে হাঁক ছাড়লেন তিনি।

'ইয়েস, স্যার! সরি, স্যার।'

অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল ক্রিস্টোফার। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে তার।

'এত রাতে তামাশা পেয়েছ নাকি?' গমগম করে উঠল কর্নেলের ভরাট গলা, 'এমন ভাবে কেউ ব্রেক কষে?'

'দুঃখিত, স্যার,' বলল ক্রিস্টোফার, 'কন্ট্রোল ফেলিওর, রিটেইনিং নাটগুলো...'

'চুলোয় যাক তোমার রিটেইনিং নাট!' উত্তেজনার আধিক্যে সিধে হয়ে দাঁড়াতে গেলেন তিনি, কোমরে ব্যথাটায় টান পড়তে ককিয়ে উঠলেন, বাঁকা হয়ে গেলেন আবার একটু সামনের দিকে। 'কতক্ষণ লাগবে ঠিক হতে?'

'মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিন আমাকে, স্যার।'

ওদিকে মাঙ্কি ক্যাপ পরা লোকটা টেলিগ্রাফ পোস্টের কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার। ব্রেকভ্যানের কাছ থেকে ষাট গজের মত দূরে চলে এসেছে সে। নিরাপদ দূরত্বই বলা যায়। সন্তুষ্টির ছাপ ফুটল তার চোখেমুখে। ওভারকোটের পকেট থেকে বের করে আনল একটা চামড়ার ব্যাগ। বানরের মত তর তর করে উঠে গেল থামটার শেষ মাথায়। ব্যাগ থেকে দ্রুত তার কাটার প্লায়ার্সটা বের করে কচ্ করে কেটে দিল টেলিগ্রাফের তার। তারটা মাটিতে ঝুলে পড়তেই নেমে পড়ল সে নিচে। ছুটল ট্রেনের দিকে।

ইঞ্জিনরুমে কাজ শেষ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল ক্রিস্টোফারও।

'হয়েছে?' হুইসেল বাজার শব্দ হলো কর্নেলের প্রশ্নে।

'হয়েছে।' মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টোফার।

'বাকি রাতটুকু নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব তো?' কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় গ্যারান্টি দাবি করছেন কর্নেল। 'নাটবল্টুগুলো ফিচলেমি শুরু করবে না তো আবার তোমার লাই পেয়ে?'

ক্রিস্টোফার ঢোক গিলল। তাকাতে সাহস পেল না কর্নেলের চোখের দিকে। বলল, 'আর কোন অসুবিধে হবে না, স্যার, কথা দিচ্ছি আমি। স্যার, দয়া করে যদি আগামীকাল কৈফিয়ৎ তলব না করেন...'

'সকালে বিবেচনা করা যাবে।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে কোনমতে পাদানি থেকে নিচে নামলেন কর্নেল। কোমরের ব্যথা সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তাঁর। ধীর ভঙ্গিতে ফিরে এলেন নিজের কামরায়।

ট্রেন চলতে শুরু করল আবার।

মাঙ্কি ক্যাপ পরা লোকটা ট্রেনের পাশ ধরে দৌড়ুচ্ছে তখনও। একটা লাফ দিয়ে চট্ করে উঠে পড়ল সে তৃতীয় কোচটার পিছনের অংশে।

তিন

ভোর হতে দেখা গেল আগের দিনের আবছা পাহাড়ের চূড়াগুলো কাছে এসে পড়েছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কয়েক মাইল পশ্চিমে তুষার পড়ছে হু হু করে। পাইন বন ছুঁয়ে আসা ভোরের বাতাসে তাজা হয়ে যাচ্ছে শরীর মন। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে নদীর ধারের ছোট্ট ছোট্ট খাঁড়িগুলোকে।

স্টুয়ার্ড স্টোভ নিয়ে ব্যস্ত। প্যাসেজ-ওয়ে পেরিয়ে কামরায় ঢুকলেন কর্নেল। কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা রানার দিকে খেয়ালই করলেন না। কোমরের ব্যথাটা বিশ্রাম পেয়ে সেরে গেছে, মনেই নেই তাঁর ব্যথা পেয়েছিলেন।

'ব্রেকফাস্ট রেডি, স্যার।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালেন শার্সির ভিতর দিয়ে। 'পরে। মনে হচ্ছে যখন-তখন তুষার পড়া শুরু হবে এদিকটাতেও। খেতে বসার আগে রিজ সিটি আর ফোর্ট হাম্বোল্ডের সাথে যোগাযোগ করতে চাই আমি। টেলিগ্রাফিস্ট ফারগুসনকে খবর দাও, যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানে চলে আসুক।'

বেরোতে গিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াতে হলো স্টুয়ার্ড হেনরীকে। কামরায় প্রবেশ করছে গভর্নর, জোনাথন আর মার্শাল ডেভিড।

মার্শাল থমকে দাঁড়াল রানার কাছে। জুতোর ডগা দিয়ে ওর পাঁজরে মৃদু খোঁচা মারল। নড়ল না রানা। উবু হয়ে বসল মার্শাল। নিঃশব্দে খুলে দিতে শুরু করল রশির বাঁধন।

'গুড মর্নিং,' কর্নেল বললেন। 'টেলিগ্রাফিস্ট আসছে, যোগাযোগ হবে এখুনি ফোর্ট হাম্বোল্ড আর রিজ সিটির সাথে।'

'ট্রেন থামাতে হবে, তাই না, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

দরজা খুলে কামরার প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল জোনাথন। পেছনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মাথার উপরের চেনটা ধরে টেনে দিল। দু'সেকেন্ড পরই জানালা দিয়ে মাথা বের করে পিছন দিকে তাকাল ক্রিস্টোফার। দেখল, ডান হাতটা উপরে-নিচে দোলাচ্ছে জোনাথন। মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিল ক্রিস্টোফার, পরমুহূর্তে শ্লথ হতে শুরু করল গতি।

'বাপরে, কী হাড় কাঁপানো শীত বাইরে!' কামরায় ঢুকে বলল জোনাথন।

কর্নেল তাকিয়ে আছেন জানালা দিয়ে বাইরে। সকৌতুকে বললেন, 'শীতের এখন দেখেছ কি, এখনও তো ঠিকমত শুরুই হয়নি।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বাঁধন মুক্ত রানাকে দেখতে পেলেন, হাত দুটো ম্যাসেজ করছে। '[illegible]

উপস্থিতি এখানে বড় বেখাপ্পা, মার্শাল,' বললেন কর্নেল, 'সার্জেন্ট নিকোলাসের ঘাড়ে ওকে তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হতে পারেন আপনি ইচ্ছে করলেই।'

মার্শাল গম্ভীর হলো। 'কি জানেন, স্যার, এই লোকটাকে আমি এক হাজার পিউতীর চেয়ে বেশি ভয় করছি। বারুদ, কেরোসিন আর ম্যাচ এই তিনটেতে ওর পি.এইচ. ডি ডিগ্রী আছে, সেজন্যেই ভয়। তিনটের কোনটারই অভাব নেই এই ট্রেনে।'

নক করে দু'জন সিপাই ঢুকল কামরার ভিতর। পিছনে টেলিগ্রাফিস্ট ফারগুসনের হাতে একটা কোলাপসিবল টেবিল, এক কয়েল তার আর ছোট একটা বাক্স। ওয়্যারিঙের যন্ত্রপাতি আছে বাক্সটায়। সকলের পিছনে ওর সহকারী, অল্পবয়েসী ব্রাউনের হাতে ট্রান্সমিটারটা।

কর্নেল বললেন, 'অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল, ফারগুসন।' দু'মিনিট লাগল ফারগুসনের তৈরি হতে। একটা আর্ম চেয়ারের হাতলের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে গলিয়ে দিল সে তারের একটা মাথা জানালার ফাঁক দিয়ে। কর্নেল তাকালেন কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরে।

ব্রাউন উঠে গেল একটা টেলিগ্রাফ পোলের মাথায়। ট্রান্সমিটারের তার লাইনের তারের সাথে জোড়া লাগিয়ে হাত নাড়ল সে।

কর্নেল বললেন, 'ঠিক আছে, আগে ফোর্টের সাথে যোগাযোগ করো।'

সিগন্যাল বোতামটায় তিনবার চাপ দিল ফারগুসন। সাথে সাথেই এয়ারফোনের মাধ্যমে ভেসে এল মোর্সের সাঙ্কেতিক শব্দ। এয়ারফোনটা একটু সরিয়ে কর্নেলের দিকে তাকাল ফারগুসন, 'এক মিনিট, স্যার। কর্নেল জ্যাকসনকে ডাকতে গেছে ওরা।'

কামরায় ঢুকল রেভারেন্ডের সাথে স্বাতী। ম্লান, নির্জীব দেখাচ্ছে রেভারেন্ডকে। রাতে ভাল ঘুমুতে পারেনি বোঝা যায়।

ঢুকেই রানাকে দেখে নিল স্বাতী। মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। চোখ ফিরিয়ে নিল প্রায় তখুনি, ফিরল কর্নেলের দিকে।

'ফোর্ট হাম্বোল্ডকে পেয়ে গেছি আমরা, মা,' কর্নেল বললেন, 'এক্ষুণি ওখানকার শেষ খবর পেয়ে যাচ্ছি আমরা।'

মোর্স সঙ্কেত আসতে শুরু করেছে আবার। দ্রুত হাতে মেসেজটা লিখে নিচ্ছে ফারগুসন প্যাডের পৃষ্ঠায়। লেখায় পৃষ্ঠাটা ভরে যেতে টান মেরে পাতাটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল সে কর্নেলের দিকে।

ফোর্ট হাম্বোল্ড।

টেলিগ্রাফরুমের ভিতর আটজন লোক। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। চামড়ায় বাঁধানো একটা মেহগনি টেবিলের উপর নোংরা বুট পরা পা তুলে দিয়ে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে ভয়ঙ্কর দর্শন এক লোক। অস্বাভাবিক দীর্ঘ শরীর, চওড়া কাঁধ, শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। জ্যাকেটের উপর দিয়ে কোনাকুনি চলে গেছে দুটো রিভলভারের খাপের বেল্ট। খাড়া নাকের নিচে

উঁচু চোয়াল ঘন দাড়িতে ঢাকা। আধহাত লম্বা একটা কালো রঙের চুরুট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রেখেছে। দুর্ধর্ষ খুনী সিম্পসনের চেহারাটা যেমন ভয়ঙ্কর, স্বভাবটাও তেমনি উগ্র।

সিম্পসনের সামনের চেয়ারে ইউ.এস.সি-র পোশাক পরা কর্নেল জ্যাকসন। কুঁকড়ে আছেন ভদ্রলোক। ম্লান মুখ, চোখ নামিয়ে চেয়ে আছেন মেঝের দিকে।

লাল মুখটা হাসিতে জ্বলজ্বল করছে সিম্পসনের। কর্নেলকে গ্রাহ্যই করছে না সে। ট্রান্সমিটারের সামনে বসা লোকটা একজন সিপাই। তার ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ইউ.এস. ক্যাভালরির ইউনিফর্ম পরা আর এক লোক।

সিম্পসন বলল, 'ওহে কার্টার, দাও মেসেজটা। টেলিগ্রাফিস্টকে যা পাঠাতে বলেছিলাম ঠিক তাই পাঠিয়েছে কিনা দেখি পরখ করে।'

সিপাইয়ের ঘাড়ের কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল কার্টার নাক চুলকাতে চুলকাতে। মেসেজটা সিম্পসনের হাতে ধরিয়ে দিল সে। পুরো মেসেজটায় নিঃশব্দে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুচকি হাসল সিম্পসন। তাকাল কর্নেল জ্যাকসনের দিকে।

'পড়ছি, শুনুন!' হুকুমের সুরে বলল সিম্পসন। মেসেজটা পড়তে শুরু করল সে উচ্চকণ্ঠে। 'আরও তিনজন আক্রান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু মারা যায়নি আর একজনও। আশা করছি, রোগটাকে দমন করা গেছে। আপনাদের পৌঁছানোর অপেক্ষায় আছি।' অপারেটরের দিকে তাকাল সে। 'বুদ্ধিমান লোক তুমি হে, তাই অতি চালাকির চেষ্টা করোনি—গুড, ভেরি গুড!'

হুবহু ওই একই মেসেজ পড়ে পাতাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে কর্নেল রুজভেল্ট বললেন, 'খবর শুভ। কতক্ষণ লাগবে আর আমাদের পৌঁছুতে?'

জোনাথন পাশ থেকে বলল, 'ইঞ্জিনের যা অবস্থা, স্যার, ছত্রিশ ঘণ্টার আগে পৌঁছুতে পারব বলে মনে হয় না। ক্রিস্টোফারের সাথে আলোচনা করলে সঠিক হিসাবটা জানা যাবে।'

কর্নেল ছড়ি ঘুরিয়ে নির্দেশ দিলেন ফারগুসনকে, 'ওদেরকে বলে দাও, খুব একটা দেরি হবে না…'

'আমার বাবা…!' স্বাতী কর্নেলের দিকে চোখ রেখে এক পা এগিয়ে এল।

'ঠিক, মা!' কর্নেল একটা হাত ধরল স্বাতীর। ফারগুসন চেয়ে আছে তখনও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে। কর্নেল তার দিকে চোখ তুলে মাথা দোলালেন।

ক'মুহূর্ত পর হেড ফোনটা নামিয়ে রাখল ফারগুসন। 'কাল বিকেলের মধ্যে আশা করছে ওরা আমাদের। কর্নেল জ্যাকসন এবং তাঁর বন্ধু আশরাফ চৌধুরী দিব্যি আছেন।'

কর্নেল চাপ দিল স্বাতীর হাতটায়। 'কই, হাসছ না যে?'

গালে টোল পড়ল স্বাতীর।

মার্শাল বলল, 'ফারগুসন, কর্নেল জ্যাকসনকে আমার কথা বলো। বলো, আমিও যাচ্ছি এই ট্রেনে। সিম্পসনকে এবার জেলের ঘানি টানাবই।'

*

ফোর্ট হাম্বোল্ডের টেলিগ্রাফরুমে হাহ্ হাহ্ করে হাসছে সিম্পসন। হেঁট মাথাটা উঁচু করার লক্ষণ নেই কর্নেল জ্যাকসনের। হাসি থামিয়ে সিম্পসন কালো চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। চুরুটের ধোঁয়া চোখে লাগতে ডান চোখটা বন্ধ করে মাথা সরিয়ে নিল সে পিছন দিকে। লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে কর্নেলের মুঠোর ভিতর গুঁজে দিল সে মেসেজটা। 'ওরা আসছে আমাকে জেলের ঘানি টানাতে, কর্নেল! ধরে নিন খতম হয়ে গেছি আমি। হাহ-হাহ-হাহ-হাহ্…!'

মেসেজটা পড়লেন কর্নেল জ্যাকসন। কোন প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। টিপ টিপ করে বার কয়েক লাফ মারল বাঁ কপালের পাশের শিরাটা। স্লিপ ধরা আঙুল দুটো ফাঁক হলো একটু। খসে পড়ল স্লিপটা।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল সিম্পসন। কটমট করে তাকাল কর্নেলের দিকে। পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল তার সর্বশরীর, গলা ছেড়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

দোরগোড়ায় চারজন রাইফেলধারীর ঠোঁটে শান দেয়া ধারাল হাসি ফুটল। দু'জন শ্বেতাঙ্গ, দু'জন ইন্ডিয়ান। রাইফেল চারটে কর্নেল জ্যাকসনের বুকের দিকে তাক করা।

সিম্পসন হাসি থামিয়ে চুরুটে টান মারল কষে। কথা বলার সময় ধোঁয়া বেরুতে লাগল মুখের ভিতর থেকে, পেটের ভিতর আগুন ধরে গেছে যেন তার। 'ডাইনিংরুমে নিয়ে যাও তো হে মাননীয় কর্নেলকে। আর কোন কাজ নেই যখন, পেট পুজো করুক অন্তত!'

পরমুহূর্তে অশ্রাব্য হাসিতে খান খান হয়ে ফেটে পড়ল সিম্পসন।

'রিজ সিটির সাথে যোগাযোগ করো,' ছড়িটা বগলে চেপে ধরে বাঁ হাত উল্টো করে কোমরে রেখে চাপ দিয়ে মট মট করে আঙুল মটকালেন কর্নেল। 'ক্যাপ্টেন ওকল্যান্ড আর লেফটেন্যান্ট নিউয়েলের কোন খবর আছে কিনা দেখো।'

'ডিপোতে, স্যার?' জানতে চাইল ফারগুসন। 'স্টেশন মাস্টারের কাছে? কে যেন বলছিল রিজ সিটিতে এখন আর কোন টেলিগ্রাফ অফিস নেই। একজন মাত্র টেলিগ্রাফিস্ট যাও ছিল চলে গেছে সে বিগ বোন্জানায়।'

'ডাকো স্টেশন-মাস্টারকেই,' কোমরের কাছটা এক হাতে চেপে ধরে বললেন কর্নেল রুজভেল্ট।

বিড়বিড় করে ফারগুসন বলল, 'লোকটা নাকি হোটেলের পিছনের একটা কামরায় রাতদিন মদ খেয়ে পড়ে থাকে…'

'দেখো চেষ্টা করে।'

বারকয়েক কল সাইন দিয়ে দেখল ফারগুসন। ফিরে চাইল কর্নেলের দিকে। 'ওদেরকে জাগাতে পারছি না, স্যার।'

'সুইচটা হয়তো ইমপেরিয়াল হোটেলে নিয়ে গিয়ে রেখেছে।'

মেজরের কথায় কান না দিয়ে কর্নেল বললেন, 'আবার চেষ্টা করো।' শক্ত হয়ে গেছে তাঁর মুখ। কোমর ছেড়ে দিয়ে বগলে চেপে ধরা ছড়িটার আগা চেপে ধরেছেন শক্ত করে।

আবার চেষ্টা করল ফারগুসন। এয়ারফোন নির্জীব, নিঃসাড়। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। কর্নেলের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে উঠল।

'কোন সাড়া নেই। না?'

ঢোক গিলল ফারগুসন। হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। 'স্যার···স্যার, লাইনটাই অচল মনে হচ্ছে, কাজ করছে না! ডেড। একটা রিলে রিপিটার বরবাদ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

'কিভাবে?' ব্যাখ্যা দাবি করে বসলেন কর্নেল। 'বরফ পড়েনি। ঝড়ো হাওয়াও ছিল না। তাছাড়া, গতকাল রিজ সিটির সাথে যোগাযোগ করার সময় কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি।' বগল থেকে ছড়ি নামিয়ে হাতের তালুতে আঘাত করলেন সশব্দে। 'ফারগুসন, লাইন চাই আমি। আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করে যাও তুমি।' চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালেন, সামনেই দেখতে পেলেন রানাকে। তিন সেকেন্ড স্থির হয়ে রইলেন রানার দিকে তাকিয়ে, তারপর মুখ তুললেন মার্শালের দিকে। 'কি যেন নাম ছোকরার? মোসটন না কি যেন, ও কি আমাদের সাথে খাবে?'

বাঁধন মুক্ত করে দেয়া হয়েছে রানার। এতক্ষণ একপাশে বসে ছিল বিরস বদনে, ওর প্রসঙ্গ উঠতেই মুখ খুলল।

'রানা, মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'মোসটন-ফোসটন কিছু না, মা-সু-দ রা-না।'

'শাটাপ!' ধমক মেরেই তাকাল মার্শাল কর্নেলের দিকে। 'ওকে না খাইয়ে রাখতে পারলেই খুশি হতাম আমি। তবে আপনি যখন বলছেন, ঠিক আছে, আমার টেবিলেই বসুক। অবশ্য ডাক্তার আর রেভারেন্ডের যদি আপত্তি না থাকে।' এদিক ওদিক তাকাল সে। 'ডাক্তারের পাত্তা নেই দেখছি এখনও?' এক পা এগিয়ে রানার চুল ধরে টান মারল, 'চলো, ওঠো! কিছু মুখে দিয়ে দয়া করে উদ্ধার করো আমাদের।'

রানা শুধু চোখ তুলে তাকাল একবার। সাথে সাথেই চুল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল মার্শাল দুই পা। ডান হাতটা চলে গেছে পিস্তলের বাঁটে।

মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'দয়া করে মনে রাখবেন, অযথা ঝামেলা আমি পছন্দ করি না।'

জবাব না দিয়ে কর্নেলের পিছন পিছন বেরিয়ে গেল মার্শাল দ্রুতপায়ে।

দরজার কাছে তখন স্বাতী, বেরিয়ে যাচ্ছে, ওর পিছনে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে মৃদু চাপড় দিল রানা ওর কাঁধে। ঝট করে ফিরে তাকাল স্বাতী। মুহূর্তে রাগে লাল হয়ে উঠেছে মুখ। কিছু বলতে যাবে, কিন্তু তার আগেই চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'ডাক্তার কোথায়, জানো?' থতমত খেয়ে গেল স্বাতী রানার প্রশ্নের ধরন দেখে।

মৃদু কণ্ঠে বলল, 'না তো!'

'ঠিক আছে!' বলেই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রানা।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে সাতজন বসল আগের রাতের মতই, ব্যতিক্রম শুধু এই যে ডাক্তারের জায়গায় বসেছে রানা। ওর পাশেই ভাল মানুষ রেভারেন্ড, উসখুস করছে সে থেকে থেকে, বারবার তাকাচ্ছে রানার দিকে। লক্ষই করল না তাকে রানা। তাকে বলে নয়, কারও দিকেই তাকাল না ও। একাগ্র মনোযোগ ওর খাবার প্লেটের দিকে।

খাওয়া শেষ করে পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে পকেট থেকে টোবাকো পাউচ, পাইপ আর গ্যাস লাইটার বের করে কোলের উপর রাখলেন কর্নেল। গা ছেড়ে দিলেন চেয়ারের পিঠের উপর। ধীরে সুস্থে পাইপে টোবাকো ভরে অগ্নিসংযোগ করলেন তাতে। 'বহুত কাজ আছে বলে কাল রাতে ডিনার খেয়েই কেটে পড়ল ডাক্তার। কত বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে, দেখো! হেনরী, দেখে এসো তো বাবা, ঘুম তার ভাঙল কিনা।' দেহটা চেয়ারের ভিতরই প্রায় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে ফেলে হাঁক ছাড়লেন, 'ফারগুসন!'

'পাচ্ছি না, স্যার। সম্পূর্ণ ডেড।'

চেয়ারের হাতলে অন্যমনস্কভাবে আঙুল বাজালেন কয়েক সেকেন্ড কর্নেল, মনস্থির করে নিয়ে বললেন, 'যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নাও তোমার।' ঘাড় ফেরালেন মেজরের দিকে। 'ওর কাজ শেষ হলেই রওনা দেব আমরা। ড্রাইভারকে বলো...।' দমকা বাতাসের মত ঢুকল ভিতরে হেনরী। 'হেনরী! কি ব্যাপার, হেনরী?' হুড়মুড় করে চেয়ার ছেড়ে মুহূর্তে তালগাছে রূপান্তরিত হলেন কর্নেল।

নিগ্রো হেনরীর আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই। চওড়া বুকটা হাপরের মত উঠছে নামছে তার। অজগরের মত শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। কোটর থেকে আধ ইঞ্চি বেরিয়ে এসেছে যেন চোখের মণি দুটো। 'মারা গেছেন, স্যার। মরে পড়ে আছেন নিজের কামরায়।'

দম আটকে গেল সকলের।

'কি বলছ? মারা গেছে? ডাক্তারের কথা বলছ তুমি, হেনরী?'

'ইয়েস, স্যার, বেঁচে নেই...।'

'অসম্ভব!' অস্ফুটে বলল গভর্নর।

'জেসাস, ওহ জেসাস!' রেভারেন্ড কালাহান তার স্বভাব অনুযায়ী দু'চোখ বন্ধ করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে উঠল।

'ভাল করে দেখেছ তুমি?' নিজেকে সামলে নিয়েছেন কর্নেল।

মাথা ঝাঁকাল হেনরী, শিউরে উঠল শরীরটা একবার। জানালার দিকে তাকিয়ে বরফ দেখল সম্ভবত। 'ঠাণ্ডা বরফের মত, স্যার। গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি। যেন ঘুমাচ্ছেন।'

'নো...নো...।' পায়চারি করছেন কর্নেল, মাথা দোলাচ্ছেন এদিক ওদিক। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মেনে নিতে পারছেন না। প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করছেন বুকে।

রেভারেন্ড এখন আর প্রার্থনা করছে না। বিচলিত কর্নেলের পিছু পিছু ব্যাকুল ভঙ্গিতে কয়েক পা এগোল সে। সান্ত্বনা দিতে চায়। ধমক খাবার

সম্ভাবনাটা মনে উঁকি দিতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, অপ্রতিভ ভাবে তাকাল সবার দিকে। সবাই নির্বাক, হতচকিত। গম্ভীর, অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে শুধু একজনকে। দ্রুত তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রেভারেন্ড। 'মহান পিতা যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। মার্শাল, আপনি বিশ্বাসী। আপনি বাস্তববাদী। এদেরকে প্রবোধ দেবার দায়িত্ব তাই আপনারই...।'

'আহ্ থামুন,' চাপা কণ্ঠে ধমকে উঠল মার্শাল।

কামরায় ঢুকল মেজর জোনাথন। কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে লক্ষ করেনি কেউ। তাকে দেখে সেদিকে এগোল রেভারেন্ড। কর্নেলকে নাটকীয় ভঙ্গিতে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াতে দেখে আবার থমকে গেল সে।

মেজরের মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছেন কর্নেল।

'ঘুমের ভেতরেই বোধ হয় মারা গেছে, স্যার!' বলল মেজর। 'হার্ট অ্যাটাকের মত মনে হচ্ছে। মুখের চেহারা দেখে বোঝা যায়, টেরই পাননি ঘটনাটা।'

সকলের সমগ্র মনোযোগ নিজের দিকে টেনে নিল রানা। 'লাশটা একবার দেখতে পারি আমি?' ওর মুখের কথাগুলো যেন কামরার ভিতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে আরম্ভ করল।

'তুমি?' কর্নেল টেবিল থেকে ছড়ি তুলে নিলেন, 'কিন্তু কেন?'

'মৃত্যুর আসল কারণ জানার জন্যে, ওয়ান্টেড নোটিশটা শুনেছেন সবাই, এককালে ডাক্তার ছিলাম।'

'হাতুড়ে, না ডিগ্রীপ্রাপ্ত?'

'হাতুড়েরা চাকরি পায় না, কর্নেল,' বলল রানা। 'আপনি জানেন, আমি চাকরি করতাম...'

'সে তো অনেকদিন আগের কথা।' বললেন বটে, কিন্তু গলাটা ইতোমধ্যেই নরম হয়ে এসেছে কর্নেলের।

মৃদু হেসে রানা বলল, 'একবার যে ডাক্তার, সব সময়েই সে ডাক্তার।'

কারও দিকে তাকালেন না কর্নেল। পায়চারি শুরু করলেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা তাঁর দিকে। এত কথা জেনে নিয়ে এমনভাবে এড়িয়ে গিয়ে নিরাশ করবেন কর্নেল, ভাবতে পারেনি ও।

রানার দিকে না তাকিয়ে, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি সুরে কর্নেল বললেন, 'যাও, যাও। নিয়ে যাও ওকে, হেনরী।'

ওরা কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার পরও কেউ নড়ল না বা কথা বলল না। হেনরী খানিকপর নতুন করে কফি নিয়ে এল। পায়চারি থামিয়ে চেয়ারে বসেছেন তখন কর্নেল। রানাকে ঢুকতে দেখেও কোনরকম প্রতিক্রিয়া হলো না তাঁর মধ্যে।

'হার্ট অ্যাটাক?' জানতে চাইল গভর্নর।

সরাসরি চেয়ে আছে রানা কামরায় ঢোকার পর থেকে মার্শালের দিকে। বলল, 'তাই মনে হয় বটে। কিন্তু আসলে তা নয়। ভাগ্য ভাল যে আইনের লোক আমাদের সাথে রয়েছে।'

'কথাটার তাৎপর্য?' রাগ, বিরক্তি, ব্যঙ্গ তিন রকম ভাবই প্রকাশ পেল কর্নেলের কণ্ঠে।

'কেউ খুন করেছে ডাক্তারকে। ওর সার্জিক্যাল কিট থেকে একটা প্রোব তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে রিবের ফাঁক দিয়ে, ঠিক হৃৎপিণ্ডের ভেতর। প্রায় তখুনি মারা গেছেন ডাক্তার।' একে একে সকলের দিকে একবার করে তাকাল রানা। 'ডাক্তারী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান বিশেষ করে অ্যানাটমি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে খুনীর। অ্যানাটমি কে জানে আপনাদের মধ্যে? যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করছি না, জানি, সে উত্তর দেবে না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কর্নেল ঝাড়া দশ সেকেন্ড, ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া, তারপর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।'

'ডাক্তারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে,' কর্নেলের চোখে চোখ রেখে বলল রানা। দৃষ্টিটা চট্ করে একবার ঘুরে এল মার্শাল ডেভিডের কোমরে ঝোলানো রিভলভার ছুঁয়ে। বলল, 'পিস্তল বা ওই ধরনের কিছু দিয়ে প্রথমে আঘাত করা হয়েছে মাথার পেছনে। কিন্তু জায়গাটা কালো হয়ে ফুলে ওঠার আগেই মৃত্যু হয়েছে তার। রিবের ঠিক নিচে ছোট্ট একটা লাল-নীল ফুটো, ইচ্ছে করলে আপনি নিজের চোখেই দেখে আসতে পারেন, কর্নেল। কোন সন্দেহ নেই—খুন করা হয়েছে ডাক্তারকে।'

হাতের টোবাকো পাইপটা গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারলেন কর্নেল নিজের পায়ের কাছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আওয়াজ করে দরজার দিকে এগোলেন তিনি। পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল সবাই, তারপর অনুসরণ করল কর্নেলকে। কামরার মধ্যে রইল শুধু রানা আর স্বাতী।

'মার্শালের কথাই ঠিক।' ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্বাতী রানাকে সামনের চেয়ারটায় বসতে দেখেই। 'খুনী নরকে গিয়েও তার খুন করার অভ্যাস ছাড়তে পারে না! কৌশলে আমাকে দিয়ে রশি খোলাখুলি করিয়ে নিয়েছিলে তুমি তাই। ঢিল করে বেঁধে রেখেছিলাম তোমারই পরামর্শে, আমি চলে যেতে…'

পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে সহাস্যে রানা বলল, 'রাইট, মিস প্রাইভেট ডিটেকটিভ! ডাক্তারের চাকরিটা দরকার ছিল কিনা, তাই মাঝরাতে পরিকল্পনাটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে খুন করি ওকে। সবাই ভাবুক মৃত্যুটা স্বাভাবিক, এই চেয়েছিলাম। তারপর সকালে মনে ইচ্ছে জাগে, ইলেকট্রিক চেয়ারে বসব। তাই সবাইকে জানালাম, ডাক্তারের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, এটা খুন। খুন করে ফিরে এসে নিজের হাত পিছমোড়া করে নিজেই আবার বাঁধি, যা পৃথিবীর আর কারও পক্ষে সম্ভব না হলেও, আমি সম্ভব বলে প্রমাণ করেছি।' হাত বাড়িয়ে স্বাতীর কব্জি ধরল রানা, ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সিধে হয়ে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও এক পা এগিয়ে, ছেড়ে দিল স্বাতীর হাত। তুষারে ভেজা কাঁচ মুছতে শুরু করল। 'দেখছ, বরফ পড়তে শুরু করেছে আবার? আকাশ কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে? দূরে তাকাও, ওই যে

পাহাড়ের পিছনে, ঘন কালো রঙের ওটা কি, জানো?'

স্বাতী রানার দিকে চেয়ে আছে।

'ঝড়। ঝড় এগিয়ে আসছে, স্বাতী। ডাক্তারকে আজ বোধহয় কবর দেয়া সম্ভব হবে না।'

মৃদু কণ্ঠে স্বাতী বলল, 'মৃতদেহ ওরা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সল্ট লেকে।'

'কি?'

'ডা. মলিনেক্স আর ফোর্ট হাম্বোল্ডে যারা মারা গেছে তাদের লাশ তাদের আত্মীয়রা ফিরে পেতে চাইবে না?'

চেয়ে রইল রানা স্বাতীর দিকে। বিমূঢ় দেখাচ্ছে ওকে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল স্বাতী। 'সে-কথা ভেবেই ত্রিশটা খালি কফিন নেয়া হয়েছে ট্রেনে।'

'তাই নাকি?' কি এক দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল রানা সাথে সাথে।

'তাই। আমাদেরকে অবশ্য বলা হয়েছিল কফিনগুলো যাচ্ছে অন্য এলাকাতে। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, ফোর্ট হাম্বোল্ডেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওগুলো।' শিউরে উঠে ঢোক গিলল স্বাতী। 'কপাল ভাল, এই ট্রেনেই ফিরে যেতে হবে না আমাকে। আচ্ছা, কে দায়ী, জানো তুমি?'

চোখ তুলল রানা। 'কিসের জন্যে কে দায়ী? ওহ্, খুনের কথা। একজন খুনীকে আরেকজন খুনীর কথা জিজ্ঞেস করছ?'

'আচ্ছা, কে তুমি আসলে?' স্বীকারোক্তির সুর স্বাতীর গলায়, 'তোমাকে খুনী-টুনী, মানে, অতটা খারাপ লোক বলে কেন যেন ঠিক মেনে নেয়া যায় না।'

'শুভ লক্ষণ!' বলল রানা। 'ভক্ত হতে চলেছ তুমি আমার। সে যাই হোক, খুনটা তাহলে আমি করিনি, যদ্দূর মনে হচ্ছে, তুমিও না। তাহলে মার্শালকে নিয়ে মোট সাতজনকে সন্দেহ করা চলে। কিন্তু এই ট্রিপে কতজন লোক যাচ্ছে ঠিক জানা নেই আমার··· কে যেন আসছে এদিকে!'

বগলে ছড়ি, দু'হাত কোমরে, চোখমুখ ব্যথায় বিকৃত, প্রায় টলতে টলতে কামরায় ঢুকলেন কর্নেল। পিছনে মেজর জোনাথন আর মার্শাল। কর্নেলের দিকে তাকাল রানা। ধীরে ধীরে হাঁটু, কোমর ভাঁজ করে বসলেন তিনি চেয়ারে। হাত বাড়ালেন কফি পটটার দিকে।

বরফ পড়া বেড়েই চলেছে। বাতাসের ঢিমে তাল এখনও আগের মতই। তার মানে ঝড়টা এখনও দূরে আছে। তবে দেরিতে হলেও আসবে।

পুরোপুরি পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়েছে ট্রেন। দু'পাশের পাহাড় এখন খাড়াখাড়ি উঠে গেছে। উপরে উঠে বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে লাইনের উপর। অকৃত্রিম টানেলের ভিতর দিয়ে ছুটছে ট্রেনটা।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে স্বাতী। ট্রেন ব্রিজের উপর উঠছে, তারপর নামছে আবার। খানিক পরপরই একটা করে ব্রিজ। পাহাড়ের সারি কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, জানালা থেকে দেখা যায় গভীর খাদ নেমে গেছে ঝপ করে সোজা নিচের দিকে, কিন্তু তলাটা যে কোথায়, কতদূর, তা বোঝা

যায় না।

আরেকটা ব্রিজ পেরিয়ে বাঁক নিল ট্রেন। উপর দিকে উঠে গেছে রেল লাইন এরপর। বাঁ দিকে অতল খাদ। বহু নিচে, বরফে ঢাকা পাইন গাছের সাদা মাথা উঁকি মেরে দেখছে যেন ট্রেনটাকেই। হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে, চাকার সাথে লাইনের ঘষা খাবার কর্কশ আওয়াজ তুলে স্থির হয়ে গেল রেলগাড়িটা। ছিটকে পড়ে মাথা ফাটাত স্বাতী, জানালার ফ্রেম ধরে কোনমতে রক্ষা করল নিজেকে। ডাইনিংরুমের আর সবাইও ধাক্কাটা সামলে নিল, গতরাতের মত গড়াগড়ি খেতে হলো না কাউকে। চেয়ারটা মাতলামো থামাতেই সটান উঠে দাঁড়াল কর্নেল রুজভেল্ট। তাঁকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল প্যাসেজ-ওয়েতে মেজর জোনাথন আর মার্শাল। ওদেরকে লক্ষ করল রানা। তিন সেকেন্ড অপেক্ষার পর সেও পিছু নিল।

ট্রেন থেকে নামতেই পা ডুবে গেল গুঁড়ো বরফের স্তরে। দৌড়ে আসছে এদিকে ক্রিস্টোফার। ভূতে পাওয়া বিকৃত চেহারা, চেনাই যাচ্ছে না। কাছাকাছি এসে পড়েছে, কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই দেখে মেজর 'কাণ্ড দেখো' বলে দু'পা এগিয়ে গেল এক পাশে, দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে ফেলল ক্রিস্টোফারকে। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে শরীরটাকে বাঁকাচোরা করে তুলল ক্রিস্টোফার। 'ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন আমাকে।' হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে সে মেজরকে। 'গেছে! গেছে বেচারা…গড! ওহ্ গড!'

ক্রিস্টোফারের কানের কাছে মুখ রেখে চেঁচিয়ে উঠল, জোনাথন, 'কে? কে গেছে?'

'ফায়ারম্যান, আমার ফায়ারম্যান— চার্লস!' মেজরকে বেতাল করে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে প্রাণপণে দৌড়ুল ক্রিস্টোফার ব্রিজের দিকে। ছুটল সবাই তার পিছু পিছু।

ব্রিজের উপর উঠে কিনারার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে চাইছে ক্রিস্টোফার। সাবধানে সামনে বাড়ল আরও এক পা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল যতটা সম্ভব, দেখতে চাইছে নিচেটা। স্থির হয়ে রইল ক্রিস্টোফার কয়েক সেকেন্ড। তারপর আরও ভাল করে দেখবার জন্যে উপুড় হয়ে পড়ল কিনারায়। সবাই পৌঁছুল ওর দু'পাশে। সাথে যোগ দিয়েছে কয়েকজন সার্জেন্টকে নিয়ে নিকোলাসও।

ষাট সত্তর ফুট নিচে পাথরের ভাঁজে আটকে গেছে দেহটা। আরও একশো ফুট নিচে সাদা ফেনায় দু'পাড় ঢাকা পাহাড়ী নদী।

'চু-চু-চু-চু।' আফসোসের শব্দ বেরুল গভর্নরের ঠোঁটের ফাঁক থেকে। 'বাঁচবে কিনা সন্দেহ…!'

'ঠাট্টা করছেন নাকি, গভর্নর?' ঝাঁঝাল গলায় বলল রানা। 'ও যে বেঁচে নেই তা তো বোঝাই যাচ্ছে পরিষ্কার।'

ঘন ভুরুর ভিতর থেকে রানাকে ওজন করল গভর্নর তিন সেকেন্ড। ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে চেপে বসে আছে। ফাঁক হতেই ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল। 'তাই কি? সত্যিই কি…?'

মার্শাল ডেভিড বিরক্তিসূচক শব্দ করল একটা, কর্নেলের দিকে এক পা এগোল, 'ওর মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার। আপনি কি মনে করেন, কর্নেল?'

আকাশের দিকে মুখ তুললেন কর্নেল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি রাখলেন রানার মুখের দিকে, 'রানা··· কিন্তু ওকে এ ধরনের কোন হুকুম করার অধিকার আমার নেই।'

'নেই মার্শালেরও,' বলল রানা। 'কিন্তু হুকুম না করলেও আমি নিচে নামতাম, মার্শাল যদি উপস্থিত না থাকত।'

কয়েকজনের মধ্যে আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটে গেল এক পলকে। মার্শালকে হিংস্র হয়ে উঠতে দেখল রানা, দেখল নিজেকে শান্ত রাখার জন্যে দাঁতে দাঁত চাপছে সে। গভর্নর একটু যেন পিছিয়ে গেল। সামনে এগিয়ে এসে মার্শালের পাশে দাঁড়াল মেজর জোনাথন, অনেকটা নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে।

'কি বলতে চাও তুমি?' তীক্ষ্ণ মার্শাল ডেভিডের কণ্ঠস্বর।

'ভয় পাবার কিছু নেই, মার্শাল। আমি শুধু বলতে চাইছি আমি নিচে নামলে লাইফ লাইনটা ছেড়ে দেবার চমৎকার সুযোগ পেয়ে যাবে তুমি। কে না জানে আমার প্রতি তোমার ভালবাসার কথা? নিচের ওই নদীর পাড়ে আমাকে চির নিদ্রায় শুইয়ে রাখার লোভটা কি সামলাতে পারবে তুমি? আমার মনে হয় না।'

মুখের টান টান সতর্ক ভাবটা একটু যেন ঢিলে হলো মার্শালের। কিন্তু চোখের পাতা নড়ল না। কথাও বলল না সে আর।

'দেখ ছোকরা।' গমগমে গলায় বললেন কর্নেল রুজভেল্ট। 'পাঁয়তারা কোষো না আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার চারজন সিপাই রশিটা ধরে থাকবে। আমিও ধরে রাখব শেষ প্রান্তটা। আমি নিজে। এর পরেও আর কিছু বলবার আছে তোমার?'

একজন সিপাইয়ের হাত থেকে রশিটা নিয়ে ফাঁস তৈরি করতে শুরু করল রানা। কারও দিকে তাকালও না। বলল, 'আর এক প্রস্থ রশি চাই।' ফাঁসটা মাথা দিয়ে গলিয়ে কোমরে নামাল রানা।

'আরও এক প্রস্থ?' জানতে চাইল মেজর জোনাথন। 'কেন? ওটাই তো তোমার মত পঞ্চাশজন ঘোড়াকে আটকে রাখবে।'

টান মেরে কোমরে আটকে নিল রানা ফাঁসটা।

'বড় বেশি কথা বলছ তুমি, মাসুদ রানা।' কর্নেল গম্ভীর। 'যাও, নামো এক্ষুণি।'

'কিন্তু, কর্নেল, একটু ভেবে দেখুন, আপনি নিজেই যদি ওখানে মরে পড়ে থাকতেন এবং তারপর চিল শকুনে যদি আপনার দেহটা ঠুকরে ঠুকরে খেত—কেমন হত? চিন্তা করতে খুব ভাল লাগছে কি?'

কর্নেলের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। রানার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন তিনি। যেন বুঝতে পারছেন না ওকে।

'হিউম্যানিটি, হাহ্?' ব্যঙ্গ করল মার্শাল ডেভিড।

নিকোলাসের দিকে ছড়ি তুললেন কর্নেল। কিন্তু কিছু বললেন না। হুকুমটা বুঝতে পেরে ছুটল সার্জেন্ট। রশি নিয়ে ফিরে এল এক মিনিটেই।

দু'মিনিটও লাগল না রানার চার্লসের তোবড়ানো শরীরটার কাছে পৌঁছুতে। মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও। ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মারছে। পত্ পত্ করে উড়ছে রানার শার্ট। উবু হয়ে বসল ও। বাঁধল মৃত চার্লসের শরীরটা দ্বিতীয় রশি দিয়ে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। উপর দিকে তাকাল না ও। হাত মাথার উপর তুলে ইঙ্গিত করেই উঠতে শুরু করল উপর দিকে।

উঠে আসতে বিস্মিত, কিছুটা বিমূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কর্নেল, 'ওয়েল?'

কোমর থেকে রশি খুলছে রানা। মুখ না তুলেই বলল, 'গুঁড়ো হয়ে গেছে খুলিটা। প্রায় সব ক'টা মেজর রিব ভেঙে গেছে বুকের।' মুখ তুলে তাকাল সরাসরি ক্রিস্টোফারের চোখের দিকে। 'ওর হাতে কাপড় জড়ানো দেখলাম এক টুকরো—কেন?'

'বাইরে থেকে জানালার বরফ পরিষ্কার করছিল ও,' উত্তরটা যেন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল ক্রিস্টোফার। মুখস্থ বুলির মত আউড়ে গেল। কিন্তু কর্নেলের দিকে আড়চোখে তাকাল একবার। কথাটা বলতে গিয়ে মাঝপথে ঢোক গিলল একবার। 'হাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে নেয়াটা ফায়ারম্যানদের একটা অভ্যাস। এতে করে, ঝুলে থাকা সহজ হয়।'

'চার্লসের বেলায় তা হয়নি,' বলল রানা। তাকাল কর্নেলের দিকে। 'কেন হয়নি? যদি দেখতে চান, আপনাকে আমি কারণটা দেখাতে পারি। আসুন।'

কর্নেল নয়, রানাকে অনুসরণ করল মার্শাল, জোনাথন ও গভর্নর। সকলের অনেক পিছনে কর্নেল। চিন্তায় ভারী হয়ে উঠেছে যেন কর্নেলের মাথাটা, বুক ছুঁই ছুঁই করছে চিবুক।

ইঞ্জিনরুমে ওঠার পাদানির পাশ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ড্রাইভার ও বয়লারের পাশে দুটো জানালা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বরফ। খুঁটিয়ে দেখল ব্যাপারটা। পিছিয়ে এসে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ইঞ্জিনরুমের উপর।

মেজর আর মার্শালের সাথে উপরে উঠল ক্রিস্টোফারও।

কারও দিকে না তাকিয়ে নিজের চারদিকটা দেখে নিল রানা তীক্ষ্ণ চোখে। পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল কাঠ রাখার জায়গাটা তিনভাগের দু'ভাগ খালি। কিছু কাঠের একটা স্তূপ শুধু পিছন দিকটাতেই। ডান দিকে কিছু কাঠ থাকলেও তা ছড়ানো-ছিটানো, যেন হঠাৎ টান মেরে ফেলার পর সেগুলোকে আর গুছিয়ে তোলা হয়নি।

লম্বা শ্বাস নিল রানা। কিসের যেন গন্ধ নিতে চাইছে আরও পরিষ্কার ভাবে। অযত্নের সাথে ফেলে রাখা কাঠগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। তারপর হাত বাড়িয়ে কাঠের ভিতর থেকে বের করে আনল বোতলটা।

'তেকুইলা,' বলল রানা। 'দেশী মদ। পুরো বোতলটা গলায় ঢেলেছিল

চার্লস। ওর কাপড়েও গন্ধ পেয়েছি আমি,' তাকাল ক্রিস্টোফারের দিকে। 'জেনেও স্বীকার করোনি তুমি কথাটা।'

মার্শাল পারে তো ক্রিস্টোফারের ঘাড় মটকায়। হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'কি বলবার আছে তোমার, ক্রিস্টোফার?'

'ফর গডস সেক, মার্শাল! আমি বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানি না।' মিথ্যে কথা বললেও তা বোঝার উপায় নেই ক্রিস্টোফারের চেহারা দেখে। 'আমার নাকে ব্যারাম আছে, সবাই জানে। ছাগলের বিষ্ঠায় রঙ মাখিয়ে দোস্ত-বন্ধুরা পরিবেশন করে আমাকে বলত, ভারতীয় মিষ্টি, কালোজাম—গন্ধ শুঁকে কিছুই বুঝতাম না আমি, মুখে পুরতাম!' থোঃ থোঃ করে থুথু ফেলল ক্রিস্টোফার জানালার দিকে ফিরে। 'গন্ধ পাই না আমি, সবাই জানে। চার্লস যে মদ খেত, তাই জানতাম না আমি!'

'কিন্তু তুমি খাও!' উঁকি দিলেন কর্নেল ইঞ্জিনরুমের ভিতর। 'মিলিটারি আইনে বিচারের ব্যবস্থা করব তোমার আমি, বোসো!'

চোখ তুলে কর্নেলের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল ক্রিস্টোফার। কিন্তু তাকিয়েও চোখ নামিয়ে নিতে হলো, স্থির রাখতে পারল না দৃষ্টি। 'ডিউটির সময় মদ খাই না আমি, স্যার।'

'গত সন্ধ্যায় রিজ সিটির ডিপোতে মদ খেয়েছ তুমি।'

'মানে যখন ট্রেন চালাই…'

'থামো!' ধমক মেরে থামিয়ে দিলেন কর্নেল ক্রিস্টোফারকে, তাকালেন মার্শালের দিকে, 'আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

'না, কর্নেল।'

'ঠিক আছে,' বলে ঘুরে দাঁড়ালেন কর্নেল, ফিরে যেতে উদ্যত হলেন।

'স্যার!' তাড়াতাড়ি বলল ক্রিস্টোফার। 'দুটো ব্যাপার…জ্বালানি ফুরিয়ে এসেছে আমাদের…'

'মাইল খানেকের মধ্যে ডিপো আছে একটা, লোডিং পার্টি ঠিক করা আছে আমার আর কি?'

'আর, কাজ করতে করতে খুব হাঁপিয়ে গেছি, স্যার। চার্লসের জায়গায় আর কাউকে, মানে ব্রেকম্যান রিচার্ডকে যদি…কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমাকে একটু বিশ্রাম…'

'দেখা যাবে।'

মাথাটা লোকোমোটিভের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল ক্রিস্টোফারের। তুমুল বরফ পড়ছে এখন। কাছে এসে গেছে সামনের ডিপোটা।

উঁকি মেরে দেখে নিয়েই মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টোফার। ফিরে এল কন্ট্রোল প্যানেলে। ডিপোর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। তিনদিক ঘেরা ছাউনি, উপরে টিনের শেড। গোটা ছাউনিটা কর্ড কাঠে ঠাসা।

একদল লোক জড়োসড়ো হয়ে নামল ট্রেন থেকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার উপর ইন্ডিয়ানদের ভয়। ভয়চকিত মুখগুলো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সময়টা

দুপুর, কিন্তু ঘন হয়ে তুষার পড়াতে চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। বাতাসের দাপট আরও বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। তুষারে আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি, কয়েক হাতের বেশি দেখা যায় না।

ইঞ্জিনের দরজা থেকে ছাউনি অবধি সরল রেখার উপর দাঁড়াল লোকগুলো ছাড়াছাড়া ভাবে। হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে কাঠ। তাড়াতাড়ি করার কথা বলতে হলো না কাউকে। সবাই ক্ষিপ্র হাতে কাজটা শেষ করে আবার ট্রেনে উঠতে পারলে ধড়ে প্রাণ ফিরে পাবে।

ট্রেনের অন্য পাশে সেই সময় হাঁটছে রানা। দ্রুত। লাফ দিয়ে উঠল সে সাপ্লাই ওয়াগনের পাদানিতে। মাথায় ক্যাভালরি ম্যানের টুপি, গায়ে ভারী ওভারকোট। দরজার তালাটা পরীক্ষা করে দেখল, বের করল ওভারকোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের টুকরো, সন্দেহ হতে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল পিছন দিকে। কেউ আসছে না দেখে টুকরোটা ঢুকিয়ে দিল তালার ভিতর, বাঁকা করে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল তালাটা। চট্ করে ঢুকেই বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে দরজাটা।

খচ করে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে লণ্ঠনটা জ্বালল রানা। ওভারকোটের গা থেকে তুষার কণা ঝেড়ে ফেলল। এটা ও চুরি করেছে অফিসারদের র‍্যাক থেকে। লণ্ঠনের লালচে আলোয় ঘুরে ফিরে ওয়াগনটা দেখতে শুরু করল ও।

পিছন দিকে বড় সাইজের চারটে র‍্যাকে সাজানো বত্রিশটা কফিন। সবগুলো একই রকম দেখতে। ওয়াগনটার বাকি অংশও ভরাট নানারকম জিনিসে। ডান পাশের বস্তা আর ব্যাগের ভিতর খাদ্যদ্রব্য। বাঁ পাশে তেল চিটচিটে লোহার ফিতে দিয়ে আটকানো কাঠের বাক্স কয়েকটা, বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে সেগুলোর গায়ে লেখা: MEDICAL CORPS: SUPPLIES: UNITED STATES ARMY.

পড়ে থাকা একটা তারপুলিনের কোণা ধরে উপর দিকে টান মারল রানা। আছে বাক্সগুলো। লাল কালিতে গায়ে লেখা: DANGER! DANGER! DANGER!

সবচেয়ে নিচের ছোট তারপুলিনটা ওঠাতে পাওয়া গেল হাতলওয়ালা ছোট্ট ধূসর রঙের একটা বাক্স। এর গায়ে লেখা: U.S.ARMY POSTS & TELEGRAPHS. উঠিয়ে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রানা তারপুলিনটা। বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে নিভিয়ে দিল লণ্ঠন। দরজা খুলে মাথা বের করল বাইরে। দুটো দিক দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিচে নামল রানা। ভারী ট্রান্সমিটারটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে দ্রুত পা বাড়াল ও। এদিক ওদিক চেয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়া রাখার ওয়াগনটার সামনে। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে বন্ধ করল সেটা।

লণ্ঠনের আলোয় নড়েচড়ে উঠল ঘোড়াগুলো। সামনে ফেলে রাখা খড় চিবুচ্ছিল সবগুলো, আলোয় ঠিক ঠাক করে নিল যে-যার পজিশন, যাতে

ধাক্কাধাক্কির কারণ না ঘটে। মোটেও গুরুত্ব দিল না রানাকে কেউ। দু'একটা অলস ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকালেও রানা ওদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারল না।

মেঝে থেকে পড়ে থাকা শাবলটা তুলে নিল রানা। ডান পাশের বাক্সটার পাশ থেকে তক্তাটা খুলে নিল শাবলের চাড় মেরে। পকেটের তারপুলিনটা বের করে জড়িয়ে নিল ট্রান্সমিটারটা, প্রায় তিনফুট খড়ের নিচে ঢুকিয়ে রাখল প্যাকেটটা। চব্বিশ ঘণ্টা লুকিয়ে রাখতে চায় এটাকে রানা।

ঘোড়ার ওয়াগন থেকে নেমে পিছন দিক থেকে উঠে পড়ল রানা অফিসারদের কোয়ার্টারে। হুকে ঝুলিয়ে রাখল গা থেকে ওভারকোটটা খুলে। প্যাসেজ-ওয়ে ধরে এগিয়ে গেল ওয়াগনটার সামনের দিকে। খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ডান দিকে তাকাল। তারপর ফিরে এসে ঢুকে পড়ল কিচেনে। নিকষ কালো নিগ্রোটা বাবুর্চির সাদা পোশাক পরে আছে। রানাকে দেখে মুখ তুলল, সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার, জিভটা দেখা গেল লাল টকটকে। 'গুডমর্নিং, স্যার!'

'গুডমর্নিং। তুমি রোলো না? হেড বাবুর্চি?'

'জ্বী, স্যার।' হাসছে রোলো। 'মি. মাসুদ রানা, তাই না, স্যার? খুনের আসামী আপনি, নিশ্চয়ই ভুল শুনিনি আমি, স্যার? কফি খাবেন, স্যার?'

'খাব,' বলল রানা। 'যদি বোবা হয়ে থাকতে পারো যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হয়। কথাবার্তা বেশি পছন্দ করি না আমি।'

ইঞ্জিনরুমের ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল রুজভেল্ট। পাদানির উপর ক্রিস্টোফার।

'যথেষ্ট হয়েছে, স্যার। এতেই চলবে। ধন্যবাদ।'

নিচে থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল কর্নেলের দিকে সার্জেন্ট নিকোলাস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

'ছুটি দিয়ে দাও,' বললেন কর্নেল।

নিজের লোকদের ক্ষান্ত হবার নির্দেশ দিল নিকোলাস। দেখতে দেখতে ছুটোছুটি করে হারিয়ে গেল ওরা অন্ধকারে। কার আগে কে কোচে উঠবে সেই প্রতিযোগিতা।

'খোরাক পেয়ে ইঞ্জিনটা তাহলে আবার তৈরি হলো, কি বলো হে?' কর্নেল বেশ তৃপ্তির সুরে বলছেন, ভুলে গেছেন ক্রিস্টোফারের অপরাধের কথা। মস্ত দেহটা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে উপর থেকে দেখছেন বরফ পড়া। হাতের ছড়িটা দিয়ে বাড়ি মারছেন পায়ের গোছায়।

'তুষার ঝড়টা থামলেই রওনা দিতে পারব আমরা, স্যার।'

'ইঞ্জিনের ভার কিছুক্ষণের জন্যে ব্রেকম্যানকে দিতে বলছিলে, আমার মনে হয়, এটাই উপযুক্ত সময়।'

মাথা দোলাল ক্রিস্টোফার। 'তখন বলেছিলাম বটে, স্যার। কিন্তু এখন ভাবছি, সামনের তিনটে মাইল রিচার্ড যেখানে আছে সেখানে থাকলেই ভাল

হয়। তার চেয়ে যদি রাফার্তীকে পেতাম, কাজ হত।'

'পরবর্তী তিনটে মাইল?' কর্নেল উপর থেকে ক্রিস্টোফারকে ভাল করে দেখবার জন্যে একটু ঝুঁকে পড়লেন। পায়ে বাড়ি মারা বন্ধ করে ছড়িটা বগলে চেপে ধরলেন। 'কেন?'

'হংম্যানপাসের চূড়ায় উঠব আমরা, স্যার। সবচেয়ে খাড়া পাহাড়। লাইনটা গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে।'

'হুঁ। ঠিক আছে।' সায় দিয়ে নেমে পড়লেন কর্নেল। 'ব্রেকভ্যানেই থাকা দরকার ব্রেকম্যানের।'

চার

ফোর্ট হাম্বোল্ড। সরু একটা পাথুরে উপত্যকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গ নির্মাণের জন্যে আদর্শ একটা জায়গা বেছে নেয়া হয়েছে। পিছনে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পুব-দক্ষিণ দিকটাকে ঘিরে রেখেছে গভীর একটা নালা। শীতের শেষে বরফ গলতে শুরু করলে এই নালাই হয়ে যায় নদী। দুর্গটার সামনে দিয়ে পুব-পশ্চিমে চলে গেছে রেল-লাইন নালাটাকে ডিঙিয়ে। ফোর্ট হাম্বোল্ডকে ছাড়িয়ে আরও অনেক পশ্চিমে ভার্জিনিয়া সিটি।

কবে যে গোড়াপত্তন হয়েছিল দুর্গটার তা এখন আর কেউ বলতে পারে না। ১৮৪৯ সালে যখন এই ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলওয়ের জন্ম হয় তখনও ছিল ফোর্ট হাম্বোল্ড।

বাইরের দেয়ালগুলো আর বিল্ডিংটার কাঠামোটা বাদ দিয়ে দুর্গটা তৈরি করা হয়েছে পাইন বা ওই জাতের গাছের তক্তা দিয়ে। সিঁড়ি থেকে শুরু করে দোতলার মেঝে পর্যন্ত সব কাঠের। নদী আর রেলপথ পার্বত্য উপত্যকার একটা জায়গায় সমান্তরাল পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেই জায়গাটার দিকে সরাসরি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত, ভারী কাঠের গেটটা। শত বছরের প্রাকৃতিক অত্যাচার সহ্য করে কাঠগুলো লোহার চাইতেও শক্ত হয়ে গেছে। ভিতরে ঢুকে হাতের ডান দিকেই গার্ডরুম। বাঁ দিকে গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের গোডাউন। প্রকাণ্ড উঠানটার গোটা পুব দিক জুড়ে একটা টিনের দোচালা। আস্তাবল ওটা। পশ্চিমে সৈনিকদের কোয়ার্টার আর রান্নাঘর। অফিসারদের কোয়ার্টার দক্ষিণ দিকটায়। ওদিকেই প্রশাসন, টেলিগ্রাফ অফিস, সিক বে এবং গেস্ট-হাউস।

নিঃসঙ্গ ফোর্ট হাম্বোল্ডের চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। এলাকাটা নো ম্যানস ল্যান্ড হিসেবেই পরিচিত।

পশ্চিমের উপত্যকা বেয়ে এগিয়ে আসছে দলটা। ফোর্ট হাম্বোল্ডের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। হাড় কাঁপানো শীত আর তুষার কণার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে প্রত্যেকের পায়ের নখ থেকে কান পর্যন্ত চামড়ার পোশাকে

ঢাকা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে পিউতী ইন্ডিয়ানগুলোকে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা ঘোড়াগুলোর। তুষারে গেঁথে যাওয়া খুর বের করে নিতে কষ্ট হচ্ছে ওদের। থেমে থেমে, মন্থর গতিতে এগোচ্ছে পিঠে সওয়ার নিয়ে। পিউতীদের মধ্যে একটা লোকই এখনও প্রফুল্ল ও প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর । গায়ের রঙটা ফ্যাকাসে তার, চেহারার মধ্যে সৌন্দর্য আছে। পুরো দলটা থেকে এক পলকে তাকে আলাদা করে নেয়া যায়। শিরদাঁড়া সোজা রেখে ঘোড়ার পিঠে বসার কায়দাটা চমৎকার, রাজাধিরাজ মহাবীর আলেকজান্ডার দুর্গ জয় করতে আসছেন যেন। কিন্তু পিউতীরা বা তাদের দলপতি দাগু আলেকজান্ডারের নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ।

দুর্গের খোলা গেট দিয়ে দলটাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল দাগু। বাধা এল না কোথাও থেকে। এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না কোন দিকে। হাত শূন্যে তুলে সবাইকে থামার নির্দেশ দিল দাগু। ঘোড়া ও ঘোড়ার পিঠের সওয়ারগুলো মূর্তি হয়ে গেল মুহূর্তে। রঙ মাখা বীভৎস মুখ পিউতীদের, থমথম করছে। চারদিক নিস্তব্ধ। ঘোড়া থেকে নেমে একা এগিয়ে গেল দাগু কাঠের তৈরি কামরাটার দিকে।

দরজায় ইংরেজী অক্ষরে লেখা: COMANDANT. এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল দাগু। তারপর ধাক্কা মেরে দরজা খুলেই ভিতরে ঢুকে পড়ল। বন্ধ করে দিল সে দরজাটা ভিতর থেকে। তুষারহিম বাতাস মাথা কুটতে শুরু করল আবার দরজার গায়ে।

কর্নেল জ্যাকসনের ডেস্কের উপর পা তুলে দিয়ে আর্মচেয়ারে বসে আছে সিম্পসন। এক হাতে কর্নেলের বাক্স থেকে নেয়া চুরুট, অন্য হাতে কর্নেলেরই বোতল থেকে ঢালা হুইস্কির গ্লাস।

শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল সিম্পসন। মুহূর্তে সিধে হয়ে গেল শিরদাঁড়া। নেমে এল পা দুটো ডেস্ক থেকে। এমনিতে কাউকেই পরোয়া করার বান্দা সিম্পসন নয়। কিন্তু সদ্য আগত এই রেড ইন্ডিয়ান সর্দারকে সমীহ করে চলতে হয় তাকে। একে অসম্মান করার দুঃসাহস সে দেখাতে পারে না। 'এসো, এসো! খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেছ দেখছি!'

সামনের চেয়ারের উপর একটা পা রেখে দাঁড়াল দাগু। হাত বাড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে তুলে নিল হুইস্কির বোতলটা। 'খারাপ আবহাওয়ায় আস্তে চলা মানেই তো বিপদ!'

'সব কিছু ঠিক আছে? সানফ্রান্সিসকোর দিকে লাইন...?'

'কেটে দিয়েছি,' পা নামিয়ে পাশের চেয়ারে বসল দাগু। 'অনিতোরা জর্জের রেল-ব্রিজটাও উড়িয়ে দিয়েছি।'

হাত লম্বা করে কালো চুরুটের গায়ে তর্জনী দিয়ে তিনটে টোকা মেরে ছাই ঝাড়ল সিম্পসন। 'চমৎকার, প্রশংসা করতে হয় তোমার। কতক্ষণ সময় আছে আর আমাদের হাতে?'

'কিসের সময়? ট্রেনে করে সৈন্য এসে পৌঁছুবার?'

উপর নিচে মাথা দুলিয়ে সিম্পসন বলল, 'হ্যাঁ।' তর্জনী তুলল সে নিজের

নাকের সামনে খাড়া ভাবে। 'আমার ইচ্ছে, দাগু, ফোর্ট হাম্বোল্ডে কোন রকম ঘাপলা আছে তা যেন ওরা ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। কোন সুযোগ দিতে চাই না ওদের।'

'দরটা খুব চড়া হেঁকেছ তুমি, সিম্পসন,' খানিক চিন্তা করল দাগু হাতের গ্লাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। 'কম করেও তিনদিন লাগবে। এর কমে পারব না।'

'লাগলই না হয়। অসুবিধে নেই। হিসেব করলে দাঁড়ায়, কাল দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে এসে পৌছুবে ট্রেন।'

'ট্রেনের সিপাইরা···?'

গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল সিম্পসন, একটু যেন চমকে উঠল। বলল, 'আর কোন কথা নয় এ প্রসঙ্গে।' বলেই ভুলটা ধরতে পারল, সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'খুব ধকল গেছে তোমাদের শরীরের ওপর দিয়ে, একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও এবার। অন্ধকার নামার আগেই তো আবার রওনা দিতে হবে তোমাদের।'

দাগু কথা বলল না, কিন্তু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সরল না তার সিম্পসনের মুখ থেকে। অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে সিম্পসন।

'যথেষ্ট সময় হাতে আছে, সিম্পসন। সময় থাকতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে চাই আমি। ফোর্ট দখল করার যে কথা হয়েছে তা আর একবার ঝালাই করে নিতে না পারলে ঠিক যেন উৎসাহ বোধ করছি না। ফোর্টের কাছেপিঠে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর দল আছে কি নেই জানব কিভাবে আমি?'

'মানে?'

দাগু হাসল, 'ধরো, হঠাৎ একদল লোক এসে রাতের জন্যে আশ্রয় চাইল ফোর্টে। বন্ধুদের সাদরে আশ্রয় দিলে তুমি। দুর্যোগের রাত, তোমার মত দয়ার সাগরের কাছে সাহায্য চাইলে তুমি তাদেরকে নিরাশ করতে পারবে না, এ আমি জানি। তারপর কি হবে? গেটে পাহারা দেবে আমার যে দু'জন লোক তাদেরকে খুন করা খুব একটা কঠিন হবে না তাদের পক্ষে। বাইরে অপেক্ষারত মূল দলটা এরপর অনায়াসে ঢুকে পড়বে ফোর্টের ভিতর। ওদিকে আমার দলের সবাই তখন গভীর ঘুমে। পিঁপড়ে মারার মত মারবে তোমার বন্ধুরা ওদেরকে, ওরা টেরই পাবে না কোথা থেকে কোথায় চলে গেল ঘুমের ভেতর। কেমন শোনাচ্ছে?'

বুরবর বোতলটা তুলে নিল সিম্পসন।

'যতই ভাবছি ততই যেন সম্ভব বলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা,' বলে চলল দাগু। 'গার্ড দুজনকে খুন করতে পারলেই জিতে যাবে তুমি। আমার গোটা দলটা নিমেষে লাশ হয়ে যাবে···'

'তোমার মাথা খারাপ···!'

'না,' গম্ভীর স্বরে বলল দাগু। 'সিম্পসন, কোন বদ মতলব যদি থাকে, এই মুহূর্তে ত্যাগ করো। কথাটা তোমার ভালর জন্যেই বলছি। একটা কথা মনে

রাখলেই চলবে—দাগুর সাথে কারবার করছ তুমি। দাগু!' বলেই বুরবর বোতলটা সিম্পসনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে নিজের মাথার উপর ঘা মারল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে পড়ল বোতলটা। ভাঙা বোতলের গলাটা তখনও ধরা রয়েছে হাতে। মাথার চুল, কান, জুলফি বেয়ে হুইস্কি নামছে কাঁধের উপর। চোখে পলক নেই দাগুর, চেয়ে আছে সিম্পসনের চোখের দিকে। হঠাৎ সে গলা ছেড়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

'ভয় লাগে, সিম্পসন?' বোতলের গলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডেস্ক থেকে ভাঁজ করা একটা রুমাল তুলে নিয়ে মাথা মুছতে শুরু করল দাগু। 'নিজের স্বার্থের কথাই শুধু বোঝো। পিউতীদের কথা ভাব না এতটুকু। পুরো একটা রাত আর দিন ঘোড়ার পিঠে কাটাতে হয়েছে আমাদের অনিতোরা ব্রিজটা ওড়াবার জন্যে। তোমার বিবেচনা নেই একটু। এখন আবার হুকুম করছ আর একটা কাজের।'

সিম্পসন সামলে নিয়েছে নিজেকে। গোঁয়ারের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার একটাই কথা, পুরো সৈন্যদলটা কোনমতেই যেন এসে পৌঁছুতে না পারে, ব্যস। এর জন্যে যা কিছু করার সব করতে হবে তোমাকে। এটাই ছিল আমার প্রথম শর্ত।'

'কিন্তু ভেবে দেখেছ, কত লোক হারাতে হতে পারে আমাকে? ট্রেনে যে সৈন্যদলটা আসছে তারা যোদ্ধা, ডামি নয়। প্রাণপণে বাধা দেবে ওরা। জান নেব নয় দেব—এই প্রতিজ্ঞা করে ঝাঁপিয়ে পড়বে না প্রতিটি সৈন্য? আমাকে তারা কতটা ঘৃণা করে তা কি তোমার অজানা আছে? ওরা হেরে গেলেই বা কি, কেউ না কেউ ফিরে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যে ঠিকই বেঁচে থাকবে। তখন? ব্রিগেডের পর ব্রিগেড পাঠানো হবে না দাগুকে ধ্বংস করার জন্যে? তাই বলছি দরটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি, সিম্পসন?'

সিম্পসন হাসছে। বলল, 'কিন্তু খবর দেবার জন্যে ধরো যদি একজনও বেঁচে না থাকে? পুরস্কারটাও কি বেশি হয়ে যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে?'

নিঃশব্দে চিন্তা করতে লাগল দাগু। এক মিনিট পর বারকতক মাথা ঝাঁকাল সে। বলল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। পুরস্কারটাও বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

ডিপো থেকে স্টার্ট নেবার ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় ট্রেন পৌঁছে গেল হংম্যানপাসের উপর।

ডে-কমপার্টমেন্টের হিমশীতল জানালার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে বাইরে চেয়ে আছে স্বাতী। আর সবাই বসে আছে থমথমে মুখে।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে স্বাতী লাইনের পিছনটা। দু'মাইল সোজা এগিয়ে বাঁক নিয়েছে, ক্রমশ নেমে গেছে নিচের দিকে। তুষারপাত এখন বন্ধই বলা চলে। দৃষ্টি পথে কোন বাধা নেই। তবে বাতাস দামাল হয়ে উঠেছে আরও। বাতাসের সাথে উড়ছে, ছুটোছুটি করছে দুটো একটা তুষারকণা। পাগলা বাতাস এদিক ওদিক থমকে দাঁড়াচ্ছে, ঘুরতে শুরু করছে দ্রুতগতিতে—সৃষ্টি

হচ্ছে তুষার ঘূর্ণি।

কর্নেল রুজভেল্ট খেপে আছেন। কার উপর তা তিনি নিজেও জানেন না। হাতের ছড়িটা দু'হাতে ধরে মোচড়াচ্ছেন, ইচ্ছে হচ্ছে রেভারেন্ডের পাছায় কষে বাড়ি মারেন। কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। এদিকে ঠাণ্ডা লেগে কাশির মাত্রাটা বেড়ে গেছে অনেক। আর কাশলেই কোমরের ব্যথাটা ব্যঙ্গ করছে, খোঁচা মারছে বেরসিকের মত।

মার্শাল চেয়ে আছে কর্নেলের দিকে। কর্নেল চোখ তুলতেই চোখাচোখি হলো।

'আপনার তদন্তের ফলে কিছুই কি জানা গেল না, মার্শাল?'

'না, স্যার। কেউ কিছু দেখেনি বা শোনেনি। এ ভারি আশ্চর্যের কথা!' কিন্তু এতটুকু আশ্চর্য বা দুঃখিত দেখাচ্ছে না তাকে। ভাবাবেগে ভোগার লোক সে অন্তত নয়। 'কেউ কাউকে যে সন্দেহ করছে, তাও নয়। স্বীকার করছি, স্যার, এক পাও এগোয়নি আমার তদন্তের কাজ।'

'অদৃশ্য সব সূত্রই চেষ্টা করলে আবিষ্কার করা যায়,' বলল রানা। 'আমার হাত-পা বাঁধা ছিল, সুতরাং আমি সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আমাকে ছাড়া পুরো আশিজনকে সন্দেহ করতে হবে আপনার, কর্নেল। এদের মধ্যে আইনের লোক...'

একটা প্রচণ্ড, কর্কশ ধাতব আওয়াজ হতে থেমে গেল রানা। চেয়ার থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে দেহটা কর্নেলের। হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছেন তিনি, চরম বিপদটা সামনা সামনি চলে এসেছে। 'কিসের? কিসের আওয়াজ ওটা?'

হতভম্ব হয়ে পড়েছে সবাই। কর্নেলের কথায় যেন সংবিৎ ফিরল। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে ছুটল সবাই জানালার দিকে।

জানালা দিয়ে দৃশ্যটা দেখে বোবা হয়ে গেল সবাই।

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ট্রেনের শেষ তিনটে ওয়াগন। দুটো ট্রুপ কোচ আর ব্রেকভ্যানটা দ্রুতবেগে নেমে যাচ্ছে খাড়া বাঁক নেয়া লাইন ধরে হংম্যানপাসের দিকে। ঘোড়ার ওয়াগন আর ট্রুপ কোচের মধ্যবর্তী ফাঁকটা চোখের পলকে বেড়ে যাচ্ছে দেখে অনুমান করা যায় কত দ্রুত ছুটছে পিছন দিকে বাকি তিনটে।

'কিছু একটা করা দরকার।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা। পরমুহূর্তে বোকা মনে হলো নিজেকে ওর। করার কিছুই নেই আসলে। তিনটে ওয়াগনের মাঝখানেরটায় ছিল নিকোলাস। আচমকা দ্রুত গতির উল্টো পরিবর্তনে ছিটকে পড়ল সে বাঙ্ক থেকে, গড়িয়ে গেল দেহটা, ঠুকে গেল মাথা দেয়ালের সাথে। মেঝের নিচে চাকা আর লাইনের ঘষায় কান ফাটানো খটাখট খটাখট আওয়াজ হচ্ছে। সাংঘাতিক চাপ সইতে না পেরে যে-কোন সেকেন্ডে খুলে যেতে পারে লাইনের জয়েন্টের ফিসপ্লেটগুলো।

কালো হয়ে গেছে মুখগুলো সবার। সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা বসতে পারছে না কেউ। দেয়াল ধরে কোনমতে দাঁড়াল নিকোলাস। কিছুই বুঝতে

পারছে না সে। সিপাইদের দরজা খোলার নির্দেশ দিল গালাগাল করে।

চারজন সিপাই ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপর। এক টানে যেটা খোলা যায় সেটা খুলতে গিয়ে গলদঘর্ম হলো চারজন, কিন্তু ফল হলো না। খুলল না দরজা। হাল ছেড়ে দিল সিপাইরা। ট্রেনের অবিরাম ঘটাং ঘটাংকে স্তব্ধ করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'জেসাস।' চিৎকার না কান্নার আওয়াজ বোঝা মুশকিল। 'বাইরে থেকে তালা মারা দরজায়!'

ডে-কমপার্টমেন্টের সাতজন বোকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। অসহায় দর্শক ওরা, সাহায্য করার কোন উপায়ই নেই ওদের হাতে। দেখতে পাচ্ছে, ক্রমশ গতি বাড়ছে বগী তিনটের। মাতালের মত এদিক ওদিক দুলছে মারাত্মক ভঙ্গিতে, যে কোন মুহূর্তে লাইনচ্যুত হয়ে কাত হয়ে পড়তে পারে খাদের কিনারায়। সাঁ সাঁ করে নেমে যাচ্ছে সবচেয়ে বিশ্রী বাঁকটার দিকে।

খেপা কর্নেল খেঁকিয়ে উঠলেন, 'গর্দভের বাচ্চা রিচার্ড, ব্যাটা ব্রেকম্যান, ব্রেক চাপ্‌...ব্রেক চাপ্‌...ব্রেকটা...'

ওদিকে দিশেহারা নিকোলাসের মাথাতেও প্রশ্নটা তড়পাচ্ছে, ব্রেকম্যান কি করছে? ব্রেক কষে থামাবার চেষ্টা করছে না কেন সে বগী তিনটেকে? ঘুমুচ্ছে নাকি...নাহ্‌। এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে যেতে বাধ্য...।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটল নিকোলাস। পিছনের দরজার কাছে পৌঁছে দেখল সিপাইরা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার দিক মুখ করে। ছোট্ট গোল কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরেটা দেখার জন্যে হুমড়ি খেয়ে আছে সবাই। একজনকেও সরাতে পারল না নিকোলাস ওখান থেকে। আবার এগোল সে মাঝের দরজার দিকে। ভীড় কিছুটা কম এখানে। কোমর থেকে কোল্টটা বের করে ক'জনের শিরদাঁড়ায় খোঁচা মারল সে, হুকুম করল সরে যেতে।

তালার গায়ে নল ঠেকিয়ে গুলি করল নিকোলাস। বন্ধ কামরার ভিতর প্রচণ্ড শব্দ হলো গুলির। চারটে গুলি খরচ করার পর ছিটকে বেরিয়ে গেল তালাটা। হাতল ধরে চাপ দিতেই ক্যাঁচ করে খুলে গেল দরজা। প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় উড়ে যাচ্ছিল পিছন দিকে নিকোলাস, পিছন থেকে ধরে ফেলল ওকে সিপাইরা। তাদেরকে গুঁতো মেরে নিজেকে মুক্ত করল সে। বাতাসের বিপরীতে পা বাড়াল, চৌকাঠ পেরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। পা পিছলে যেতে উন্মাদের মত এক হাতে ধরে ফেলল কবাটের জয়েন্ট, অপর হাতে দরজার পাশের হাতল। তুলোর মত বাতাসে উড়ে গেল পিস্তলটা হাত থেকে খসে যেতেই।

দরজার হাতল ধরে ঝুলতে থাকল নিকোলাস। মারাত্মক ঝুঁকিটা নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। জানালার খাঁজ ধরে ধরে ব্রেকভ্যানে পৌঁছুতে হবে। ফুটদশেক দূরত্ব, পেরোতে হয়তো সময় লাগবে তিন মিনিট, কিন্তু...এতগুলো মানুষের প্রাণ...মন স্থির করে ফেলল নিকোলাস, যাবে সে। ব্রেকম্যানের উপর নির্ভর করা যায় না আর। যে কোন মুহূর্তে লাইন থেকে সরে গিয়ে গভীর খাদে

কুউউ!

পড়ে যেতে পারে বগী তিনটে। মরেই আছে সব ক'জন, একটু চেষ্টা করে কিছু একটা করা যায় কিনা দেখতে দোষ নেই।

প্রথম জানালার খাঁজে হাত রেখে ঝুলে পড়ল নিকোলাস। দমকা বাতাসে দম আটকে গেল ওর। তীব্র বাতাস ঝাপটা মেরে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। প্রতিটি সেকেন্ড সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হচ্ছে তাকে। সেই সাথে আধ ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে এগোতে হচ্ছে।

দম ফুরিয়ে গেল নিকোলাসের, পারছে না আর। প্রায় শেষ মুহূর্তে পৌঁছুল সে পিছনের দরজার কাছে। হাতলটা ধরে পাদানিতে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাত বাড়িয়ে ধরল ব্রেকভ্যানের দরজার পাশের হাতলটা। দরজার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল ভিতরটা।

বিরাট ব্রেক হুইলটা দাঁড়িয়ে আছে ভ্যানের শেষ প্রান্তে। কোন হাত, কারও হাত হুইলটাকে ধরে নেই। দুটো হাত দেখতে পাচ্ছে অবশ্য নিকোলাস। হাত দুটো ধরে আছে একটা বাইবেল। মুখ নিচু করে বাইবেলটার পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে রিচার্ড। পিঠটা দেখতে পাচ্ছে সে। পিঠের উপর দিকে, শোল্ডার ব্লেডের ঠিক নিচেই চকচক করছে ছোরার সাদা বাঁটটা।

ব্রেকভ্যানের দরজা খোলবার চেষ্টা করল নিকোলাস। খুলল না, তালা মারা এটাতেও। সমস্ত ভয় হঠাৎ জয় করে ফেলল সে। বেঁচে থাকার আশা এত সহজে ত্যাগ করতে পেরে হালকা বোধ করল, জীবনে যা সে করবে বলে ভাবতে পারেনি তাই করে বসল অনায়াসে। এক হাতে ক্রুসচিহ্ন আঁকল নিজের বুকে, তারপর দু'হাত ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে ঘুসি মারল জানালার কাঁচে। দোল খেল বগী। মুহূর্তে হারিয়ে গেল নিকোলাস খাদের গভীর অন্ধকারে।

নিকোলাসের অপূর্ব সাহসিকতার নিদর্শন চাক্ষুষ করল এতক্ষণ ডে-কমপার্টমেন্টের সাতজন মানুষ নিঃশব্দে। শিউরে উঠল সবাই। সেই সাথে মেনে নিল বাস্তবতাকে, যা ঘটবার ঘটবেই, কারও কিছু করবার নেই।

প্রায় দু'মাইল দূরে চলে গেছে বগী তিনটে। অলৌকিক ভাবে লাইনের উপর আটকে আছে এখনও। কোনাকুনি বাঁকটার কাছে পৌঁছে শেষ রক্ষা করতে পারল না অবশ্য। এত দ্রুত বাঁক নিতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ছিটকে সরে এল জানালার কাছ থেকে স্বাতী। সইতে পারল না দৃশ্যটা।

লাইনটা খুলে গেছে, না চাকাগুলো পড়ে গেছে লাইন থেকে এতদূর থেকে তার কিছুই বোঝা গেল না। উল্টো দিকের খাদের দিকে ছুটে গেল বগী তিনটে আছাড় খেতে খেতে। তারপর দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ।

পুরো ট্রেনটায় বেঁচে আছে আর মাত্র এগারোজন। নিঃশব্দে এগোচ্ছে ওরা। কারও মুখে কথা নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপছে সবাই। ঘোড়া রাখার কামরাটার

পিছনে গিয়ে থামল দলটা। পরীক্ষা করে বগী আটকানোর হুকটা দেখলেন কর্নেল। বোল্টগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চোখেমুখে। 'ভেবেই পাচ্ছি না, খুলল কেমন করে এগুলো? এক একটা বোল্টের সাইজ দেখেছ?'

'যে কাঁটাটার সাথে আটকানো ছিল বোল্টগুলো সেটা পরীক্ষা করে দেখা যাক,' বলল মেজর জোনাথন। 'বগী তিনটে পরীক্ষা না করলে আসল কারণটা কোনকালেই বোঝা যাবে না, আমার ধারণা। তার উপায় নেই, কে নামবে খাঁড়িতে!'

'কিন্তু যে শব্দটা শুনলাম...,'

'ঠিক কর্নেল,' বলল রানা। 'আমিও শুনেছি শব্দটা। একটা কাঠ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাবার মত শব্দ।'

'ঠিক বলেছ, আসলেই মনে হয়েছিল কাঠ ভাঙার শব্দ ওটা। তুমি কি বলো, ক্রিস্টোফার? একমাত্র ট্রেনম্যান এখন তুমি আমাদের।'

'ওপরওয়ালা জানে, স্যার। কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। হুকের সাথে আটকানো কাঠের টুকরোটা নষ্ট হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যে রকম চড়াই ঠেলে উঠতে হচ্ছিল তাতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হবার কথা, কিন্তু তাই বলে ভেঙে যাবে—ভাবা যায় না। তবে দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে এ ছাড়া আর কিছু ঘটেনি। কিন্তু স্যার, সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি আমি রিচার্ডের কথা ভেবে। ও কোন চেষ্টা করল না, কেন?'

কর্নেল শান্ত গলায় বললেন, 'কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা কখনোই জানতে পারব না। যা গেছে গেছে। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে, আর একবার রিজ সিটির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা, হতভাগাগুলোর বদলে লোক চেয়ে পাঠাতে হবে। শান্তি লাভ করুক ওদের আত্মা।' একটু থেমে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন। 'সান্ত্বনা অন্তত এটুকু যে মেডিক্যাল সাপ্লাইটা রক্ষা পেয়েছে।'

রানা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল, 'ওটা থাকা না থাকা সমান।'

ছড়িটা বগলের নিচে চেপে ধরলেন কর্নেল, 'তার মানে?'

'ডাক্তার নেই, ওষুধ কোন্ কাজে লাগবে?'

যেন বোঝেননি রানার কথা, ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন কর্নেল। বললেন, 'তুমি একজন ডাক্তার।'

'সত্যি কথা বলতে কি, ডাক্তারির ড-ও জানি না আমি।'

ওদের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, শুনছে। সূক্ষ্ম একটা কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল স্বাতীর মুখে।

ছড়ি দিয়ে জোরে বাড়ি মারলেন কর্নেল উরুর উপর। খেপে গেছেন তিনি, 'ঠাট্টা করার সময় পাওনি আর, না?' বিশ্বাস করছেন না তিনি রানার কথা। 'কলেরা লেগেছে ওখানে। তোমার আমার মত মানুষ মারা যাচ্ছে এক এক করে...'

'আমার মত মানুষই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ফাঁসিতে ঝোলাতে, [illegible]

রানা। 'জুতসই একটা গাছ পেলেই মার্শাল লটকে দেবে আমাকে গলায় ফাঁস পরিয়ে। চুলোয় যাক আমার মত মানুষ। কলেরার ধারে কাছে নেই আমি।'

রাগে লাল হয়ে গেছে কর্নেলের মুখ, সঙ্গীদের দিকে ফিরলেন, 'মোর্স শিখিনি কখনও। জানা আছে কারও?'

'ফারগুসনের মত পারব না,' বলল মেজর জোনাথন। 'তবে যদি সময় দেন আমাকে…'

'ধন্যবাদ, মেজর,' খুশি হয়ে উঠলেন কর্নেল। 'হেনরী, সাপ্লাই ওয়াগনের একটা তারপুলিনের নিচে পাবে তুমি সেটটা। ডে-কমপার্টমেন্টে নিয়ে এসো সেটা।' তাকালেন ক্রিস্টোফারের দিকে, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফোর্টে পৌঁছুতে চাই আমি।'

ক্রিস্টোফার দম টেনে বলল, 'একা কিভাবে যে কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ঘুমুতে না পারলে মারা পড়ব আমি, স্যার।'

কাশিটা দমন করতে পারলেন না কর্নেল, খকখক করে বেশ খানিকক্ষণ কাশলেন। কথা বলার সময় রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখলেন ঠোঁট জোড়া, 'ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা। এখুনি ঘুমুতে যাবে?'

'রাত পর্যন্ত ঝুলে থাকতে পারব কোনমতে। আসলে, স্যার, রাতের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে চালাতে পারব আমি দিনের বেলা। সন্ধ্যা পর্যন্ত'…পাশে দাঁড়ানো আর্মি ফায়ারম্যান রাফার্তীর দিকে তাকাল সে। 'আমি আর রাফার্তী ম্যানেজ করতে পারব।'

ছুটে যাওয়া হুক আর বোল্টগুলোর দিকে চোখ রেখে কর্নেল বললেন, 'নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি হবে, ক্রিস্টোফার?'

চৌকো মুখে লেগে থাকা তুষার কণা হাত দিয়ে ঘষে মুছে ফেলল ক্রিস্টোফার, বলল, 'এ ব্যাপারে কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি না। স্যার, এ ধরনের ঘটনা লাখে একটাও ঘটে না। বাকি হুক আর বোল্টগুলো পরীক্ষা করে নিতে হবে, টাইট দিতে হবে এক এক করে প্রত্যেকটা। এছাড়া আর করার কিছু নেই। আমার মনে হয় এতেই হবে, আর কোন দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে না।'

'ভাল। তাই করো তাহলে।' পদশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে হেনরীকে দেখতে পেলেন কর্নেল। 'পেয়েছ?'

'না, স্যার।'

'মানে?' ধমকে উঠলেন কর্নেল।

'সেটা নেই, স্যার।'

'কি বললে? নেই?'

'জ্বী, স্যার। সাপ্লাই ওয়াগনে সেটটা নেই।'

'অসম্ভব!' তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল কর্নেলের গলা থেকে।

কিন্তু এতটুকু চমকাল না হেনরী। চেয়ে আছে নির্বিকার।

'ভাল করে খুঁজে দেখছ?' কেমন যেন থিতিয়ে গেলেন কর্নেল, হেনরীর কথা বিশ্বাস করতে শুরু করছেন তিনি মনে মনে। এমন সব অবিশ্বাস্য ঘটনা

ঘটছে এই ট্রেনে যে আর একটা তেমন ঘটনা বিচিত্র কিছু নয়।

আহত মনে হলো হেনরীকে, 'কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি, স্যার। আপনাকে অসম্মান করার স্পর্ধা আমার নেই, তবে ইচ্ছে করলে দেখে আসতে পারেন…।'

'খোঁজো। খুঁজে দেখো সবাই গোটা ট্রেনটা!' আবার খেপে উঠলেন কর্নেল, হুঙ্কার ছেড়ে আবার কিছু বলতে গিয়ে পারলেন না, খক্ খক্ করে বেদম কাশতে শুরু করলেন অসময়ে।

কর্নেল না থামা পর্যন্ত চারদিকে তাকাতে তাকাতে হাতের আঙুল মটকাল রানা, তারপর বলল, 'দুটো কথা আছে আমার, কর্নেল। এক, রাফার্তীকে ছাড়া আর কাউকে হুকুম করতে পারেন না আপনি। দুই, আমার মনে হয়, খুঁজে লাভ হবে না।'

মনে মনে চুপসে গেলেও কটমট করে চেয়ে রইলেন কর্নেল রানার দিকে।

'ডিপো থেকে যখন কাঠ তোলা হচ্ছিল তখন একজন লোককে সাপ্লাই ওয়াগন থেকে নেমে পিছন দিকে ছুটে যেতে দেখি আমি,' আবার বলল রানা। 'ঘন তুষারের জন্যে লোকটাকে আমি চিনতে পারিনি।'

'ফারগুসন হতে পারে? কিন্তু এধরনের কোন কাজ ফারগুসন কেন করতে যাবে?'

নির্বিকার ভঙ্গি নিল রানা। 'এসব ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না, কর্নেল। যা দেখেছি, বলেছি। ফারগুসন হোক বা না হোক তাতে আমার কি? আপনাদের ব্যাপার আপনারা বুঝুন, আমি নাক গলাতে যাচ্ছি না।'

'মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ হে, ছোকরা।' কর্নেল সাবধান করে দিলেন রানাকে।

ট্রান্সমিটারটা যেই সরাক, সেটা এখন খাদের নিচে চার টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে আছে—এই হলো আমার বিশ্বাস।'

'তোমার বিশ্বাস নিয়ে থাকো তুমি।'

'আর আপনি তাহলে গোটা ট্রেনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখুন গে, যান।'

রিজ সিটিতে রানাকে দেখার পর থেকে এই প্রথম দিনের আলোয় রানার দিকে গম্ভীর মনোযোগ দিয়ে তাকালেন কর্নেল। তীক্ষ্ণ হলো তাঁর চোখের দৃষ্টি। এক পা এগোলেন তিনি রানার দিকে। জানতে চাইলেন, 'এর আগে কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে আমি, রানা। আসল দেশ কোথায় তোমার? মিলিটারিতে ছিলে কোন দিন?'

'কোথাও দেখেছেন কিনা জানি না। মিলিটারির ধারে-কাছেও ছিলাম না কোনদিন। আর দেশ—দেশ নেই আমার। জন্মস্থান—ঢাকা, বাংলাদেশ।'

'ঠিক?'

'বললাম তো।'

'বাংলাদেশের জন্ম হবার পর কোথায় ছিলে?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল রানা কিছু যেন মনে করার ভঙ্গিতে,

তারপর বলল, 'মুক্তিযুদ্ধের পর চলে যাই ক্যালিফোর্নিয়ায়। তারপর সারাটা দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে বেড়াই।'

ছড়িটা রানার বুকের দিকে তাক করলেন কর্নেল, 'এই বেপরোয়া ভাবটা পেয়েছ কোত্থেকে?'

'ঘটনাগুলো নিজের চোখের সামনেই তো ঘটতে দেখছেন, এইসব ঘটনার মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে বেপরোয়া হওয়া ছাড়া উপায় নেই,' জবাব দেবার ভঙ্গিটা রানার আগের মতই বেপরোয়া। হাঁটতে শুরু করল ও ঘুরে দাঁড়িয়েই।

'কে ও?' বিড় বিড় করে আপন মনে বললেন কর্নেল। 'কোথায় যেন দেখেছি! ঠিক যেন ক্রিমিন্যাল বলে মনে হয় না!'

দুপুরের পর থেকেই আবার আকাশ থেকে শুরু হলো তুষার তুষার খেলা। পাহাড়ের চূড়া থেকে ফের উপত্যকায় নেমে এসেছে ট্রেন। এখন কামরার সংখ্যা মাত্র পাঁচটা, গতি তাই আগের চেয়ে অনেক বেশি। চিমনী থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পিছনে।

ডে-কমপার্টমেন্টে ঢুকতেই চোখ কপালে উঠে গেল স্বাতীর। গভর্নরের সোফায় বাদশাহী ভঙ্গিতে বসে আছে রানা। হাতে একটা হুইস্কি ভর্তি গ্লাস। কি করবে বুঝতে না পেরে ইতস্তত করতে শুরু করল স্বাতী। চোখাচোখি হতেও কেউ কথা বলল না। গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে মুচকি হাসল রানা, 'স্বাগতম। বুঝতেই পারছ, রেভারেন্ড কালাহানকে খুঁজতে গেছে সবাই।'

'আর সেই ফাঁকে চোরের মত গভর্নরের চেয়ারে বসে…'

'ভুল হলো, ম্যাডাম,' বলল রানা। 'চেয়ারে বসাটা চুরির মধ্যে পড়ে না।'

রাগে লাল হয়ে উঠল স্বাতীর মুখ, 'না বলে হুইস্কি ঢেলে খাওয়াটাও কি চুরির পর্যায়ে পড়ে না?'

'পড়ে,' বলল রানা। 'যদি ধরা পড়ি। কিন্তু ধরা পড়িনি আমি।'

'পড়োনি মানে? ওই তো দেখতে পাচ্ছি, হুইস্কি খাচ্ছ তুমি।'

'ঢালতে দেখেছ? প্রমাণ করতে পারবে ওই বোতল থেকেই ঢেলেছি?' হাসছে রানা। 'দেখোনি। প্রমাণ করতেও পারবে না, কারণ বোতলে আমার হাতের ছাপ নেই।'

নিঃশব্দে চেয়ে রইল স্বাতী রানার মুখের দিকে। খানিক পর তির্যক ভঙ্গিতে ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করল, 'বুদ্ধিমান!'

'ব্যঙ্গ করছ মনে হচ্ছে?'

'জানতে চাই, কে তুমি?' বলল স্বাতী। 'তোমাকে ঠিক যেন মানাচ্ছে না খুনী হিসেবে, একথা ঠিক।'

'আমি রানা।'

'পেশা?'

'কেন, মার্শাল কি বলেছে শোনোনি? আর একবার না হয় জেনে নিয়ো

ওর কাছ থেকে।'

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছে টের পেল ওরা। চেয়ে রইল দু'জন দু'জনের দিকে নিঃশব্দে। আবার কি কোন অঘটন?

থামল ট্রেন। পরমুহূর্তে আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু সামনের দিকে নয়, এবার পিছন দিকে।

কমপার্টমেন্টে প্রবেশ করলেন কর্নেল বগলে ছড়ি নিয়ে। সাথে মার্শাল, গভর্নর আর জোনাথন। আগের কথার খেই ধরেই সম্ভবত বলে উঠলেন কর্নেল, 'এ না হয়েই যায় না। হংম্যানপাস থেকে রেভারেন্ড শেষ পর্যন্ত উঠতে পারেনি ট্রেনে। আবার পাঁচ মাইল পিছু হটে···!'

কর্নেলের কথা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করল না গভর্নর। একরকম চেঁচিয়েই উঠল, 'সাহস তো কম দেখছি না হে, ছোকরা, তোমার! হুইস্কিটা কি তোমার পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তি যে···'

মাথাটা একদিকে সুন্দর ভঙ্গিতে কাত করে স্বীকার করল রানা, 'বড় ভাল জিনিস, গভর্নর!' হাতের গ্লাসটা দেখিয়ে গ্লাসের ভিতরকার তরল পদার্থটার প্রশংসা করল রানা। 'কাউকে অফার করতে অরাজি হবেন না ভেবে···'

নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে মার্শাল। থাবা মেরে রানার হাত থেকে গ্লাসটা খসিয়ে দিল সে। দূরে গিয়ে পড়ল গ্লাসটা, দু'টুকরো হয়ে গেল সেই সাথে। উঠে দাঁড়াল রানা।

প্রতিবাদ করল মাত্র একজন, 'নিজেকে কি মনে করেন আপনি? কোমরে দুটো পিস্তল গুঁজে হিরো হয়ে গেছেন, ভাবছেন নাকি?'

রানা ছাড়া আর সবাই হতবাক হয়ে চেয়ে রইল স্বাতীর দিকে। কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে আনল মার্শাল টান মেরে। রানার মাথার দিকে তাক করে ক্রূর হাসল।

পলকহীন চোখে চেয়ে আছে রানা পিস্তলটার ট্রিগারের দিকে। এতটুকু নড়ছে না ও। মুখের ভাবে পরিবর্তন নেই চুল পরিমাণ।

রানা ভয় পায়নি দেখে খেপে গেল মার্শাল। পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল সোফার উপর। দাঁত বের করে হেসে ডুয়েলের আমন্ত্রণ জানাল। সাড়া দিল না রানা। সামনে এগিয়ে এসে বিদ্যুৎবেগে বাঁ হাতটা রানার মাথা লক্ষ্য করে চালাল মার্শাল। মাথা নিচু করে ফেলল রানা আধ সেকেন্ড আগে। মার্শালের হাতটা বেরিয়ে গেল ওর মাথার উপর দিয়ে। বসে পড়েছে রানা, বসা অবস্থা থেকেই লাথি মারল ও মার্শালের হাঁটুতে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এমনিতেই তাল হারিয়ে ফেলেছিল মার্শাল। হাঁটুতে লাথি খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল জোনাথন। কোনমতে টেনে তুলে বসিয়ে দিল মার্শালকে একটা সোফায়।

'আহা বেচারা।' জিভ দিয়ে চুক চুক করল স্বাতী রানার দিকে চেয়ে।

'বেচারা বেচারা করছ কেন?' বসে পড়ল রানা, যেন কিছুই হয়নি।

'তোমাকে বলছি না। জানোয়ারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি না আমি কখনও।' হাসল স্বাতী মার্শালের দুরবস্থা দেখে। কৃত্রিম সহানুভূতিও প্রকাশ

করল, তারপর বেরিয়ে গেল প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে। নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল। চিন্তিতভাবে একটুক্ষণ চেয়ে থাকল রানা সেদিকে। উঠে গিয়ে গভর্নরের বোতল থেকে আবার মদ ঢালল নতুন একটা গ্লাসে।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে ট্রেন।

রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে শেষ হর্স ওয়াগনটার দিকে রওনা দিলেন কর্নেল। জোনাথন আর গভর্নরও চলল সাথে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পিছু নিল মার্শালও। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ভারী কোট গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চারজন হর্স ওয়াগনের প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু মাইলের পর মাইল পিছিয়ে চলার পরেও কোন চিহ্ন দেখা গেল না রেভারেন্ডের। আগের জায়গায় ফিরে এসেও কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। ওরা যে নেমে দাঁড়িয়েছিল এখানে, সে-পদচিহ্নগুলোও ঢেকে দিয়েছে তুষার। মিনিট বিশেক খোঁজাখুঁজির পর কোন আশা নেই দেখতে পেয়ে কর্নেল হাত নেড়ে ট্রেন ছাড়ার নির্দেশ দিলেন ক্রিস্টোফারকে, হর্স ওয়াগন থেকে ফিরে এল সবাই আবার ডে-কমপার্টমেন্টে।

সন্দেহে ভারী হয়ে আছে কামরার আবহাওয়া। দৃষ্টি সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে একজন আরেকজনের মুখ থেকে। রানা ছাড়াও এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে হেনরী আর নিগ্রো কুকটা।

ছড়ি বগলে চেপে ধরে ধীরে ধীরে হাত উঠিয়ে কপাল মুছলেন কর্নেল। 'রেভারেন্ড ট্রেনে নেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমরা এখন। কিন্তু গেল কোথায়? কেমন করে? একজন জলজ্যান্ত লোক তো আর বাতাসে মিশে যেতে পারে না।' শ্রোতাদের দিকে চাইলেন কর্নেল।

'কিন্তু রেভারেন্ড পেরেছে,' ভারী গলায় বলল গভর্নর।

'রেভারেন্ড যখন থেকে নিখোঁজ তখন থেকে এ জায়গা ছেড়ে নড়িনি আমি। মিস চৌধুরী সাক্ষ্য দেবে,' রানা বলল।

কথা বলতে যাচ্ছিল মার্শাল কিন্তু হাত উঠিয়ে থামতে বললেন তাকে কর্নেল। রানার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু সন্দেহ করেছ নাকি তুমি, মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ। রেভারেন্ড হারিয়ে যাবার সময় থেকে এপর্যন্ত কোন খাঁড়ির পাশ দিয়ে আসেনি ট্রেনটা, কিন্তু দু'দুটো ছোট্ট ব্রিজ পার হয়ে এসেছে। কোন চিহ্ন ফেলে না রেখেই যে-কোন একটা ব্রিজে হারিয়ে যেতে পারেন তিনি।'

নিজের অবিশ্বাস চাপা দেবার কোন চেষ্টাই করল না জোনাথন। 'অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং থিওরি, রানা। এবার বলো তো, কেন লাফ দেবার শখ হয়েছিল রেভারেন্ডের?'

'লাফ দেননি তিনি, ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে ওঁকে। একজন বলিষ্ঠ লোকের পক্ষে রেভারেন্ডের মত একজন লিলিপুটিয়ানকে ছুঁড়ে দেয়া খুব একটা কষ্টসাধ্য কিছু না। কিন্তু সেই বলিষ্ঠ লোকটা কে? আমি নই। কারণ এ জায়গা ছেড়ে নড়িনি আমি। প্রমাণ করতে পারব। মিস চৌধুরীও নয়। ওর পক্ষে কাজটা অসম্ভব। কিন্তু আপনাদের পক্ষে সম্ভব। আপনারা ছ'জনই বলিষ্ঠ

শক্তিশালী লোক।' বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রানা সবার মুখের দিকে, 'কিন্তু আপনাদের মধ্যে কে?'

'পাগল হয়ে গেছে লোকটা।' বরফের মত ঠাণ্ডা গলা গভর্নরের।

'আমি যুক্তিসঙ্গত কথা বলছি,' বলল রানা। 'এরচেয়ে ভাল যুক্তি আছে কারও?'

কেউ আর কোন টুঁ শব্দ না করায় বোঝা গেল এর চেয়ে ভাল যুক্তি নেই কারও।

'কিন্তু ওর মত ছোটখাট একটা গোবেচারা লোককে খুন করে কার কি লাভ?' কখন কামরায় ঢুকেছে স্বাতী খেয়াল করেনি কেউ।

'জানি না,' বলল রানা। 'ডাক্তার মলিনেক্সের মত হাসিখুশি লোককে খুন করে কার কি লাভ? দুজন নিরীহ ক্যাভালরি অফিসার—ওকল্যান্ড আর নিউয়েলকে সরিয়ে রেখেই বা কার কি লাভ?'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মার্শাল, 'কে বলেছে সরিয়ে রাখা হয়েছে ওদের?'

দীর্ঘ তিনটে মিনিট চুপচাপ থাকল রানা। ভাবল কি যেন মার্শালের দিকে তাকিয়ে। অস্থির হয়ে উঠেছে ঘরের সবাই। আবার কথা বলল রানা, 'তাহলে স্বীকার করছেন আপনি যে সরিয়ে রাখা হয়েছে ওদের? তার মানে আপনিই সেই লোক যাকে খুঁজছি আমরা?'

হঠাৎ লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল মার্শাল। কিন্তু সাথে সাথেই বসে পড়ল হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করে। ক্রুদ্ধ বাঘের মত ফুঁসতে থাকল সে রানার দিকে চেয়ে।

'হয়েছে, হয়েছে, মার্শাল!' বাধা দিলেন কর্নেল।

কথা বলল এবার গভর্নর, 'আমরা কেউ ডাক্তার নই, কাজেই মলিনেক্স কি ভাবে মারা গেছে রানার কথা ছাড়া প্রমাণ নেই কিছু, ক্যাপ্টেন ওকল্যান্ড আর লেফটেন্যান্ট নিউয়েলকে সরিয়ে রাখারও কোন প্রমাণ নেই। আর রেভারেন্ডকে ঠেলে ফেলে—'

'কেউ যদি বিপদের গুরুত্ব বুঝেও ন্যাকা সাজতে চেষ্টা করে তাহলে আমার বলবার কিছু নেই,' বাধা দিল রানা। 'খুনী না হলে নিজেকে কামরায় তালাবদ্ধ করে রাখার পরামর্শ দেব আমি সবাইকে। এর পরে কার পালা এসে পড়বে কে জানে?'

চেয়ে রইল গভর্নর ওর দিকে, 'বাই গড, রানা, তোমার কথা সত্যি না হলে কি হবে জানো?'

'কচু হবে! আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে নিয়ে চলেছেন আপনারা। অথচ আপনাদেরই কোন আইনজ্ঞ মানুষের হাতে লেগে আছে চারজন মানুষের রক্ত। হয়তো শুধু চারজন নয়। সর্বসাকুল্যে চুরাশিজন।'

'চু-রা-শি-জন?' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল গভর্নর।

'তাই, গভর্নর, আমরা এখনও প্রমাণ করতে পারিনি ট্রুপকোচগুলো অ্যাক্সিডেন্টালী ছুটে গেছে কিনা। হয়তো একজন না হয়ে সবাই আপনারা কোন না কোন ভাবে খুনের সাথে জড়িত। খুনগুলো যখন হচ্ছে তখন খুনী

আছেই। আইনের চোখে সব খুনই সমান। একটা কথা স্বীকার করছি, এই সব আইন আর খুনোখুনির সাথে বহুদিন ধরেই জড়িত আছি আমি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল রানা জানালার কাছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তুষার আর বাতাসের বেগ বেড়েই চলেছে ক্রমশ। একটু পরেই নেমে আসবে ভয়াল রাত। চিন্তিত ভাবে জানালায় কনুই রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

পাঁচ

ধীরে ধীরে দাঁড় করাল ট্রেনটাকে ক্রিস্টোফার। ব্রেকটা আটকে নিয়ে তালা দিয়ে দিল। ভারী চাবিটা তালা থেকে বের করে হাত দিয়ে ঘাম মুছল কপালের। চোখ দুটো প্রায় বুজে এসেছে ক্লান্তিতে। রাফার্তীকে বলল, 'হয়েছে?'

'হয়েছে। শেষ হয়ে গেছি আমি!'

'আমিও,' তুষার ঢাকা রাতের অন্ধকারে উঁকি দিল সে ইঞ্জিনরুমের জানালা দিয়ে, 'এসো। কর্নেলের সাথে দেখা করিগে।'

চুল্লির ঠিক যতখানি কাছে বসা সম্ভব ততখানি কাছে বসেছেন কর্নেল। সাথে গভর্নর, জোনাথন, ডেভিড আর স্বাতী। নানান রকম তরল পদার্থ ওদের হাতে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে রানা।

সামনের প্ল্যাটফর্মের দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল ক্রিস্টোফার আর রাফার্তী। তুষার মেশানো এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল ওদের সাথে। ঝটকা মেরে বন্ধ করে দিল দরজাটা ক্রিস্টোফার। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে দু'জনেরই চেহারা। বিরাট এক হাই তুলল ক্রিস্টোফার। সাথে সাথেই ঢাকার চেষ্টা করল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে। গভর্নর আর কর্নেলের সামনে হাই তোলে না সাধারণত কেউ। আবার একটা হাই দমন করে বলল, 'হয়েছে, স্যার। এখুনি শুতে হবে আমাদের।'

'ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি, ক্রিস্টোফার। ইউ.পি. রেলওয়ের হেড অফিসে তোমার নামে রেকমেন্ড করতে ভুলব না আমি। আর রাফার্তী, তোমার জন্যেও গর্বিত আমি।' একটু ভাবলেন কর্নেল, 'আমার বাঙ্কটা ব্যবহার করতে পারো তুমি, ক্রিস্টোফার, আর রাফার্তী, তুমি মেজরেরটা।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' তৃতীয়বার হাই তুলল ক্রিস্টোফার। 'একটা কথা, স্যার। কাউকে জাগিয়ে রাখতে হবে স্টীমটা।'

'জ্বালানি অপচয় করে লাভ কি? আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে দরকারের সময় আবার জ্বালিয়ে নেয়া যায় না?'

'না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ক্রিস্টোফার, 'আবার আগুন জ্বালানো মানে কয়েক ঘণ্টা সময়ের অপচয়। সারাক্ষণ জ্বললে যেটুকু কাঠ পুড়বে তার

চেয়ে বেশি খরচা আবার জ্বালাতে গেলে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ধরুন, আগুনটা নিভে গেল আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কন্ডেন্সার টিউবগুলোর ভেতরের পানি জমে গেল বরফ হয়ে? ফেটে চৌচির হয়ে যাবে টিউবগুলো। এখান থেকে হেঁটে পৌঁছাতে হবে তখন ফোর্টে।'

উঠে দাঁড়াল রানা, 'হয়েছে হয়েছে। হাঁটতে পারব না আমি এতটা পথ। চলে যাচ্ছি।'

'তুমি?' সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়েছে ডেভিডও। মুখটা সন্দেহে ভরা, 'ব্যাপার কি? হঠাৎ সাহায্য করার ইচ্ছে জাগল কেন?'

'সাহায্য? তোমাদেরকে? উঁহুঁ, তা নয়, শুধু নিজের গরজেই কাজটা করতে চাইছি। এ কামরায় তোমাদের সাথে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না আমি। যখনই মনে হচ্ছে আমার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক খুনী রয়েছে তোমাদের মধ্যে, তখুনি বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছমছম করে উঠছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল রানা ক্রিস্টোফারের দিকে। ক্রিস্টোফার চাইল কর্নেলের দিকে। অনুমতিসূচক মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল।

ক্রিস্টোফার বলল, 'ফায়ার-বক্সটায় প্রতি আধঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বালানি ঢুকাবেন। এমনভাবে স্টীম দেবেন যাতে প্রেশার-গজ নীডলটা লাল-নীল দাগদুটোর মাঝামাঝি থাকে। যদি কাঁটাটা লাল দাগ পেরিয়ে যায় সাথে সাথে প্রেশার-গজের পাশের স্টীম রিলিজটা খুলে দেবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল রানা। বাঁকা দৃষ্টিতে ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল মার্শাল। তারপর কর্নেলের দিকে ঘুরল।

'ব্যাপারটা পছন্দ হলো না আমার। ধরুন, ট্রেন থেকে শুধু ইঞ্জিনটা খুলে নিয়ে চলে গেল। কেমন করে আটকাবেন ওকে?'

'এভাবে, মার্শাল!' ভারী চাবিটা বের করে দেখাল ক্রিস্টোফার। 'ব্রেক হুইলটা তালা মেরে দিয়েছি আমি। চাবিটা থাকবে আমার কাছে।'

'না, দাও।' হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল মার্শাল। সন্তুষ্ট চিত্তে বসল সোফায়। হাত বাড়াল গ্লাসের দিকে। পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল মেজর জোনাথন। মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টোফার আর রাফার্তীর দিকে।

'এসো তোমাদের শোবার জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

নিঃশব্দে কামরা ত্যাগ করল তিনজন, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল জোনাথন দ্বিতীয় কোচটার দিকে। ক্রিস্টোফারকে কর্নেলের কমপার্টমেন্টটা দেখিয়ে দিয়ে নিজেরটায় নিয়ে গেল রাফার্তীকে, 'চলবে তোমার এতে?'

'অবশ্যই, স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার।' বিনয়ে বিগলিত রাফার্তী।

চারদিকে চাইছে রাফার্তী সঙ্কোচের সাথে। কাবার্ড থেকে মদের বোতলটা নিয়ে রেখে দিল জোনাথন প্যাসেজ-ওয়েতে, দেখা না যায় এমনভাবে।

'গুড। যাচ্ছি আমি তাহলে।' দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাতে উঠিয়ে নিল বোতলটা। তারপর রওনা দিল কিচেনের দিকে। কার্টেসি দেখাবার [illegible] সামান্য নকটুকু না করে কিচেনে প্রবেশ করল সে। ছোট্ট রুমটা. [illegible] [illegible]

পাঁচ। কাঠে জ্বালানো স্টোভ, পট, প্যান, ক্রকারী আর খাবার রাখার আলমারি রাখার পর সামান্য একটু জায়গা থাকে কুকের নড়াচড়ার জন্যে, চাপাচাপি করে ছোট্ট একটা টুলে বসে আছে হেনরী আর রোলো। জোনাথন প্রবেশ করতে চোখ তুলে চাইল দু'জন।

হাতের বোতলটা ছোট্ট কাজ করার টেবিলে রাখল জোনাথন, 'এটা দরকার তোমাদের। আর কাপড়ের জায়গা থেকে গরম কাপড় খুঁজে নাও। আসছি আমি।' উৎসুক চোখে তাকাল সে চারদিকে, 'তোমাদের কামরাটা ভাল না এর চেয়ে?'

'নিশ্চয়ই ভাল, মেজর।' দাঁত বের করে হাসল রোলো। আঙুল তুলে দেখাল স্টোভটার দিকে, 'কিন্তু সেখানে ও জিনিস নেই। গরম জায়গা বলতে সারা ট্রেনে এই কামরার তুলনা নেই।'

আরেকটা গরম জায়গা হলো ইঞ্জিন রুমটা। সাধারণ অবস্থার চাইতে কয়েক ডিগ্রী ঠাণ্ডা এখন জায়গাটা। বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ফায়ার-বক্সের জ্বলন্ত কয়লার আগুনের উত্তাপকেও নস্যি করে দিয়েছে। তবু যেটুকু উত্তাপ আছে তাতেই চলে যায়। ঠাণ্ডা মোটেই অনুভব করছে না রানা। ফায়ার-বক্সে কাঠ ঠাসতে ঠাসতে কপালে ঘাম জমে উঠেছে ওর।

শেষবারের মত কিছু কাঠ ঠেলে দিল রানা ফায়ার-বক্সের ভিতর। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল স্টীম গজটা। লাল দাগের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে কাঁটা। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতে। বন্ধ করে দিল ফায়ার-বক্সের মুখ। আবছা আঁধার হয়ে গেল ইঞ্জিন রুমটা। হুক থেকে একটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল ও কাঠের স্তূপের দিকে। এখনও তিনভাগের দুভাগ ভর্তি হয়ে আছে জায়গাটা। লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে কাজ আরম্ভ করে দিল ও। একটা একটা করে সরাতে থাকল কাঠগুলো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।

. পনেরো মিনিটের মধ্যেই ঘেমে উঠল রানা। ফায়ার-বক্সের মুখ বন্ধ করে দেয়াতে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কামরাটা। বাঁকা হয়ে কাঠ সরাতে সরাতে ব্যথা শুরু হলো পিঠে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডলে নিল কিছুক্ষণ পিঠটা। এগিয়ে গিয়ে দেখল একবার স্টীম গজের কাঁটাটা। নীল দাগের নিচে নেমে গেছে কাঁটা। ফায়ার-বক্সের মুখটা খুলে কিছু কাঠ ছুঁড়ে দিল ভিতরে। তারপর মুখটা বন্ধ করে দিল আবার। প্রেশার গজের ধারে কাছেও গেল না এবার। ফিরে গেল কাঠ সরানোর কাজে।

আরও গোটা বিশেক কাঠ সরিয়ে থেমে গেল রানা হঠাৎ। লণ্ঠনটা উঠিয়ে নিয়ে এল ভাল করে দেখার জন্যে। একপাশে কাঠের স্তূপের উপর লণ্ঠনটা বসিয়ে দিয়ে আবার সরাল ডজন খানেক কাঠ। তারপর লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে হাঁটুর উপর উবু হয়ে বসল। উঁকি দিল ভিতরে। ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠল ওর মুখটা।

দুজন লোক শুয়ে আছে ভিতরে। মৃত। ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে। আরও কিছু কাঠ সরাল রানা ভাল করে মুখ দুটো দেখার জন্যে। গভীর দুটো

ক্ষত চিহ্ন দুজনের মাথায়। ইউ.এস. ক্যাভালরি অফিসারের পোশাক পরা। একজনের কাঁধে ক্যাপ্টেনের ব্যাজ, অন্যজনের লেফটেন্যান্টের। কোন সন্দেহ নেই—এরাই ক্যাপ্টেন ওকল্যান্ড আর লেফটেন্যান্ট নিউয়েল।

অনেক কষ্টে ক্রোধটা দমন করল রানা। যা দেখার দেখা হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াল। তারপর এক এক করে কাঠগুলো সাজিয়ে রাখল আগের মত। আগের চেয়ে দ্বিগুণ সময় লাগল কাঠগুলো সাজাতে।

কাজ শেষ। স্টীম গজের কাঁটাটায় চোখ বুলিয়ে দেখল নীল দাগের অনেক নিচে নেমে গেছে ওটা। ফায়ার-বক্সের মুখ খুলতে ঝাপটা দিল না আগুনের আঁচ। নিবু নিবু হয়ে এসেছে আগুনটা। কাঠ ঠাসতে লাগল ও আবার ফায়ার-বক্সটা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভরে। তারপর আবার মুখ বন্ধ করে দিয়ে চেক করল স্টীম গজ। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে কোটের কলারটা উঁচু করে দিয়ে হ্যাটটা মাথার উপর টেনে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ইঞ্জিনরুম থেকে বাইরে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস আর তুষার ঘিরে ফেলল ওকে সাথে সাথেই। শিউরে উঠল একবার।

হাঁটতে থাকল রানা ধীরে ধীরে ট্রেনের পিছন দিক লক্ষ্য করে। ডে-কাম-ডাইনিং কোচটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল কিচেন আর অফিসারদের নাইট কোয়ার্টারের কাছে। কোচটার শেষ মাথায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। গড়গড়া করার শব্দটা অস্বাভাবিক লাগছে এই নিঝুম পরিবেশে। ভূতের মত সামনে এগিয়ে গিয়ে সাবধানী চোখ ফেলল রানা দ্বিতীয় কোচটার শেষ মাথায়।

তিন নম্বর কোচটার প্ল্যাটফর্মে—মানে সাপ্লাই ওয়াগনটায় বসে লম্বা করে বোতলে চুমুক দিচ্ছে একজন লোক। প্রচণ্ড তুষার ঝড় থেকে রক্ষা পাবার জন্য এমন ভাবে বসে আছে লোকটা যে খেয়ালই করল না রানাকে। এত কাছে থেকে লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হলো না রানার। হেনরী।

কোচটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। কোটের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। কয়েক পা পিছিয়ে এসে অনেকটা জায়গা অর্ধ চক্রাকারে ঘুরে আবার গিয়ে পৌঁছল সাপ্লাই ওয়াগনটার ঠিক পিছনে। বেশ কয়েক মুহূর্ত কান পেতে রইল। তারপর হাত আর পায়ের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল। মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল উপর দিকে। সাপ্লাই ওয়াগনের আরেক মাথায় বসে আছে দ্বিতীয় লোকটা। অন্ধকারেও ঝিলিক মারছে মাঝে মাঝে সাদা দাঁতের সারি। রোলো।

পৌঁছে গেল রানা প্রথম হর্স ওয়াগনটার পশ্চাৎভাগে। বানরের মত হাত দিয়ে লটকে উঠে গেল ওয়াগনটার ভিতর। বন্ধ করে দিল দরজা এত রাতে অন্ধকারে মানুষ দেখে ঘাবড়ে গেল ঘোড়াগুলো। অস্থির হয়ে উঠে গা ঠোকাঠুকি শুরু করল একটা আরেকটার সাথে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে হাত রাখল রানা প্রথম ঘোড়াটার পিঠে। মৃদু চাপড় দিতেই শান্ত হয়ে গেল ঘোড়াটা। দেখাদেখি সাহস ফিরে পেল অন্যগুলোও।

ওয়াগনের সামনের দিকটায় এগিয়ে গিয়ে দরজার ফোকরে চোখ রাখল রানা। মাত্র কয়েক হাত দূরে বসে আছে রোলো। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল খড়

রাখার বাক্সটার কাছে। অত্যন্ত সাবধানে বিন্দুমাত্র আওয়াজ না করে ঢুকিয়ে দিল হাতটা খড়ের ভিতর। ট্রান্সমিটারটা হাতে ঠেকতেই টেনে বের করে আনল। সেটটা হাতে নিয়ে চলে এল ওয়াগনটার পিছনের দরজার কাছে। সামনে পিছনে একবার উঁকি মেরে দেখে সুট করে নেমে এল মাটিতে—রওনা দিল পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়ে টেলিগ্রাফ পোস্টের দিকে।

পঞ্চাশ গজ যাওয়ার পরই সুবিধা মত টেলিগ্রাফ পোলটা পেয়ে গেল রানা। ট্রেইলিং লিডের মাথা থেকে রবার ছাড়িয়ে আটকে নিল কোমরের বেল্টের সাথে। তারপর উঠতে শুরু করল থাম বেয়ে উপরে।

বরফে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া থামে ওঠা বড়ই কঠিন। কোনমতে মাটি থেকে ফুট তিনেক উঠেই আটকে থাকল সে অসহায় ভাবে। একটা ইঞ্চি এগুতে পারছে না আর। বাধ্য হয়ে নেমে এল আবার মাটিতে। একটু ভেবে ছিঁড়ে ফেলল শার্টের একটা অংশ। দুভাগে ভাগ করল ওটা। পায়ে জড়িয়ে নিল কাপড়ের টুকরো দুটো। পকেট থেকে একজোড়া গ্লাভস বের করে পরে নিল হাতে। আবার চেষ্টা করল ওঠার। এবার উঠতে পারল কোনমতে। পায়ে কাপড়ের টুকরো আর হাতে চামড়ার গ্লাভস থাকায় খুব বেশি পিছলে গেল না। গ্লাভস থাকা সত্ত্বেও উপরে উঠতে উঠতে জমে গেল হাত। পোলের মাথায় আড়াআড়ি ভাবে লাগানো দণ্ডটার উপর উঠে বসল অনেক কষ্টে।

দু'মিনিট ধরে একটানা ঘষার পর কিছুটা অনুভূতি ফিরে এল হাত দুটোয়, ট্রেইলিং লিডটা টেলিগ্রাফের তারে জড়িয়েই নেমে এল নিচে। নামাটা হলো আরও কষ্টকর। এত দ্রুত পিছলে নামল যে মনে হলো পুড়ে গেছে হাত দুটো বরফের সাথে ঘর্ষণে। ট্রান্সমিটারের কাভারটা সরিয়ে দিয়ে ঝুঁকে বসল যতদূর সম্ভব যন্ত্রটার উপর ওটাকে তুষার থেকে বাঁচাবার জন্যে। কল সাইন ট্রান্সমিট করতে শুরু করল এবার রানা।

ঠিক একই রকমের আবহাওয়া ফোর্ট হাম্বোল্ডের আকাশেও। ঝড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া, সেই সাথে অবিরাম তুষার ঝরছে। সিম্পসন, দাগু আর দুজন শ্বেতাঙ্গ বসে আছে কমান্ড্যান্টের অফিসে। কমান্ড্যান্টের চেয়ারে বসে আছে সিম্পসন। হাতে হুইস্কি আর সিগার। শক্ত পিঠওয়ালা একটা কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আছে দাগু। সামনে রাখা মদের গ্লাস ছুঁয়েও দেখছে না। হঠাৎ দরজা খুলে গেল অফিস রুমের। একজন লোক ঢুকল ঘরে। সারা মুখে উদ্বেগের ছাপ।

'টেলিগ্রাফ অফিস! জল্‌দি!' জরুরী কণ্ঠ তার। পরস্পরের দিকে চাইল সিম্পসন আর দাগু। দু'জন একযোগে লাফ দিয়ে উঠে রওনা দিল দরজার দিকে। কার্টার তখন মেসেজটা তৈরি করছে। আরেকজন টেলিগ্রাফ অপারেটর বসে আছে ডেস্কের পিছনে। নাম বুচার। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দাগু। লেখা শেষ করে কাগজের টুকরোটা সিম্পসনের হাতে তুলে দিল কার্টার। মেসেজ পড়ে রাগে লাল হয়ে গেল সিম্পসনের চেহারা।

'গর্দভের দল!' খেঁকিয়ে উঠল সিম্পসন।

স্থির শান্ত গলায় দাগু জিজ্ঞেস করল, 'গোলমাল হয়েছে নাকি কিছু?'

'হয়েছে মানে? শোনো, "ট্রুপ কোচগুলো ধ্বংসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ। প্রত্যেকটা কোচ সশস্ত্র গার্ডে ভর্তি। অ্যাডভাইস।" গর্দভগুলো করছে কি—?'

'মাথা গরম করে কাজ হবে না, সিম্পসন,' বাধা দিল দাগু। 'ভয় পাচ্ছ কেন? আমার লোক তো আছেই, ওদের নিয়ে সাহায্য করব আমি।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সিম্পসন। অনুসরণ করল ওকে দাগু। দরজাটা বন্ধ করে দিল পিছনে। মুহূর্তে দুজন লোক সাদা হয়ে গেল তুষারে।

'কাজটা করবে তুমি? এমন রাতেও?'

মাথা ঝাঁকাল দাগু।

'ঠিক আছে। রওনা হয়ে যাও তাহলে সান রাইজ পাসের উদ্দেশে। খাড়া পাহাড়ের চূড়া, আর অজস্র বিরাট বিরাট পাথরের আশেপাশে আত্মগোপন করতে পারবে সহজেই। আধ মাইল দূরে তোমার ঘোড়াগুলো—'

'কি করতে হবে জানা আছে আমার।'

'সরি! এসো, মেসেজ পাঠিয়ে ক্রিস্টোফারকে জানিয়ে দিই কোথায় তাকে ট্রেন থামাতে হবে।...কাজটা খুব সহজ হবে না, দাগু।'

'জানি। শখে করতে যাচ্ছি না কাজটা। এছাড়া উপায় নেই। আমি একজন যোদ্ধা আর যুদ্ধ করেই বেঁচে থাকতে হবে আমাকে।'

'পুরস্কারটা বিরাট, মনে আছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল দাগু। দুজনেই আবার ঢুকল টেলিগ্রাফ অফিসে। তাড়াতাড়ি একটা মেসেজ লিখে কার্টারের হাতে দিল সিম্পসন।

মেসেজটা পাঠাতে শুরু করল কার্টার, 'সানরাইজ পাসের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথের ঠিক দুশো গজ দূরে ট্রেন থামাতে বলে দাও ক্রিস্টোফারকে।'

পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই ভেসে এল উত্তরটা, 'এখুনি দিচ্ছি।'

নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠল সিম্পসনের মুখ, 'মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছি ওদের, দাগু!'

নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল রানার মুখও। সিম্পসন কি ভাবছে বুঝতে পারল সে পরিষ্কার, কিন্তু একমত হতে পারল না সে ওর সাথে। কান থেকে হেডফোনটা সরিয়ে নিয়ে হেঁচকা টান মেরে ছিঁড়ে আনল টেলিগ্রাফ তারের সাথে আটকানো ট্রেইলিং লিড। ট্রান্সমিটারটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল খাদের দিকে। অন্ধকারে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল যন্ত্রটা। দ্রুতপায়ে আগের মত চক্রাকারে এগিয়ে পৌঁছে গেল ও ইঞ্জিনে। গা-মাথা থেকে তুষার ঝেড়ে নিয়ে চাইল স্টীম গজটার দিকে।

বিপজ্জনক ভাবে নীল দাগের অনেক নিচে নেমে গেছে কাঁটা। ফায়ার-বক্সের মুখ খুলে কাঠ ঢুকাতে শুরু করল রানা। তাড়াহুড়ো নেই এখন আর ওর। ধৈর্য ধরে চেয়ে থাকল স্টীম গজের ক্রমঅগ্রসরমাণ কাঁটার দিকে। ধীরে

ধীরে লাল দাগ ছাড়িয়ে গেল কাঁটাটা। কিন্তু কেয়ার করল না রানা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ভিতরে। একটা তেলের ক্যান আর ক্রিস্টোফারের যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে দুটো রেল-রোড স্পাইক বের করে নিয়ে আবার বেরিয়ে এল বাইরে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে পৌঁছে গেল রানা সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনের প্ল্যাটফর্মের কাছে। রোলো বসে আছে আগের জায়গাতেই, বুরবনের বোতল থেকে গলায় তরল পদার্থ ঢেলে চেষ্টা করছে শরীরটাকে গরম রাখার। নিঃশব্দে পিছিয়ে এল রানা কয়েক পা। সাপ্লাই ওয়াগনটার মাঝামাঝি এসে বসে পড়ল মাটিতে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল ওয়াগনের তলায়। ক্রল করে বগীর তলা দিয়ে পৌঁছে গেল সাপ্লাই ওয়াগন আর হর্স কমপার্টমেন্টের মাঝখানের জয়েন্টের কাছে। অনেক কষ্টে শব্দ না করে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে শুলো।

ঠিক নাকের উপর সাপ্লাই ওয়াগন আর হর্স ওয়াগনের জয়েন্ট কাপলিং। কাপলিংটার উপরেই একটা থেকে আরেকটা ওয়াগনে চলাচলের প্ল্যাটফর্ম। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে বসে আছে রোলোর কালো মূর্তিটা।

অত্যন্ত সাবধানে, যাতে কোনরকম ধাতব শব্দ না হয়, দুটো সেন্ট্রাল কাপলিংকে দুদিক থেকে মুঠো করে ধরে প্যাঁচ খোলার চেষ্টা করল রানা। প্রায় সাথে সাথেই হাত দুটো নামিয়ে নিল, একবারের চেষ্টায়ই বুঝেছে ও, এভাবে একেবারেই অসম্ভব। শূন্য ডিগ্রীর নিচে তাপমাত্রা নেমে যাওয়ায় কাপলিংটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে সমান ভাবে। বেশিক্ষণ ওটাকে মুঠো করে ধরে রেখে মুঠো খোলার চেষ্টা করলেই হাতের চামড়া রেখে আসতে হবে ওখানে। তেলের ক্যানটা উঠিয়ে নিয়ে ঢেলে দিল স্ক্রুগুলোর উপর। হঠাৎ মাথার উপর শব্দ হতেই অত্যন্ত ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল মাটিতে ক্যানটা। তারপর এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ঘাড় বাঁকা করল শব্দের উৎসের দিকে।

বোতল নামিয়ে রেখেছে রোলো প্ল্যাটফর্মের উপর। শব্দটা তারই। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করল সে প্ল্যাটফর্মের উপর। হাতের থাবা দুটো বাড়ি দিতে লাগল নিজের দুপাশে। বেশ কিছুক্ষণ প্রক্রিয়াটা চালু রেখে শরীরে রক্ত সঞ্চালন সহজ করে নিল। তারপর ফিরে গেল আবার বোতলের কাছে।

কাজে হাত দিল আবার রানা। আবার লিঙ্ক দুটোকে মুঠো করে চাপ দিল কিন্তু কাজ হলো না কোন। এক চুলও খুলল না প্যাঁচ। অত্যন্ত ধীরে মুঠো দুটো খুলে নিল লিঙ্ক থেকে, কোটের পকেট থেকে বের করে আনল স্পাইক দুটো। লিঙ্কের তুলনায় স্পাইক দুটো বেশ গরম। এক মিলিমিটার এক মিলিমিটার করে স্পাইক দুটো লিঙ্কের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় দিল। কাজ হলো এবার। মৃদু একটা ক্যাঁচ করে খুলল লিঙ্কটা আধ প্যাঁচ। সাথে সাথে থেমে গেল রানা। চাইল উপর দিকে। এদিকেই চেয়ে আছে রোলো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাবল কিছু। তারপর ঘোড়াগুলোকে একটা গাল দিয়ে মন দিল আবার বোতলে।

ঘোড়াগুলোকে ধন্যবাদ দিল রানা মনে মনে। কাজ শুরু করে দিল আবার, বারবার তেল ব্যবহার করে লিঙ্কগুলোর প্যাঁচ শেষ করে আনল। মাত্র দু'তিনটে কোনমতে লেগে থাকল একটার সাথে আরেকটা। স্পাইক দুটো বের করে এনে বাকি কাজটা সারল হাত দিয়ে। সম্পূর্ণটা খুলে যেতে দুটো অংশ দু'হাত দিয়ে ধরে রাখল, তারপর নামিয়ে আনল ধীরে ধীরে। হাত ছেড়ে দিতে ঝুলে থাকল দুটো অংশ নিচের দিকে খাড়াভাবে।

চাইল আবার রানা একপাশে। আগের জায়গায় বসে আছে রোলো। উপুড় হলো রানা ধীরে ধীরে। তারপর পিছুতে থাকল ক্রল করে। এগোনোর চেয়ে পিছানোটা অনেক বেশি কষ্টকর। ওয়াগনটার মাঝ বরাবর এসে বেরিয়ে এল তলা থেকে। রওনা দিল ইঞ্জিনের দিকে।

ঠিক নীল দাগটার উপরে দাঁড়িয়ে আছে কাঁটাটা। কিছুক্ষণ কাঠ ভরে কাঁটাটাকে লাল দাগের উপর নিয়ে এল আবার। ধপাস করে কোণের একটা বাকেটের উপর বসে চোখ বন্ধ করল রানা।

ঘুমিয়েছে কি ঘুমোয়নি ও বলা অসম্ভব। কিন্তু কেমন করে যেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মেকানিজম সেট করে রেখেছে ও মাথায়। ঠিক সময়মত চোখ খুলে এগিয়ে গিয়ে কাঠ ঠাসছে চুল্লিতে তারপর ফিরে আসছে। ঘড়ি না দেখলেও এক মিনিট এদিক ওদিক হচ্ছে না সময় নির্বাচন। ক্রিস্টোফার আর রাফার্তী যখন জোনাথনকে নিয়ে ইঞ্জিন রুমে উঁকি দিল গভীর ঘুমে তখন রানা। বাকেটটার উপর কুঁজো হয়ে বসে আছে। মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ চোখ মেলে সোজা হয়ে চাইল সে।

'যা ভেবেছিলাম তাই,' ঠাণ্ডা গলার স্বর জোনাথনের। 'কাজ ফেলে ঘুমোনো হচ্ছে!'

মুখে কিছু বলল না রানা। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে স্টীম গজের দিকে নির্দেশ করল। এগিয়ে গিয়ে গজটা পরীক্ষা করল ক্রিস্টোফার।

'অল্প আগে ঘুমিয়েছে, মেজর। ঠিক আছে প্রেশার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চাইল ক্রিস্টোফার কাঠের স্তূপের দিকে। বিশৃঙ্খলার চিহ্ন নেই এতটুকু। আর পরিমাণ মত কাঠই খরচা হয়েছে। পরিষ্কার হাতের কাজ। 'আসলে আগুনের ব্যাপারে সমস্ত অভিজ্ঞতা আছে ওর। লেক ক্রসিং থেকে শুরু করে—'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল জোনাথন, 'চলো, রানা।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘড়ির দিকে চাইল রানা, 'মাঝ রাত। সাত ঘণ্টা ধরে আছি আমি এখানে। তুমি বলেছিলে চার ঘণ্টা।'

'সময়টা প্রয়োজন ছিল ক্রিস্টোফারের। বদলে কি চাই তোমার? অনুগ্রহ?'

'খাবার।'

'সাপার তৈরি করেছে রোলো।' মনে মনে আশ্চর্য হলো রানা। খাবার বানাবার সময় পেল কখন রোলো? 'কিচেনে আছে সে, খেয়ে নাও গিয়ে।'

ট্রেনের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা আর জোনাথন। বেশ কিছুদূর গিয়ে হাত নাড়াল জোনাথন ইঞ্জিনের উদ্দেশে। প্রত্যুত্তরে হাত ঝাঁকিয়ে সাড়া

হয়ে গেল ক্রিস্টোফার ইঞ্জিনের ভিতর। ঘুরে দাঁড়িয়ে ডে-কমপার্টমেন্টের দরজাটা খুলল জোনাথন।

'এসো।'

চোখ দুটো ডলল রানা হাত দিয়ে, 'একটু দাঁড়াব আমি এখানে। ইঞ্জিন রুমে পরিষ্কার বাতাস নেই। সাতটা ঘণ্টা একটানা ছুঁচোর মত বসে ছিলাম আমি ওখানে।'

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল জোনাথন রানার মুখের দিকে। মাথা ঝাঁকাল, তারপর ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। প্যাসেজ-ওয়েতে দাঁড়িয়ে রইল রানা একা।

টান মেরে থ্রটল্‌টা খুলে দিল ক্রিস্টোফার। তুষার ঢাকা রেল লাইনে পিছলে গেল চাকাগুলো। চাপ লেগে গুঁড়ো হয়ে গেল বরফ। ধোঁয়ার মত উড়তে থাকল আশেপাশে। তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ধোঁয়া চাকাগুলো ঘুরতে শুরু করতেই। গ্র্যাব রেইলের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল রানা। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা গেল না কিছুই। কিন্তু ওর মনে হলো সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনে ক্রমশ একটা ফাঁক বড় হয়ে উঠছে। আধ মিনিট পর মোড় ঘুরল ট্রেন। এবার দেখা গেল একটু ভাল করে। স্থির নিশ্চিত হলো রানা। ফাঁক হওয়ার ব্যাপারটা আসলে ওর কল্পনা নয়। দু'তিনশো গজ দূর থেকে হর্স ওয়াগনকে আবছা ভূতের মত লাগছে। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল ভূতের ছায়াটা।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। মৃদু একটা সন্তুষ্টির ছায়া ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে। দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। গভর্নর, কর্নেল রুজভেল্ট, ডেভিড আর জোনাথন বসে আছে স্টোভটার কাছে। হাতে গ্লাস। একটু দূরে কোলের উপর হাত দুটো জড় করে বসে আছে স্বাতী। এক সাথে চোখ তুলে চাইল সবাই। বুড়ো আঙুল তুলে পিছন দিকটা দেখাল জোনাথন রানাকে।

'খাবার আছে কিচেনে।'

'ঘুমোব কোথায়?'

কথা বললেন কর্নেল, 'এখানে, যে কোন একটা সোফায় শুয়ে থাকতে পারো।'

'বাহ্‌। লিকার কেবিনেটের পাশে?' পা বাড়াবার উপক্রম করতেই কর্নেলের হুঙ্কার থামিয়ে দিল ওকে।

'রানা!' ঘুরে দাঁড়াল রানা, 'একটা কথা। মিস চৌধুরী বলেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণ হচ্ছে তুমি দোষী ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করা উচিত না। ইচ্ছে করলে গরম হয়ে নিতে পারো একটু। অবশ্য তার আগে খেয়ে এসো কিচেন থেকে।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।' রওনা হয়ে গেল রানা কিচেনের উদ্দেশে।

প্রায় ঠাসাঠাসি করে দাঁড়াল তিনজন কিচেনটায়। রোলো, হেনরী আর

রানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শেষ করল খাওয়া। গ্লাস হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় ঢালল।

কৈফিয়তের ভঙ্গিতে রোলো বলল, 'খাওয়াটা হয়তো পছন্দ হয়নি আপনার। হতচ্ছাড়া চুলোটার পাশে বসে থেকে থেকে সেদ্ধ হয়ে গেছি।'

'তা হয়। অনেক সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও সেদ্ধ হয় মানুষ,' বলল রানা। রোলোর মিছে কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেছে ওর। রোলোর বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে হাসল। 'চলি।'

ডে-কমপার্টমেন্টের উদ্দেশে রওনা দিল রানা। ঘরে ঢুকে দেখল কেউ নেই কামরাটায়। সবাই চলে গেছে যার যার ঘুমাবার জায়গায়। স্টোভে কিছু কাঠ ঠেলে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে কাউচটায়। চোখের সামনে ঘড়ি এনে সময় দেখল। ঠিক একটা বেজেছে।

ছয়

'ওয়ান ও ক্লক,' বলল সিম্পসন। 'ভোরের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে?'

'ভোরের আগেই ফিরে আসব আমি।' কথাটা বলেই লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল দাগু। পঞ্চাশজন ইন্ডিয়ান ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে ফোর্ট কম্পাউন্ডে। ঘন তুষারে সাদা হয়ে গেছে ঘোড়া আর মানুষ। লাফ দিয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে স্যালুট দেয়ার কায়দায় হাতটা তুলল দাগু। প্রতিউত্তর দিল সিম্পসন, একই ভঙ্গিতে। রশি টেনে ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হলো দাগু গেটের দিকে—পিছন পিছন চলল ওর পঞ্চাশ জন অনুসারী।

চোখ মেলে মাথা ঝাঁকাল রানা। পা দুটো টান টান করে ঘড়িটা চোখের সামনে নিয়ে এল। ভোর চারটে। উঠে পড়ল রানা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে প্যাসেজ-ওয়ে ধরে। ধীরে সুস্থে প্রথম কোচটার শেষ মাথায় পৌঁছুল। ভেজানো দরজার জানালা দিয়ে উঁকি দিল দ্বিতীয় কোচটায়।

মাত্র পাঁচ ফুট দূরে কিচেনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আছে দুটো পা। একটার উপর আরেকটা পা রেখে দোলাচ্ছে লোকটা। জেগে আছে হেনরী।

চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। সরে এল সে প্ল্যাটফর্মের কাছে। প্ল্যাটফর্ম রেইলের উপর উঠে ছাদের কার্নিস ধরল দুহাতে, সামান্য একটা ঝাঁকুনি দিয়েই ডিগবাজি খেয়ে উঠে গেল উপরে। প্রচণ্ড বাতাস। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগোল সে ছাদের মাঝখানের ভেন্টিলেটারগুলো ধরে ধরে। চলন্ত ট্রেনের বরফ ঢাকা পিচ্ছিল ছাদের উপর কাজটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

এক পাশে খাড়া পাহাড়। অন্য পাশে গভীর খাদ। মাঝখান দিয়ে চলছে ট্রেন। বরফে সাদা হয়ে আছে কনিফারের ঝোপগুলো। মাঝে মাঝে পাইন গাছের ডালগুলো প্রায় ছাদের উপরে এসে পড়ছে। দুবার বেঁচে গেল রানা

ডালগুলোর হাত থেকে নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জোরে। দুবারই কি মনে হতে হঠাৎ ঘুরে দেখেছে বিপজ্জনক ভাবে এগিয়ে আসছে ওর দিকে পাইনের ডাল। সাথে সাথে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে ছাদের উপর। একমুহূর্ত দেরি হলেই পড়ে যেত বাড়ি খেয়ে।

এভাবে পৌঁছুল রানা দ্বিতীয় কোচটার শেষ মাথায়। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ধারটায় এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল নিচের দিকে। চমকে উঠল রানা। কান মাথা গরম মাফলারে ঢেকে প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করছে রোলো। আবার ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছিয়ে এল রানা। হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে গিয়ে ক্রল করে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকল সামনের দিকে। দুহাত দুপাশে ডানার মত ছড়িয়ে দিয়ে বজায় রাখল ভারসাম্য।

বিরাট একটা পাইনের ডাল ছুটে আসছে দ্রুতবেগে। দ্বিধা করল না রানা। বুক সমান উঁচু ডালটা কাছে আসতেই খপ করে ধরে ফেলল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না ঠিকমত। একটা হাত পিছলে গেল বরফে। প্রচণ্ড বাড়ি লাগল বুকে। প্রাণপণ চেষ্টায় পেট আর দু'পা ঠেকিয়ে বাঁচল পতনের হাত থেকে। শক্ত করে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আবার। ট্রেনের ছাদটা ওর দু'ফুট নিচে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এক ঝলকের জন্য দেখল মাত্র ফুট তিনেক নিচে পায়চারি করছে রোলো।

পা দুটো সোজা করে ডালটা ছেড়ে দিল রানা। পা পিছলে গিয়ে দড়াম করে আছাড় খেল ছাদের উপর। পড়েই চিৎ হয়ে গেল ট্রেনের ভয়ঙ্কর সম্মুখ গতির জন্য। বুকের ভিতর ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। একটু এদিক থেকে ওদিক হলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে যেত অন্ধকার খাদের তলায়। বিপদ কাটেনি, বুঝতে পারল রানা আছাড় খাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই। টের পেল, ছাদের একেবারে পাশে চলে যাচ্ছে ও ক্রমশ। অন্ধের মত হাত বাড়াল। ভেন্টিলেটারের ঢাকনিটা হাতে ঠেকতেই ধরে ফেলল আঙুল বাঁকিয়ে। ছুটে গেল আঙুলগুলো। সাথে সাথেই ধরতে চেষ্টা করল দ্বিতীয় ভেন্টিলেটারটা অন্য হাতে। এটাও ছুটে গেল। তবে দুবার বাধা পেয়ে কমে গেল গড়ানোর গতি। ঠিক এই সময় চোখে পড়ল ওর তৃতীয় ও শেষ ভেন্টিলেটারটা। পাগলের মত থাবা মারল রানা ডান হাত দিয়ে। দুটো আঙুল আটকে যেতেই জড়িয়ে ধরল বাঁ হাতে। ধরে রাখতে পারল এবার, গড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। অর্ধেকটা শরীর বাইরে ঝুলে আছে। বুঝতে পারছে ও এভাবে ঝুলে থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ। কোনমতে এক হাঁটুর সাহায্যে প্ল্যাটফর্মটার উপর নিয়ে এল নিজেকে। সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনের বেরিয়ে থাকা প্ল্যাটফর্মটার শেষাংশ এটা। ঠিকমত নামতে পারলে পড়বে গিয়ে লাইনের উপর। আরও কয়েক মুহূর্ত ভেন্টিলেটার ধরে ঝুলে থেকে একটু স্থির করে নিল নিজেকে। তারপর ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল আঙুলগুলো।

দম বন্ধ করে পড়ে থাকল রানা কয়েক সেকেন্ড। বুকের কাছ থেকে প্রচণ্ড ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ছে দেহের শিরায় উপশিরায়। মনে হচ্ছে বেশ কয়েকটা রিব ভেঙেছে বুকের। মাথা ঝাড়া দিয়ে ব্যথাটা ভুলবার চেষ্টা করল

রানা। নিজেকে টেনে তুলল কোনমতে পায়ের উপর। বহন করতে চাইছে না পাদুটো দেহের ভার। একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পা বাড়াল সাপ্লাই ওয়াগনের ভিতরে।

ওষুধের বাক্সগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। প্ল্যাটফর্মের দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দেখল ওর নাকের সামনেই পায়চারি করছে রোলো। গা থেকে ভেড়ার চামড়ার কোটটা খুলে ছড়িয়ে দিল দরজার মাঝখানের কাঁচের জানালার উপর। তারপর ওয়াগনের মাঝখানে রাখা বাতিটা জ্বালল। গোটা জানালা ঢাকা পড়ে আছে কোটে। বাইরে আলো যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ছোট্ট একটা ফাঁক দিয়ে যে আলোর রশ্মি বেরুচ্ছে টের পেল না রানা।

একটা স্ক্রুড্রাইভার আর বাটালি কোটের পকেটে রেখে দিয়েছিল রানা ক্রিস্টোফারের টুল বক্স থেকে। ইংরেজীতে 'জরুরী ঔষধ সরবরাহ, ইউ.এস. আর্মি' লেখা একটা কাঠের বাক্সের ডালা খুলে ফেলল সে বাটালি আর স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে। মড় মড় করে শব্দ হলো কাঠের গা থেকে পেরেকগুলো খুলে আসার। কেয়ার করল না রানা। এরকম একটা প্রাগৈতিহাসিক চলন্ত ট্রেনের জং ধরা কলকব্জা থেকে যে কোন রকমের—এমন কি পিস্তল ফাটার আওয়াজ বেরুলেও খেয়াল করা উচিত নয় কারও।

বাক্সের ডালাটা খুলে যেতে ভিতরে চাইল রানা। ঝিলিক দিয়ে উঠল শেলের ধাতব খোসাগুলো বাতির মৃদু আলোকে। কোন পরিবর্তন নেই রানার চেহারায়। সন্দেহ করেছিল সে ব্যাপারটা আগেই।

আরও দুটো বাক্স খুলে একই ফল পেল। ওষুধ নয়, প্রত্যেকটা বাক্স ভর্তি রয়েছে গোলাগুলি দিয়ে। বাক্সগুলোকে ছেড়ে এগিয়ে গেল সে এবার কফিনগুলোর দিকে। সবচেয়ে নিচের সারের ডান দিকের কফিনের ডালাটা সদ্য খোলা হয়েছে বলে মনে হলো ওর। টান মেরে র‍্যাক থেকে বের করে আনল কফিনটা। ঘস্ ঘস্ শব্দ হলো মেঝেতে কাঠের ঘষা লেগে। ধীরে ধীরে ডালাটা খুলল রানা। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। ছোট্ট দেহটা বেঁকে পড়ে আছে কফিনের ভিতর উপুড় হয়ে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। দেখার দরকারও মনে করল না রানা। এত ছোট আর হালকা দেহ সমস্ত ট্রেনে একজন যাত্রীরই ছিল। রেভারেন্ড কালাহান। না ছুঁয়েও বুঝতে পারল সে, বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই মারা গেছে রেভারেন্ড।

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে হাতের বোতলটার দিকে চাইল রোলো। শেষ হয়ে এসেছে। বাকি তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল খালি বোতলটা। চেয়ে থাকল ছুঁড়ে ফেলা বোতলটার দিকে। দুঃখিত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল একবার। তারপর লম্বা জায়গা নিয়ে পায়চারি শুরু করল আবার। হঠাৎ সাপ্লাই ওয়াগনের দরজার উপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল রোলো। পরমুহূর্তে মনের ভুল ভেবে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু আবার দেখা গেল ছোট্ট আলোর রশ্মিটা। এবার পরিষ্কার ভাবে। চোখ বন্ধ করল রোলো একবার—তারপর খুলল। আছে রশ্মিটা এখনও। বিড়ালের মত নিঃশব্দে

এগিয়ে গেল সে সাপ্লাই কোচটার দরজার দিকে। চোখ রাখল ছোট্ট ফাঁকটায়। দরজার দিকে পিছন ফিরে দ্বিতীয় কফিনটার ভিতর তখন তাকিয়ে আছে রানা। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত ঢুকাল রোলো। পাতলা ফলাওয়ালা একটা থ্রোইং নাইফ বের করে আনল পকেট থেকে, ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল অন্ধকারেই।

কয়েক সেকেন্ড রেভারেন্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল রানা কফিনের ডালাটা। ঠেলে ঢুকিয়ে দিল র‍্যাকে আবার। পাশের কফিনটা বের করল টেনে। অসম্ভব ভারী লাগল। তালা আটকানো এটার। কিন্তু বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে বেশিক্ষণ লাগল না তালা খুলতে। ডালাটা উঠিয়ে দিল। সারা গায়ে ভারী করে গ্রীজ মাখানো রয়েছে নতুন উইনচেস্টার রাইফেলগুলোয়। রাইফেলে ঠাসা কফিনটা। অর্থাৎ অস্ত্র এবং গোলা বারুদ…।

হঠাৎ শির শির করে উঠল রানার ঘাড়ের পিছনের চুলগুলো বিপদের গন্ধ পেয়ে। বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল সে।

ছুরি ধরা হাতটা প্রায় মুখের উপর এসে পড়েছে। ধরে ফেলল রানা রোলোর কব্জি। অন্য হাতে ধাক্কা মারল বুকে। একটা বাক্সে ঠোকর খেয়ে পড়ে গেল রোলো। পড়ার আগে ধরে ফেলল ওর বুকে লেগে থাকা রানার হাতটা। হুড়মুড় করে পড়ল রানাও। প্রায় সাথে সাথেই উঠে দাঁড়াল দুজন। ছুরি ধরার কায়দা পরিবর্তন করে ফেলেছে রোলো। ফলাটা ধরেছে এখন ছুঁড়ে দেয়ার কায়দায়। দাঁত বের করে ফেলেছে কুৎসিত হাসিতে। কিছুই করার নেই রানার। মাত্র তিন ফুট দূর থেকে মিস করবে না রোলো। চোখের কোণ দিয়ে বাঁ দিকের কফিনটার উপর বসানো বাতিটার দিকে চাইল রানা। একেবারে পায়ের কাছে। লাথি মেরে বসল হঠাৎ বাতিটায়। সাথে সাথে লাফ মেরে সরে গেল অন্যপাশে। চুরমার হয়ে নিভে গেল বাতিটা। অন্ধকারে ছুরি ধরা একজন লোকের সাথে ধস্তাধস্তি করা আত্মহত্যারই সামিল। ছুটল রানা দরজার দিকে।

সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। একবারও চাইল না পিছন দিকে। ছাদে ছাড়া লুকানোর জায়গা নেই আর এখন। আগের মতই সেফটি রেইল দিয়ে উপরে উঠে গেল ও। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে অপেক্ষা করে রইল। ওর পিছু পিছু রোলো উঠে এলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে হঠাৎ। অথবা ওর অলক্ষ্যে অন্য পাশ দিয়ে নেমে যাবার চেষ্টা করতে পারবে। বেশ কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেল। কিন্তু মাথাটা দেখা গেল না রোলোর। ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারল রানা তখন দেরি হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে চাইল সে পিছন দিকে। তুষারের কণা চোখে পড়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। চোখ মুছে ফেলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকাল সে আবার।

মাত্র দশ ফিট দূরে বসে আছে রোলো। বীভৎস হাসিটা আরও ছড়িয়ে গেছে। ছুরিটা ধরে রেখেছে ছোঁড়ার ভঙ্গিতে। ছোঁড়ার কোন ইচ্ছে দেখা

যাচ্ছে না ওর মধ্যে। আসলে মজা করছে রোলো। মারার আগে বিড়াল যেমন খেলায় ইঁদুরকে তেমনি খেলাচ্ছে। এবারে সত্যিই ভয় পেল রানা।

বসে বসেই আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে রোলো। রোলোর দিকে ঘুরল রানা ধীরে ধীরে। একটা ব্রিজমত এগিয়ে আসছে সামনে। পরিষ্কার বোঝা গেল না তুষারের জন্যে, মনের ভুলও হতে পারে। সময় নেই আর হাতে। ছয় ফুটের মধ্যে এসে গেছে রোলো। অত্যন্ত ধীরে ধীরে ছুরিটা মাথার উপর উঁচু করে ধরল সে। হঠাৎ রানার ডান হাতটা ঝটকা মেরে উঠল উপর দিকে। এক মুঠো বরফ ছুঁড়ে দিল সে রোলোর চোখে মুখে। বরফ ছুঁড়েই লাফ দিল রানা সামনের দিকে। ছুরিটাও ছুটে এসেছে ততক্ষণে রোলোর হাত থেকে। কিন্তু রানার মাথার একচুল উপর দিয়ে ঝিলিক মেরে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সেটা। লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়েই ডান কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল ও রোলোর বুকে। লাগল না ধাক্কাটা ঠিকমত। নড়ে উঠল বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র কাহিল হলো না রোলো এই ধাক্কায়। জড়িয়ে ধরল রানার গলা।

পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, দেহের দিক দিয়েই যে শুধু ওর চেয়ে বড় তাই না, প্রচণ্ড শক্তি আছে রোলোর গায়ে। দুহাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরেছে ও রানার। অনেক চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারল না রানা হাতদুটো ওর গলা থেকে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল রানা। ওকে থামানোর কোন চেষ্টাই করল না রোলো। নিজেও উঠে দাঁড়াল রানার সাথে সাথে।

পিচ্ছিল বরফে ধস্তাধস্তি করতে করতে দুজনেই সরে এসেছে ক্রমশ ছাদের কিনারায়। বাম দিকে তাকাল রোলো। ব্রিজটার উপর দিয়ে চলছে এখন ট্রেন। ব্রিজের নিচে গভীর অন্ধকার খাদ। দাঁতগুলো আবার বের করে ফেলল সে। আর নড়ছে না রানা। হঠাৎ যেন পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। রোলোর আঙুলগুলো আরও চেপে বসল রানার গলায়। হাসি গিয়ে ঠেকল দুই কানে।

রানার এই আকস্মিক নিষ্ক্রিয়তার কারণ যখন বুঝতে পারল রোলো, তখন ওর করার কিছুই থাকল না। কোটের কলার দুটো আচমকা দু'হাতে ধরে বিদ্যুৎগতিতে শুয়ে পড়ল রানা পিছন দিকে। মুহূর্তে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল রোলো ওর উপর। শুয়ে পড়েই পা দুটো বাঁকা করে ফেলল রানা। রোলোর দেহের মাঝ অংশটা পড়ল ওর পায়ের উপর। বিন্দুমাত্র দেরি না করে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে লাথি মারল রানা রোলোর তলপেটে। হঠাৎ সামনের দিকে পড়ে গিয়ে এমনিতেই পুরোপুরি তাল হারিয়ে ফেলেছিল রোলো, লাথি খেয়ে উড়ে চলে গেল রানার মাথার উপর দিয়ে। অসহায়ভাবে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হারিয়ে গেল সে খাদের অন্ধকারে। কলজে কাঁপানো চিৎকারটা ভেসে এল খাদের অনেক নিচ থেকে, যখন বিভীষিকাটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে।

তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে দুটো ভেন্টিলেটার ধরে ফেলল রানা। চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ অন্ধকার খাদের দিকে। বড় বড় শ্বাস নিয়ে গলাটা ডলতে শুরু করল। বুকের ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে আবার চারদিকে। ভেন্টিলেটার ধরে

বরফের উপর শুয়ে থেকে জিরিয়ে নিল কিছুক্ষণ। তারপর সাবধানে নামল আবার সাপ্লাই ওয়াগনটার প্ল্যাটফর্মে। কাজ শেষ হয়নি এখনও। সাপ্লাই ওয়াগনের ভিতর খোঁজাখুঁজি করে আরেকটা বাতি জ্বালল। আরও দুটো ওষুধ লেখা বাক্স খুলল ও। দুটোতেই উইনচেস্টার রাইফেলের অ্যামুনিশন ভর্তি। পঞ্চম বাক্সটা খুলেই রানা পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। আট ইঞ্চি লম্বা সিলিন্ডারের মত জিনিসগুলো ওয়াটার প্রুফ কাগজে মোড়া। বিশেষ ভাবে তৈরি হাত বোমা।

দুটো বোমা পকেটে পুরে বাতিটা নিভিয়ে দিল রানা। জানালা থেকে কোটটা খুলে গায়ে চড়িয়ে উঁকি দিল ভিতর দিয়ে।

রোলোর অন্তিম চিৎকার শুধু একা রানাই নয়, শুনেছিল হেনরীও। কফি বানাতে ব্যস্ত ছিল সে তখন। চমকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল শব্দের কারণ জানতে। সন্দেহজনক কিছু না দেখে আবার ফিরে গিয়েছে কিচেনে।

এখন দেখতে পেল রানা দ্বিতীয় কোচটার পিছনের দরজা খুলে কফির কাপ হাতে বেরিয়ে আসছে হেনরী। দরজাটা পিছনে বন্ধ করে দিয়ে রোলোর খোঁজে চাইল এদিক ওদিক। নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া স্বভাব নয় রোলোর।

অপেক্ষা করল না আর রানা। সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনের দরজা দিয়ে পৌঁছে গেল প্ল্যাটফর্মে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে এবারও চেয়ে থাকল জানালা দিয়ে সাপ্লাই ওয়াগনের ভিতর।

লণ্ঠনটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সাপ্লাই ওয়াগনে ঢুকছে হেনরী। বাম দিকে চেয়েই স্থির হয়ে গেল সে। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ছ'টা গোলা বারুদের বাক্স খোলা পড়ে আছে। বাম হাত থেকে কফির কাপটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে গেল কফিনগুলোর দিকে। দুটো খোলা কফিন উইনচেস্টার রাইফেলে ভর্তি। তৃতীয়টায় শুয়ে আছে রেভারেন্ড। কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক চাইল। ধীরে ধীরে এগোল সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনের দরজার দিকে।

আর কিছু দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। পুরানো কৌশলে উঠে গেল ছাদের উপর।

পিছনের প্ল্যাটফর্মের দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল হেনরী। শূন্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। যা বোঝার বুঝে গেছে সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল সামনের দিকে। ছাদে উঠে উঁকি দিয়ে দেখছিল রানা। হেনরী দৌড় দিতেই ছাদ থেকে নেমে নিঃশব্দ পায়ে ছুটল তার পিছু পিছু।

একের পর এক ছাড়িয়ে গেল হেনরী সব কটা কমপার্টমেন্ট। ডে-কমপার্টমেন্টে পৌঁছে রানা যেখানে শুয়ে ছিল চাইল সেদিকে। উড়ে গেছে রানা। নেই দেখে আবার ঘুরল হেনরী। ভাল করে চাইলে দেখতে পেত দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের ছাদের উপর বসে আছে রানা। ঝড়ের বেগে অফিসারদের স্লিপিং কোচে ঢুকল হেনরী। ছাদ থেকে নেমে দরজায় কান পেতে থাকল

রানা।

'সর্বনাশ হয়েছে, মেজর! জলদি আসুন! ভেগেছে ওরা।' হেনরীর কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'কি যা তা বকছ!' ঘুম জড়িত গলা মেজর জোনাথনের, 'মাথা ঠিক আছে?'

'গেছে! মেজর, গেছে! দুটো হর্সওয়াগন—নেই ওগুলো!'

'হলো কি তোমার? বেহেড মাতাল মনে হচ্ছে! পুরো বোতল...'

'তা হলে তো ভালই হত। এম্যুনিশন আর এক্সপ্লোসিভের বক্সগুলোও ভাঙা হয়েছে। কফিনগুলোও। রোলো নেই। মাসুদ রানাও নেই। কোন চিহ্নই নেই ওদের। একটা চিৎকার শুনেছিলাম কিছুক্ষণ...'

আর শুনল না রানা। স্বাতীর ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেল। তালা বন্ধ দরজায়। প্লাস্টিকের টুকরোটা ব্যবহার করে ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। ঘুমন্ত স্বাতীর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা। ধীরে ধীরে চোখ মেলল স্বাতী। সাথে সাথেই বড় হয়ে গেল চোখ। মুখ খুলল চিৎকার করার জন্যে। কঠিন একটা হাত চেপে ধরল ওর মুখ।

'মারা পড়বে চেঁচালে। কিন্তু আমার হাতে না, ম্যাডাম।' হাতটা তুলে নিয়ে আঙুল তুলল দরজার দিকে। 'তোমার বন্ধুরা...খুঁজছে আমাকে। হাতের নাগালে পেলেই খুন করবে বিনা দ্বিধায়। কিছুক্ষণের জন্যে লুকিয়ে রাখতে পারবে আমাকে?'

'আমি...আমাকে এসব কথা বলার মানে?' ফিসফিস করে বলল স্বাতী।

'তুমি আমার প্রাণটা বাঁচাও। আমি তোমারটা বাঁচাব।'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল স্বাতী রানার মুখের দিকে। তারপর কিছু না বুঝেই ঘাড় কাৎ করল। কোমরের বেল্টের ভিতর দিকের একটা গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে ছোট্ট একটা কার্ড বের করে দেখাল কিছু সে। কিন্তু সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল আর একবার। প্যাসেজওয়ে থেকে কথার শব্দ ভেসে আসছে এখন। বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে বাঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল স্বাতী। সেই মুহূর্তে টোকা পড়ল দরজায়। উত্তর দিল না স্বাতী। ততক্ষণে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে রানা। আবার বাঙ্কে শুয়ে পড়ে এক কনুইয়ের উপর উঁচু হয়ে তিক্ত স্বরে বলল স্বাতী, 'কে?'

'মেজর জোনাথন।'

'ভেতরে আসুন।' দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল জোনাথন। একটু এগিয়ে এল স্বাতীর দিকে।

'এত রাতে কি ভেবে, মেজর?'

'আসামীটা—মানে রানা, মিস চৌধুরী, পালিয়েছে,' মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল জোনাথন।

'পালিয়েছে? স্বপ্ন দেখছেন না তো? এই জঘন্য আবহাওয়ায় এমন বুনো অঞ্চলে পালাবে কোথায়?'

'আমিও তাই ভাবছি, ম্যাডাম। পালাবার কোন পথই নেই। সেজন্যই

ভাবছি ব্যাটা এই ট্রেনেই হয়তো লুকিয়ে আছে কোথাও।'

ঠাণ্ডা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল স্বাতী মেজরের দিকে। 'তাহলে আপনি ভাবছেন আমি…'

বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল জোনাথন, 'না না, মিস চৌধুরী, আমি ভাবছিলাম আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন হঠাৎ করে ও ঢুকে পড়ে…'

'তাহলে নিশ্চয়ই আমার বিছানার নিচে লুকিয়ে রয়েছে সে? নাকি আপনি মনে করেন বাথরুমে ঢুকে বসে আছে?'

ধ্বক করে উঠল রানার কলজেটা বাথরুমের ভিতর। সত্যিই যদি দেখতে আসে জোনাথন বাথরুমের ভিতর?

'মাফ করবেন, ম্যাডাম।'

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনল রানা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে মাথা বের করল বাথরুমের দরজা খুলে। তারপর বেরিয়ে এল।

'চমৎকার!' হাসল রানা। 'সুন্দর হয়েছে অভিনয়টা।'

'বেরোও এখান থেকে! মাথা থেকে পা পর্যন্ত তুষারে ঢেকে আছ তুমি। ঘরের আবহাওয়া জমিয়ে দিচ্ছ। ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছি আমি তোমার জন্যে।'

'তাড়াতাড়ি কাপড় পরে কর্নেলকে ডেকে আনো এখানে। কুইক!'

'তোমার হুকুমে? হুকুম দিচ্ছ কোন্ সাহসে?'

'অনেক জরুরী কাজ আছে আমার, স্বাতী। বুঝতে পারছ না তুমি। তাড়াতাড়ি না করলে মারা পড়বে তুমিও। জলদি যাও। আছি আমি এখানে।'

রানার মুখ দেখে কি বুঝল স্বাতী কে জানে, কিন্তু তর্ক করল না আর। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

স্বাতী বেরিয়ে যেতেই গা থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রানা স্বাতীর বিছানায়।

'রানা! রানা।' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থাকলেন কর্নেল রানার দিকে, 'ফর গডস সেক…' হঠাৎ থেমে গিয়েই কোমরের রিভলভারের দিকে হাত বাড়ালেন কর্নেল।

'খেলনাটাকে যথাস্থানেই রাখুন, কর্নেল,' পরিশ্রান্ত শোনাল রানার গলা, 'পরে ওটাকে ব্যবহার করার সময় পাবেন যথেষ্ট।'

সেই ছোট্ট কার্ডটা কর্নেলের হাতে তুলে দিল রানা। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে কার্ডটা নিলেন কর্নেল। বার দু'তিন পড়ে ফিরিয়ে দিলেন আবার রানাকে। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'মাসুদ রানা…বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স… সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।' আর একটা কাগজ ধরিয়ে দিল রানা কর্নেলের হাতে। কাগজটায় লেখা 'সব রকমের সাহায্য করুন এঁকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে।' নিচে সি.আই.এ. চীফের স্বাক্ষরটা পরিষ্কার চিনতে পারলেন। আগেও দেখেছেন এ স্বাক্ষর তিনি। কিছু যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল কর্নেলের, 'তোমাকে আমি চিনেছি এবার, রানা। সি.আই.এ-র অফিসে দেখেছি আমি

তোমার ছবি। ওদের ফাইলে। বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ সেই স্পাই তুমি! সেই বিখ্যাত...' রানার ধরা পড়ার ব্যাপারটা মনে পড়ে যেতেই কেমন একটু থতমত খেয়ে গেলেন কর্নেল। 'তুমি...মানে তোমাকে কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে...বুঝতে পারছি...'

'আপনি শুধু কার্ড দেখেই বিশ্বাস করে ফেলেছেন ওকে? আর একটু জিজ্ঞাসাবাদ—'

'কোন দরকার নেই, মা। মাসুদ রানার পরিচয় জানার পর ওকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকতে পারে না।' শান্ত শোনাল কর্নেলের গলা।

'কিন্তু, বাঙালী হয়েও জীবনে কখনও ওর নাম পর্যন্ত আমি...'

'আমাদের কথা কখনও কোন কাগজে ছাপা হয় না,' বলল রানা। 'যাকগে, বাজে কথা বলার সময় নেই এখন। আমার ওপর এখন থেকে নির্ভর করতে না পারলে এক কানাকড়ি দামও নেই তোমাদের জীবনের। ট্রেনের প্রত্যেকটা লোক কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খুন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যাবে।' দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটু ফাঁক করল রানা। কান পেতে শুনল কিছু। 'সামনের দিকে ওরা এখন। জলদি এসো।' ফিরে এসে টান মেরে স্বাতীর বিছানা থেকে সাদা বেড-শীটটা তুলে জ্যাকেটের নিচে গুঁজে নিল রানা।

'ওটা কেন?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'পরে বুঝবেন, আসুন এখন।'

'কিন্তু, গভর্নর? ওকে আমাদের সাথে নিয়ে নিলে হয় না?' বলল স্বাতী।

নরম গলায় বলল রানা, 'সম্মানিত গভর্নর যাতে খুন, বিশ্বাসঘাতকতা আর বিদ্রোহে সায় দেয়ার জন্যে কোর্ট থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি না পায় সেদিকে কড়া নজর রাখব আমি।'

পুরোপুরি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাইল স্বাতী রানার দিকে। দরজাটা খুলল রানা আস্তে করে। ডে-কমপার্টমেন্ট থেকে শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত কথাবার্তা। ডে-কমপার্টমেন্টের দরজায় পিঠ দিয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে তখন হেনরী।

'বারাক বেন কানানে দেখেছি আমি ওকে, স্যার। এখন মনে পড়েছে। ওকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছিল আমার,' কাঁপা কাঁপা শোনাল হেনরীর গলার স্বর। 'পাহাড় ঘেরা দুর্গের সমস্ত সৈন্যরাও আটকে রাখতে পারেনি ওকে। বাংলাদেশের সিক্রেট এজেন্ট ও। হলপ করে বলতে পারি আমি।'

'মাই গড! এসপিয়োনাজ এজেন্ট!' ভয়ঙ্কর রকম হিংস্র শোনাল জোনাথনের গলা, 'মানেটা বুঝেছেন আপনি, গভর্নর?'

'ওকে প্ল্যান্ট করা হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। খুঁজে বের করো ওকে, যেভাবেই হোক। খুন করো ওকে, জোনাথন। খুন করো! খুন করো!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে গভর্নর।

'তাই, মেজর। যেভাবেই হোক খুঁজে বের করুন। আর দেরি হয়ে গেলে কারও সাধ্য হবে না, ওকে ঠেকায়। দেখা মাত্র গুলি করার হুকুম দিন। কোন

সন্দেহ নেই, রোলোকে খুন করেছে ও।' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল হেনরী।

'ওরা আমাকে খুন করার কথা ভাবছে,' স্বাতীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল রানা।

পা টিপে টিপে প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল রানা পিছনের প্ল্যাটফর্মের দিকে। অনুসরণ করল ওকে স্বাতী ও কর্নেল। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল রানা ছাদের দিকে। কর্নেল চাইলেন বিস্মিত দৃষ্টিতে। পরমুহূর্তে মাথা ঝাঁকালেন বুঝতে পেরে। রানার সাহায্যে দ্রুত উঠে গেলেন ছাদে। এক হাতে একটা ভেন্টিলেটার ধরে আর এক হাত বাড়ালেন স্বাতীর উদ্দেশে। দ্রুত পৌঁছে গেল তিনজন ছাদে।

'সাংঘাতিক অবস্থা এখানে,' বলল স্বাতী। ভয় পায়নি সে আসলে। 'ঠাণ্ডায় জমে যাব যে!'

'ট্রেনের ছাদ সম্পর্কে বিশ্রী মন্তব্য পছন্দ করি না আমি,' বলল রানা স্বাতীকে, 'যখন ট্রেনে চড়ি বেশির ভাগ সময়ই কাটাতে হয় আমাকে ছাদে। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।'

বিদ্যুৎ গতিতে মাথার এক হাত উপর দিয়ে চলে গেল পাইনের ডালটা। রানা আবার বলল, 'আর যাই হোক, এটা নিরাপদতম জায়গা, যদি সময় মত ছুটে আসা ডালপালাগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে পারো।'

'কি হবে এখন?' ধীর শান্ত কর্নেলের গলা। ব্যাপারটা তিনি উপভোগ করছেন বলে মনে হলো।

'অপেক্ষা করব আমরা। আর শোনার চেষ্টা করব ওদের কথাবার্তা,' চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ভেন্টিলেটারে কান রাখল রানা। কর্নেলও তাই করলেন। হাত বাড়িয়ে স্বাতীকে টেনে নিজের পাশে শুইয়ে দিল রানা।

'ছাড়ো! ধরে রাখতে হবে না আমাকে,' শান্তভাবে বলল স্বাতী।

'এমন রোমান্টিক পরিবেশে,' স্বাতীকে ছাড়ল না রানা, 'কোন মেয়েকে জড়িয়ে ধরে রাখতে বড়ই পছন্দ করি আমি।'

'তাই নাকি?' বরফের মতই ঠাণ্ডা গলা স্বাতীর।

'ট্রেনটার ছাদ থেকে পড়ে যেতে দিতে পারি না আমি তোমাকে। শিভালরি বলে একটা কথা আছে না?' মৃদু হেসে বলল রানা।

ডাইনিং কমপার্টমেন্টের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে জোনাথন, ডেভিড আর হেনরী। সবার হাতেই রিভলভার।

ডেভিড বলল, 'হেনরী যদি সত্যিই চিৎকারটা শুনে থাকে··· দুজনেই হয়তো ট্রেন থেকে—'

ঢাউস বেলুনের মত শরীর নিয়ে যত জোরে দৌড়ানো সম্ভব ঠিক ততটা জোরে ছুটে প্রবেশ করল গভর্নর কমপার্টমেন্টে। ওদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস নেবার চেষ্টা করল।

'স্বাতীও গেছে।'

ঠাণ্ডা অসহনীয় নিস্তব্ধতাটা কাটিয়ে উঠল সবার আগে জোনাথন।

হেনরীকে বলল, 'জলদি দেখো কর্নেল রুজভেল্ট—না, আমি নিজেই যাচ্ছি।'

দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর কর্নেল। উঁকি মেরে দেখল রানা, প্রথম আর দ্বিতীয় কোচটার প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে জোনাথন। কমান্ডিং অফিসারকে ডাকতে যাবার আগে যে পিস্তলটা খাপে ঢুকিয়ে রাখতে হয় সে কথাটাও ভুলে গেছে সে। ভেন্টিলেটারের কাছে ফিরে এল আবার রানা, নিজের অজান্তেই হাত রাখল স্বাতীর কাঁধে। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথায়।

'রোলোর সাথে তোমার ঝগড়া বেধেছিল?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'সামান্য কথা কাটাকাটি। সাপ্লাই ওয়াগনের ছাদে। অসাবধানতায় পা ফসকে পড়ে গেছে বেচারা,' বলল রানা চাপা গলায়।

'রোলো পড়ে গেছে? সেই বিরাট হাসিখুশি লোকটা?' ধড়মড় করে উঠে বসল স্বাতী। 'হয়তো সাংঘাতিক রকম আহত হয়েছে সে। হয়তো এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায়…'

'আসলে মারাত্মক রকম আহত হয়েছে ঠিকই,' বলল রানা নিরাসক্ত ভাবে, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস, এখন আর সে টের পাচ্ছে না কিছু। একটা ব্রিজের উপর দিয়ে চলছিল তখন ট্রেন। গভীর খাদের তলায় হারিয়ে গেছে সে।'

'তুমি ওকে ঠেলে ফেলেছ, রানা!' স্বাতীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর প্রায় বুজে এল, 'খুন করেছ তুমি ওকে!'

'প্রত্যেক লোকেরই নিজের প্রাণ বাঁচাবার অধিকার আছে।' হাতের চাপ বাড়াল রানা স্বাতীর কাঁধে, 'কাজটা না করলে সেই খাদটার তলায় এই মুহূর্তে নিঃসাড় শুয়ে থাকতে হত আমাকে।'

'হুঁ,' কথা বললেন এবার কর্নেল। 'রানা, এরপর কি হবে?'

'ইঞ্জিনে ঠাঁই নেব আমরা।'

'সেখানে আমরা নিরাপদ?'

'একবার ক্রিস্টোফারের হাত থেকে বাঁচতে পারলে আর চিন্তা নেই।'

বুঝতে না পেরে রানার দিকে চাইলেন কর্নেল। মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'হ্যাঁ, কর্নেল। ক্রিস্টোফারের কথাই বলছি।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'তিনজন লোককে খুন করেছে ও। একটু পরেই বিশ্বাস করতে আর অসুবিধে হবে না আপনার।'

'তিন জন?'

'যতটা জানি। আরও বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন কর্নেল। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল ব্যাপারটা ওঁর কাছে, 'তাহলে সশস্ত্র সে?'

'জানি না। হতে পারে। তাছাড়া, রাফার্তীর কাছে আছে রাইফেলটা। ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মালিক হয়ে যেতে পারে অস্ত্রটার।'

'আমরা যাব—টের পাবে না সে?'

'অনিশ্চিত পৃথিবীতে বাস করছি আমরা, কর্নেল।'

'ট্রেনটা দখল করে নিতে পারি আমরা প্যাসেজ-ওয়ে বা দরজার কাছ থেকে। আমার কাছে রিভলভার—'

'কিচ্ছু হবে না। বেপরোয়া লোক ওরা। আপনাকে অপমান করছি না আমি, কর্নেল, কিন্তু ও ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে জোনাথন বা ডেভিডের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবেন না আপনি। আর দখল করতে গেলে গোলাগুলি চলবেই। সেক্ষেত্রে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে ক্রিস্টোফার, ওর ইঞ্জিনের ধারে কাছে ঘেঁষা যাবে না তখন। ট্রেন না থামিয়ে চলে যাবে সে সোজা ফোর্ট হাম্বোল্ডে।'

'তাহলেই তো ভাল। ফোর্ট হাম্বোল্ডে সাহায্য পেয়ে যাব আমরা।'

'মনে হয় না আমার,' সতর্ক করার জন্যে আঙুল তুলল একটা রানা। সাবধানে উঁকি মেরে দেখল প্রথম কোচটা থেকে দ্বিতীয়টায় ঢুকছে জোনাথন। কান রাখল ভেন্টিলেটারে। ভেসে এল জোনাথনের কঠিন গলা, 'কর্নেলও নেই! হেনরী, এখানেই দাঁড়াও তুমি—খেয়াল রাখবে কেউ যেন যেতে না পারে এখান দিয়ে। পিস্তলের আগা দিয়ে দেখবে। গুলি করবে দেখা মাত্র। ডেভিড, গভর্নর—পেছন থেকে শুরু করব আমরা হতচ্ছাড়া ট্রেনটার। প্রতিটা ইঞ্চি খুঁজে দেখতে হবে।'

দ্রুত সামনের দিকে চাইল রানা। কর্নেল চেয়ে থাকলেন পিছন দিকে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে। একটা জিনিস খেয়াল করেননি এতক্ষণ।

'হর্স ওয়াগন দুটো? ওগুলো গেল কোথায়?'

'পরে, কর্নেল।'

'আসলে কি ব্যাপার ঘটছে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারবে, রানা?'

'পরে, কর্নেল।'

নিঃশব্দে ছাদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল তিনজন সামনের দিকে। শেষ মাথায় পৌঁছে নেমে এল রানা প্ল্যাটফর্মে। চোখ রাখল দরজার জানালা দিয়ে। প্যাসেজ-ওয়ের শেষ মাথায়, ডাইনিং কমপার্টমেন্টের দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে সতর্ক ভাবে চারদিক খেয়াল রাখছে হেনরী। ভারী কোল্ট আলগোছে ধরে রেখেছে হাতে।

উপরের দিকে চেয়ে ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। ইঙ্গিতে দেখাল কর্নেল আর স্বাতীকে, নিচে লোক আছে। তারপর নিঃশব্দে নামিয়ে আনল দুজনকে প্ল্যাটফর্মে। হাত বাড়াল রানা কর্নেলের রিভলভারটার জন্যে। মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করে সেটা দিয়ে দিলেন কর্নেল রানাকে। ওদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে উঠে গেল ও সেফটি রেইলে। সেখান থেকে চলে এল ইঞ্জিনের পিছনের অংশে কাঠের গুদামের ছাদে।

ড্রাইভিং উইন্ডো দিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে ক্রিস্টোফার ব্যস্ত ভাবে কাঠ ভরে চলেছে রাফার্তী ফায়ার-বক্সে। আরও কাঠের জন্যে [illegible] দাঁড়াল রাফার্তী। মাথা নিচু করে ফেলল রানা। কাঠ নিয়ে সরে যেতেই উঁচু হলো আবার। নিঃশব্দে ঝুলে নামল ইঞ্জিনরুমের মেঝেতে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ক্রিস্টোফার, পিছনে একটা নড়াচড়ার ছায়া পড়েছে ওর ড্রাইভিং উইন্ডোতে। জানালা থেকে অত্যন্ত ধীরে চোখ সরিয়ে নিয়ে চাইল রাফার্তীর দিকে, সেও চেয়ে আছে ক্রিস্টোফারের দিকে। একসাথে পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়াল দুজন। মাত্র চার ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। কোল্টটা ক্রিস্টোফারের শরীরের মাঝ বরাবর তাক করা।

রাফার্তীর উদ্দেশে রানা বলল, 'রাইফেল উঠানোর চেষ্টা কোরো না। আমার রিভলভার সেটা মোটেই পছন্দ করবে না। এটা দেখো।'

অত্যন্ত ধীরে হাত বাড়িয়ে রানার হাত থেকে কার্ডটা নিল রাফার্তী। ফায়ার-বক্সের উজ্জ্বলতায় পড়ে নিয়েই ফিরিয়ে দিল আবার। সারা মুখে বিস্ময় আর অনিশ্চয়তার ছাপ।

রানা বলল, 'কর্নেল রুজভেল্ট আর মিস চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন প্রথম প্ল্যাটফর্মে। আসতে সাহায্য করো ওদেরকে এখানে। অত্যন্ত ধীরে, রাফার্তী—যদি মাথাটাকে বুলেটের হাত থেকে বাঁচাতে চাও।'

একটু দ্বিধা করে চলে গেল রাফার্তী। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল কর্নেল আর স্বাতীকে নিয়ে। নেমে আসছে ওরা কাঠের গুদামের উপর থেকে। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে কোটের কলার ধরে প্রচণ্ড জোরে ইঞ্জিনরুমে সাইডের দেয়ালে চেপে ধরল রানা ক্রিস্টোফারকে। কোল্টের নলটা গলায় ঠেসে ধরল।

'তোমার পিস্তলটা, ক্রিস্টোফার।'

ক্রিস্টোফারকে দেখে মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। পিস্তলটা গলায় চেপে বসাতে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কথা বলল কোনমতে।

'এসবের অর্থ কি? কর্নেল রুজভেল্ট—!'

প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি মারল ওকে রানা। ডান হাতটাকে মুচড়ে শোল্ডার ব্লেডের কাছে নিয়ে এল। কোল্টের নল দিয়ে খোঁচা মারল পিঠে। এগিয়ে নিয়ে গেল ইঞ্জিনরুমের ডান পাশের দরজায়।

'বেরোও!'

আতঙ্ক দেখা দিল ক্রিস্টোফারের চোখে। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মাঝেও চোখে পড়ল দ্রুত ধাবমান খাড়া খাদগুলো। ভয়ানক জোরে খোঁচা মারল রানা আবার পিস্তলের নল দিয়ে ওর কোমরে, 'বেরো হারামজাদা।'

'টুল বক্স,' ককিয়ে উঠল ক্রিস্টোফার, 'টুল বক্সের নিচে আছে।'

পিছনে সরে এল রানা। ছাড়ল না ক্রিস্টোফারকে, হাতের কোল্টটা দিয়ে ইঙ্গিত করল রাফার্তীর দিকে, 'বের করে নাও।'

কর্নেলের দিকে চাইল রাফার্তী। মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। টুল বক্সের নিচে থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে এগিয়ে দিল রানার দিকে রাফার্তী। ওটা হাতে নিয়ে কর্নেলের রিভলভারটা ফিরিয়ে দিল রানা। মাথা ঘুরিয়ে ইঞ্জিনরুমের পিছনটা দেখালেন রানাকে কর্নেল। সায় দিল রানা।

'বোকা নয় ওরা। বুঝতে দেরি হবে না ওদের যে ছাদে উঠে গেছি

আমরা। সেখানে খুজে না পেলেই পরিষ্কার বুঝে নেবে আর কোথায় থাকতে পারি আমরা।' ঘুরে দাঁড়াল রানা রাফার্তীর দিকে, 'তোমার রাইফেলটা ধরে রাখো হারামজাদার দিকে। নড়তে চেষ্টা করলেই গুলি করবে। সোজা হার্ট বরাবর।'

'আমাকে মারবে?' মুখ বিকৃত করে বলল ক্রিস্টোফার। 'আইন নেই নাকি...?'

সাবধান হবার বিন্দুমাত্র সুযোগ দিল না রানা। লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ বেগে হাত চালাল। হাতের উল্টো পিঠের প্রচণ্ড আঘাতটা লাগল ক্রিস্টোফারের মুখের মাঝ বরাবর। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল সে কন্ট্রোল ইন্স্ট্রুমেন্টগুলোর উপর। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল সাথে সাথে।

'আছে বৈকি আইন!' বলল রানা দাঁতে দাঁত চেপে। 'ওটা এখন আমার হাতে।'

সাত

'ও একজন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। অর্থটা জানা আছে তোমার?' বললেন কর্নেল ক্রিস্টোফারের দিকে তাকিয়ে। 'প্রয়োজনে আইন হাতে তুলে নেবার অধিকার আছে ওদের। যাই হোক, তোমার খেলা শেষ হয়ে গেছে।'

বেজীর মত লম্বাটে মুখটা হিংস্র দেখাচ্ছে ক্রিস্টোফারের।

'বুকে গুলি করবে, মাথায় নয়,' রাফার্তীকে বলল রানা। ঘুরে দাঁড়াল ও। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কর্ড কাঠের স্তূপটার সামনে। ডান ধার থেকে কাঠ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল ও।

কাঠগুলো সরিয়ে সিধে হয়ে একপাশে দাঁড়াল রানা। মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকারটা দমন করল কোন রকমে স্বাতী, ঘুরে দাঁড়াল সে পিছন ফিরে।

'ওকল্যান্ড! নিউয়েল!' বিড় বিড় করছেন কর্নেল বোকার মত রানার দিকে চেয়ে। 'কিন্তু কেন?'

'কিছু একটা দেখে ফেলেছিল ওরা সম্ভবত,' বলল রানা। 'যাই দেখুক, দেখেছিল এই ইঞ্জিনরুমেই। এখানেই খুন করা হয়েছে ওদের।' একটু ভেবে আবার বলল রানা, 'দেখেনি, আমার বিশ্বাস কিছু একটা শুনেছিল ওরা ক্রিস্টোফার সম্পর্কে কারও কাছে। তদন্ত করতে আসে তাই এখানে। আসাটাই ভুল হয় ওদের।'

'কিন্তু একা ক্রিস্টোফার খুন করেনি এদেরকে। তা সম্ভব নয়,' বললেন কর্নেল। 'চার্লসকে শহরে পাঠিয়েছিল ক্রিস্টোফার। তাহলে কে? হেনরী?'

'হেনরী। দুজন মিলে লাশ দুটোকে কাঠ দিয়ে ঢেকে রাখে। চার্লসকে শহরে পাঠাবার কারণও সেটাই। প্ল্যাটফর্ম ভর্তি সিপাইদের চোখে ধুলো দিয়ে লাশ সরানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এদেরকে কিভাবে খুন করা হয়েছে আমি

জানি না। তবে চার্লসকে কেন মরতে হয়েছে তা জানি। বেচারা দেখে ফেলেছিল লাশ দুটো।' কাঠ চাপিয়ে লাশ দুটো ঢেকে ফেলতে শুরু করল আবার রানা। 'মৃতদেহ দুটো দেখে ফেলার পর চার্লসের সাথে খাতির জমায় ক্রিস্টোফার, তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ফেলে। মাথায় শক্ত কিছু দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে, তারপর ঠেলে ফেলে দেয় নিচে।'

'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!' শাসিয়ে উঠল ক্রিস্টোফার। 'কর্নেল, ওকে আপনি থামতে বলুন। ওর একটা কথাও সত্যি নয়। কি বলছে না বলছে কিছুই আমি বুঝতে পারছি না…'

কান দিলেন না কর্নেল তার কথায়। বললেন, 'যা বলার বলে যাও তুমি, রানা। প্রত্যেকটা ঘটনা সম্পর্কে তোমার ব্যাখ্যা শুনতে চাই আমি।'

'ব্যাখ্যা? ব্যাখ্যা না ছাই! একটা কথাও প্রমাণ করতে পারবে না ও!'

'বুঝতেই পারছেন, একা নয় ও। রিটেইনিং নাটে গোলমাল বাধায় ক্রিস্টোফার নিজেই,' বলল রানা, 'যথেষ্ট সময় করে দেয় ও ওদেরই দলের কাউকে রিজ সিটির সাথে যোগাযোগ লাইনটা কেটে দেবার জন্যে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ, 'ওকে আমি স্টীম থ্রটলটা অ্যাডজাস্ট করতে দেখেছি রিজ সিটিতে।'

'প্রয়োজন মত ঢিলে করে রেখেছিল আর কি,' বলল রানা। 'দুটো ট্রুপকোচ আর হর্স ওয়াগনের মাঝের কাপলিংটার তলায় ছোট্ট একটা টাইম বোমা ফিট করে রেখেছিল, হিসেব করে টাইম দিয়ে রেখেছিল যাতে সবচেয়ে খাড়া চূড়ায় ট্রেন ওঠার সময় ফাটে ওটা। ট্রুপকোচ থেকে লাফিয়ে নেমে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা কেউ করেনি, তার কারণ, প্রত্যেকটি দরজায় তালা মারা ছিল। খাদে নেমে বগীগুলো পরীক্ষা করলেই আমার অনুমান সত্য প্রমাণিত হবে। ব্রেকম্যান রিচার্ড—আমার বিশ্বাস, তাকে আগেই খুন করা হয়েছিল।'

'মাথায় ঢুকছে না কিছুই,' বলল স্বাতী। 'এভাবে এত লোককে এরা সবাই মিলে খুন করেছে—কারণটা কি?'

চারটে গুলির শব্দ হলো, একই সাথে শুরু হয়ে গেল ইঞ্জিন রুমের ভিতর বুলেট ছুটোছুটি করার শব্দ। একটা বুলেট ইঞ্জিন রুমের চারদিকের দেয়ালে ঠোকর খেল একবার করে, তারপর বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

'শুয়ে পড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। ক্রিস্টোফার ছাড়া সবাই ডাইভ দিয়ে পড়ল মেঝেতে, কাঠের স্তূপে। কোত্থেকে কে জানে, একটানে আঠারো ইঞ্চি লম্বা একটা রেঞ্চ বের করে আনল ক্রিস্টোফার। ঝিলিক দিয়ে উঠল ক্রিস্টোফারের হাতে। রাফার্তীর মাথার মাঝখানে প্রাণপণ জোরে বসিয়ে দিয়েছে সেটা। একই সাথে রাফার্তীর হাতের রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল কর্নেলের উদ্দেশে, 'নড়েছ কি মরেছ!' কর্নেলের পিস্তলের নল কাঠের স্তূপের দিকে নামানো। রানারটা ওর কোমরের বেল্টে গোঁজা। 'বাঁচতে চাইলে নড়বে না কেউ একচুল!'

নড়ল না ওরা কেউ।

ক্রিস্টোফারকে ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে কর্নেলকে [illegible]

সে, 'ফেলো পিস্তল!'

কর্নেলের হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও। মাথার ওপর হাত তুলে!'

হাত তুললেন কর্নেল মাথার ওপর। রানাও তুলল ধীরে ধীরে। কিন্তু ক্রিস্টোফারের দিকে নয়, সর্বক্ষণ চেয়ে আছে ও রাফার্তীর দিকে। করার নেই আর কিছু, মারা গেছে রাফার্তী। বিমূঢ় দেখাচ্ছে রানাকে। যেন বিশ্বাস করছে না, মৃত্যুটাকে মেনে নিতে পারছে না এখনও।

'এই ছুঁড়ি!' কর্কশ গলায় গর্জে উঠল ক্রিস্টোফার। 'হাত তুলছিস না যে বড়?'

রাফার্তীর দিকে চেয়ে আছে স্বাতীও। দু'চোখে আতঙ্ক। ধীরে ধীরে ক্রিস্টোফারের দিকে তাকাল সে। শিউরে উঠল সর্বশরীর। যন্ত্রের মত হাত দুটো উঠে গেল মাথার উপর। এইমাত্র যেন সচেতন হয়ে উঠল সে পরিস্থিতিটা সম্পর্কে। চকচক করে উঠল চোখ দুটো। ক্রিস্টোফার রানার দিকে তাকাতেই দ্রুত এদিক ওদিক দেখে নিল স্বাতী। ডান হাতটা ধীরে ধীরে বাড়াল সে ঝোলানো লণ্ঠনটার দিকে। চোখের কোণা দিয়ে ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করে চেয়ে রইল রানা ক্রিস্টোফারের দিকে। এতটুকু পরিবর্তন ঘটল না চেহারায়। ইতোমধ্যে লণ্ঠনটা ছুঁই ছুঁই করছে স্বাতীর হাত।

'বেড-শীটটা কেন এনেছ বুঝতে পারছি না, তবে কাজে লাগতে যাচ্ছে এটা,' বলল ক্রিস্টোফার রানাকে। 'র‍্যাকে উঠে দোলাও মাথার ওপর।'

হাতে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে দিল স্বাতী লণ্ঠনটা সামনের দিকে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ক্রিস্টোফার আলোর ঝলকটা ছুটে আসছে ওর দিকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পাশে সরে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু মুখের এক ধারে লাগল সেটা উড়ে এসে। ভারসাম্য নষ্ট হলো এক সেকেন্ডের জন্যে। লণ্ঠনটা ক্রিস্টোফারকে আঘাত করার আগেই নড়ে উঠেছে রানার দেহ। ডাইভ দিয়েছে ও। ওর মাথাটা লাগল গিয়ে ক্রিস্টোফারের পেটের মাঝখানে। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে বয়লারের উপর গিয়ে পড়ল ক্রিস্টোফার। প্রকাণ্ড একটা হিংস্র বিড়ালের মত ছুটে গেল রানা তার দিকে। কলার চেপে ধরে ক্রিস্টোফারের গোটা শরীরটা একটু উপরে তুলল, তারপর প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল বয়লারের গায়ে। একবার, দু'বার, তিনবার! খুলি ফেটে দরদর ধারায় রক্ত নামল ওর গাল বেয়ে। আরও দুটো বাড়ি খেয়েই ঝুলে পড়ল মাথাটা সামনের দিকে। রাগে লাল হয়ে গেছে রানার মুখ চোখ। বাম দিকে চোখ পড়তেই রাফার্তীর মৃতদেহটা দেখতে পেল আবার ও। ফিরল আবার ক্রিস্টোফারের দিকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজার কাছে নিয়ে এল শয়তানটাকে, খোলা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিল বাইরে।

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রথম কোচটার সামনের খোলা প্ল্যাটফর্মের উপর মার্শাল আর জোনাথন। মুহূর্তের জন্যে দেখল ওরা ক্রিস্টোফারের ছুঁড়ে দেয়া শরীরটা। নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। তারপর ফিরে গেল কোচের ভিতর।

ধীরে ধীরে শান্ত হলো রানা। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল চোখ মুখ থেকে। স্বাতীকে বলল, 'কি, মেনে নিতে পারোনি বুঝি কাজটা?'
রানার দিকে চেয়ে ম্লান হাসল স্বাতী, 'এছাড়া আর করার ছিল্টই বা কি?'

ওয়ার কাউন্সিল বসেছে ডে-কমপার্টমেন্টে। গভর্নর স্টোভের দিকে চেয়ে আছে গভীর মনোযোগের সাথে। মাঝে মাঝে হাতটা শুধু নড়ে উঠছে, গ্লাস তুলছে মুখে। 'ভয়ঙ্কর অবস্থা আর কাকে বলে! ওহ্ গড, গড, ওহ্ গড! শেষ হয়ে গেছি আমি, তাই না? হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছি আমি!'
তার এইড মেজর জোনাথন পদমর্যাদা ভুলে হিংস্রভাবে ভেংচে উঠল, 'কেন, সময় থাকতে ভাবনি কেন বিপদের কথা? আমার আর ডেভিডের কথায় রাজি না হলে কি তোমাকে জোর করে দলে টানতাম? ডেভিড যখন ইন্ডিয়ানদের এজেন্ট হবার প্রস্তাব দেয় তখন আপত্তি করোনি কেন? লাভের অর্ধেক শেয়ার পাবে শুনে তো সানন্দে রাজি হয়েছিলে তখন!'
'সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে তা কি জানতাম?' মিন মিন করে বলল গভর্নর। 'তোমরা কি আমাকে বলেছিলে এতসব খুন খারাবির মধ্যে দিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হবে?' জোনাথনের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চটে গেল সে। 'কিন্তু সঙ সেজে তুমিই বা বসে আছ কেন? কিছুই কি করবার নেই তোমার?'
'বুড়ো গাধার মত একনাগাড়ে ডাকছ যে বড়—করার আছেটা কি? তুমিই বলে দাও না? কাঠের গুদামটা কিভাবে সাজানো হয়েছে দেখোনি? ওটা ভেদ করতে হলে কামানের দরকার। ডিঙিয়ে যদি যেতে চাই, ছয় ফিট দূর থেকে গুলি করবে ওরা, মিস হবে না একটা বুলেটও।'
'সামনাসামনি লড়া যাবে না ওদের সাথে,' বলল মার্শাল। 'পেছনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ছাদে উঠে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। একমাত্র ওখান থেকেই যদি কিছু করা যায়। এতেও ঝুঁকি কম নয়।'
'সে ঝুঁকি নেবেটা কে? তুমি? আমি বিশ্বাস করি না,' বলল জোনাথন তিক্ত কণ্ঠে।
নিঃশব্দে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা। কর্নেল চিন্তিত ভাবে কাঠ ঠাসছেন ফায়ার-বক্সে ধীর স্থির ভঙ্গিতে। কাঠের স্তূপের এক ধারে বসে আছে স্বাতী পিছন ফিরে। বরফের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে রানা ওর গায়ে একটা তারপুলিন জড়িয়ে দিয়েছে। পিছন থেকে কেউ আসছে কিনা লক্ষ রাখছে স্বাতী।
ফায়ার-বক্সের মুখ বন্ধ করে সিধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন কর্নেল। দু'কোমরে হাত রেখে বললেন, 'এই কোমরের ব্যথাটাই মারবে আমাকে...'
'না, মারবে আপনাকে ডেভিড, যদি আধ সেকেন্ডের জন্যে অসতর্ক হন,' বলল রানা।
'হোতা তাহলে সে-ই?' কোমর ডলতে ডলতে জানতে চাইলেন

কর্নেল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এফ.বি.আই এবং সি.আই.এ-র তালিকায় অনেকদিন থেকেই ওর নাম আছে। এক কালে সত্যি সত্যি ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল ও। কিন্তু বছর দুই আগে দল পরিবর্তন করেছে।'

'জোনাথন?'

'ওর বিরুদ্ধে রেকর্ড নেই কিছু। তেষট্টি সনে দু'জনের পরিচয় হয় টেরিটরিতে। সেই থেকে বন্ধুত্ব এবং একযোগে পদস্খলন ঘটে ওদের।'

'আর গভর্নর?'

'মেরুদণ্ডহীন আর সাংঘাতিক ধরনের লোভী লোক।'

'অত্যন্ত সন্দেহ প্রবণ মন তোমার, রানা।'

'বেঁচে আছি সেজন্যেই।'

'কিন্তু আমাকে সন্দেহ করোনি কেন?'

'ডেভিডকে সাথে নিতে হবে বুঝতে পেরে অসন্তুষ্ট হন আপনি, তাসের টেবিল থেকে পরিষ্কার সেটা লক্ষ্য করি আমি, তাতেই পরিষ্কার হয়ে গেছেন আপনি। আমি কিন্তু চাইছিলাম এই ট্রেনে আসুক সে। WANTED মার্কা সাজানো নোটিশের মাধ্যমে আমাকে ট্রেনে উঠতে সাহায্য করা হয়েছে ওপর মহল থেকে, গোটা রহস্যটা ভেদ করার জন্যেই।'

'আমাকেও বোকা বানিয়েছ তুমি!' কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা যায় অহমে ঘা লেগেছে কর্নেলের।

'ভুল করছেন, কর্নেল,' বলল রানা। 'কেউ বোকা বানায়নি আপনাকে। ফোর্ট হাম্বোল্ডে কিছু একটা ঘাপলা আছে সন্দেহ করা হয়েছিল আগে থেকেই। এই ট্রেনে ওঠার আগে আমিও আপনার চেয়ে খুব বেশি কিছু জানতাম না।'

'এখন কতটা জানো?'

'রানা!' বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল রানা পিছন থেকে চিৎকারটা ভেসে আসতেই। হাতটা আপনা আপনি চলে গেছে কোমরে গোঁজা রিভলভারের কাছে।

'ম্যাডামের দিকে সই করে ধরে আছি পিস্তল, কাজেই কোনরকম চালাকি নয়, রানা!'

নড়ল না রানা। প্রথম কোচটার সামনের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে মার্শাল। দাঁত বের করে হাসছে সে।

ধীরে ধীরে কোমরের কাছ থেকে হাত নামিয়ে নিল রানা। ডেভিডের কাছ থেকে কয়েক হাত তফাতে আবির্ভাব হলো জোনাথনের। তার হাতেও রিভলভার।

'কি করতে বলো আমাকে তোমরা?' জানতে চাইল রানা চিৎকার করে।

'চমৎকার! সিক্রেট সার্ভিস-ম্যান তাহলে লাইনে এসেছ!' হাসি উপচে পড়ছে মার্শালের কথায়। 'গাড়িটা আগে থামাও।'

থ্রটলটা বন্ধ করে দিয়ে আস্তে করে চেপে ধরল রানা ব্রেক। অকস্মাৎ চোখের পলকে সম্পূর্ণ আটকে দিল চাপ দিয়ে। প্রচণ্ড কান ফাটানো ধাতব আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রুগীর মত কাঁপতে শুরু করল ট্রেনটা, মুহূর্তের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিচ্ছিল বরফ ঢাকা ছাদ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে গেল মার্শাল। প্ল্যাটফর্মের পাশের গ্র্যাব রেইল ধরতে গিয়ে হাতের রিভলভারটা হারাল সে। হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ল পিছন দিকে জোনাথন। এক হাত দিয়ে ভেন্টিলেটারটা ধরে ফেলে ডেভিডের অবস্থা থেকে রক্ষা করল নিজেকে।

'শুয়ে পড়ো!' বলেই ব্রেক ছেড়ে দিয়ে পুরো থ্রটলটা খুলে দিল রানা। পরমুহূর্তে ডাইভ দিয়ে চলে গেল কাঠের স্তূপের আড়ালে।

লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন মেঝেতে কর্নেল। তাঁর পাশেই স্বাতী।

কর্ড কাঠের ব্যারিকেডের উপর দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল রানা।

শব্দ হলো সাথে সাথে গুলির। বুলেটটা গোঁয়ারের মত এ-দেয়ালে ও-দেয়ালে ধাক্কা মারল খানিকক্ষণ। যে দিক থেকে এসেছিল সে দিকেই ছুটে চলে গেল আমার বুমেরাঙের মত।

আবার মাথা উঁচু করল একটু রানা। লম্বা একটা কাঠ হাতে নিয়ে ছাদের উপর লম্বালম্বি ভাবে খোঁচাতে লাগল সামনে পিছনে।

গুলি করার সাহস হলো না আর জোনাথনের। গুলি ফিরে আসাটাও কম বিপজ্জনক নয়। ট্রিগার থেকে আঙুলের চাপ কমাবার আগেই দেখা দিল নতুন বিপদ। লম্বা একটা কাঠ এগিয়ে আসছে তার দিকে। ভেন্টিলেটারটা শক্ত করে চেপে ধরে এক পাশে সরবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পুরোপুরি সরে যাবার আগেই খোঁচা মারল কাঠের আগাটা ওর কাঁধে। পিস্তলটা উড়ে চলে গেল হাত থেকে। যদিও খবরটা জানা হলো না রানার, খুঁচিয়ে চলল ও অবিরাম সামনে পিছনে, তারপর এ-পাশ থেকে ও-পাশ ঝাঁট দেবার মত করে।

আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়েও কিছু করতে পারছে না জোনাথন। বেশ কয়েকটা ঘা খেয়ে বরফ ঢাকা পিচ্ছিল ছাদের উপর দিয়ে অনেক কষ্টে ক্রল করে পিছু হটল সে। শেষ মাথায় পৌঁছে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মার্শাল অনেক আগেই পিস্তল হারিয়ে ঢুকে পড়েছে কেবিনে।

কাঠের গুদামে উঠে দাঁড়াল রানা। ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দেখল, কেউ নেই ছাদে। প্রথম প্ল্যাটফর্মেও নেই কেউ। স্বাতীর দিকে ফিরল ও, 'ব্যথা পেয়েছ?'

হাঁটুর কাছে ডলছে স্বাতী, 'হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলাম।'

কর্নেলের কোটের হাতায় ফুটো দেখে ভ্রূকুটি করল, 'আপনি?'

'ও কিছু না।' কোমরে ছড়ি মারলেন কর্নেল। 'বজ্জাত ব্যথাটা আবার চেগিয়ে উঠেছে বিপদ কেটে যেতেই।'

ফিরে গিয়ে থ্রটলটা ঠিক করে নিল রানা। রাফার্তীর রাইফেলটা তুলে নিয়ে উঠে গেল আবার কাঠের গুদামের ছাদে। ব্যারিকেড তৈরি করতে শুরু

আবার বসেছে ওয়ার কাউন্সিল। হতাশ জেনারেলদের সকলের হাতে একটা করে গ্লাস। এমন কি হেনরীও দূরে দাঁড়িয়ে চুমুক দিচ্ছে হুইস্কির গ্লাসে।

কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠল মার্শাল, 'নতুন আর কোন ধারণা পয়দা হয়নি তোমার মাথায়, মিস্টার গভর্নর?'

'বুদ্ধিটা আমার ছিল, স্বীকার করেছি। কিন্তু কাজটা করতে গিয়েছিলে তোমরা দু'জন। রানার কাছে তোমরা হেরে গেছ সেটা বুঝি আমার দোষ?'

'অনেকগুলো বোমা আছে আমাদের,' বলল হেনরী। 'এক আধটা ছুঁড়ে দিয়ে দেখলে কেমন হয়?'

'আর কিছু বলবার না থাকলে চুপ করে থাকো তুমিও। ট্রেনটা ফিরে যাবার জন্যে দরকার হবে, জানো না?' খেঁকিয়ে উঠল জোনাথন।

অকস্মাৎ টেবিলের একটা বোতল শত টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। সাথে সাথে কান ফাটানো শব্দ হলো রাইফেলের।

গালের উপর থেকে হাতটা চোখের সামনে নামাতেই তাজা রক্ত দেখতে পেল গভর্নর। কাঁচের টুকরো লেগে কেটে গেছে কপাল। ফের শব্দ হলো রাইফেলের। মার্শালের মাথার হ্যাট উড়ে চলে গেল কামরার শেষ কোণায়। আর দেরি না করে চারজনই ঝাঁপ দিল মেঝের উপর। হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল সবাই প্যাসেজ-ওয়েতে, সেখান থেকে ডাইনিং কমপার্টমেন্টে। আরও গোটা তিনেক বুলেট ঢুকল ডে-কমপার্টমেন্টে, কিন্তু ততক্ষণে খালি হয়ে গেছে কামরাটা।

কর্ড কাঠের ব্যারিকেডের উপর থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিল রানা। ফিরে এল ইঞ্জিন রুমে। ট্রেনের গতি আরও একটু বাড়িয়ে দিল। রাফার্তীর লাশটা তুলে শুইয়ে দিল কাঠের স্তূপের উপর। ঢেকে দিল তারপুলিন দিয়ে।

'ওদের ওপর খেয়াল রাখতে যাই আমি, কি বলো?' অনুমতি চাইলেন কর্নেল।

'দরকার নেই। আজ রাতে আর বিরক্ত করার সাহস হবে না ওদের।' কথাটা বলেই কর্নেলের দিকে ঝুঁকল রানা। 'ও কিছু নয়, না?' কর্নেলের বাঁ হাতটা টেনে নিল। কনুইয়ের ইঞ্চি তিনেক নিচে দিয়ে মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। বিশ্রীভাবে রক্ত বেরিয়ে আসছে ক্ষতস্থান থেকে। 'দয়া করে বরফ দিয়ে মুছে দাও হাতটা,' বলল রানা স্বাতীর দিকে ফিরে। 'ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও চাদরটা ছিঁড়ে।' সামনের লাইনের দিকে তাকাল একবার ও। ঘণ্টায় পনেরো মাইলের বেশি নয় এখন স্পীড। আবহাওয়ার যা অবস্থা, এর চেয়ে বেশি জোরে যাওয়া নিরাপদ নয়। ফায়ার-বক্সে কাঠ ঠাসতে আরম্ভ করল রানা।

ব্যথায় উহ্-আহ্ করছেন কর্নেল। ক্ষতস্থানটা মুছতে শুরু করেছে স্বাতী।

'তখন বলছিলে ফোর্টে কোন বন্ধু নেই আমাদের?' ব্যথা ভুলে থাকার জন্যে কথাটা পাড়লেন যেন কর্নেল।

'আছে অল্প কয়েকজন, তবে তারা না থাকারই সামিল। বন্দী করে রাখা হয়েছে ওদের। ফোর্ট এখন সিম্পসনের দখলে। পিউতী ইন্ডিয়ানদের সাহায্য নিয়ে কর্মটি সেরেছে সিম্পসন।'

'ইন্ডিয়ান? এর মধ্যে ওদেরকে আনছ কেন আবার?' মুখ বিকৃত করে জানতে চাইলেন কর্নেল।

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'আপনার কি ধারণা, ডাক্তার কেন মারা গেল? রেভারেন্ডকে কেন মরতে হলো?'

'কেন?'

'মেডিক্যাল সাপ্লাইটা পরীক্ষা করতে যাবে বলেছিল ডাক্তার। সেজন্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে তাকে।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কর্নেল।

'ট্রেনটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও এক ছটাক ওষুধ পাওয়া যাবে না। মেডিসিনের বাক্সগুলোয় মেডিসিন নেই, রাইফেলের গুলিতে সব ভর্তি।'

'কিন্তু রেভারেন্ড, সে কেন...?'

'কে, রেভারেন্ড? কালাহান তার সারা জীবনে ভুলেও কখনও চার্চের ভেতরে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ আছে আমার। গত বিশ বছর ধরে কাজ করছে সে ফেডারেল এজেন্ট হিসেবে। আসার আগে ফাইলে ছবি দেখে এসেছি আমি ওর।'

'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি,' বলল রানা। 'একটা কফিন খুলছে কালাহান, দেখে ফেলে ওরা।'

'কফিন...?'

'হ্যাঁ। আপনি জানেন ফোর্ট হাম্বোল্ডে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে যারা মারা যাবে তাদের লাশ নিয়ে আসার জন্যে যাচ্ছে কফিনগুলো। আসলে, ফোর্ট হাম্বোল্ডে কলেরা লাগেইনি। সব কটা কফিন যাচ্ছে ভেতরে উইনচেস্টার রাইফেলে ভর্তি হয়ে। এগুলোর ভাগ পাবে পিউতী ইন্ডিয়ানরা। এরই লোভে হাত মিলিয়েছে দাগু সিম্পসনের সাথে।'

'এল কোত্থেকে ওগুলো?'

'চুরি করে আনা হয়েছে।'

'কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়, রানা।' ব্যথা ভুলে গেছেন কর্নেল।

'ফ্যাক্টরির বাইরে মাত্র কয়েকজন লোক জানে ব্যাপারটা। মাস চারেক আগে চারশো রাইফেল চুরি হয়ে যায় ফ্যাক্টরি থেকে। ওগুলো শেষ পর্যন্ত কোথায় চলেছে জানি আমরা।'

'কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও!' কর্নেলকে অসহায় দেখাচ্ছে। 'হর্স ওয়াগন—ওগুলোর কি হয়েছে, রানা?'

'খুলে দিয়েছি আমি।'

'সে কি! কেন?'

প্রেশার গজটার দিকে চাইল একবার রানা, 'এক মিনিট, কর্নেল। প্রেশার হারাচ্ছি আমরা।'

আট

তৃতীয় ওয়ার কাউন্সিলটা বসল এবার ডাইনিং রুমে। থম থম করছে ঘরের আবহাওয়া। পুরোপুরি ওয়ার কাউন্সিল আর বলা যায় না এটাকে এখন। প্রায় সারাক্ষণ গভর্নর, জোনাথন আর ডেভিড হুইস্কির পর হুইস্কি টেনে চলেছে। নিরাসক্ত ভাবে স্টোভে কয়লা ভরছে হেনরী।

'কিচ্ছু না? কিচ্ছু ভেবে বের করতে পারছ না তোমরা?' নড়েচড়ে উঠল একটু গভর্নর।

'না,' স্পষ্ট উত্তর দিল জোনাথন।

'পথ নিশ্চয়ই আছে একটা না একটা।'

সোজা হয়ে বসল হেনরী স্টোভের কাছে, 'মাফ চাইছি, গভর্নর। কোন পথ বের করা যাবে না।'

'আহ্! চুপ করো তো তুমি।' ধমক দিল জোনাথন।

হঠাৎ যেন চিন্তাটা ঝিলিক দিয়ে গেল জোনাথনের মাথায়। ধীরে ধীরে বলল সে, 'অস্ত্রশস্ত্রগুলোর কথা জানে রানা, তাই ধরে নিয়েছিলাম আমাদের সব কথাই সে জানে। কিন্তু আসলে তা নয়। সব কথা কেমন করে জানবে সে? কারও জানার কথা নয়। অসম্ভব—আমরা ছাড়া ফোর্টের সাথে কারও বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই।'

'ঠিক আছে, জেন্টলমেন,' বলল মার্শাল। 'রাতটা ভয়ঙ্কর খারাপ। রানাকে ট্রেনটা চালাতে দেয়া ছাড়া কিছু করার নেই আমাদের। বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে ওর মাথায়, কিন্তু বেচারা ঘুণাক্ষরেও জানে না, ট্রেন নিয়ে চলেছে কোন্ বাঘের গর্তে।'

অনেকক্ষণ পর হাসি দেখা গেল গভর্নরের মুখে। বেশ একটু আনন্দিত ভাবেই বলল, 'কথাটা এতক্ষণ ভাবিনি কেন আমি? দাগু! নিশ্চয় খুবই আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবে দাগু রানাকে ফোর্ট হাম্বোল্ডের প্রবেশ মুখে।'

অনেক দূরে চলে এসেছে ততক্ষণ ফোর্ট হাম্বোল্ড থেকে দাগু আর তার দলবল। ক্রমশ বেড়েই চলেছে মাঝখানের দূরত্ব। তুষার ঝরছে এখনও, তবে তত জোরে নয়, বাতাসের বেগও কমে গেছে আগের চেয়ে। দাগুর পিছনে চওড়া বরফ ঢাকা উপত্যকা বেয়ে এগিয়ে আসছে ওর দলবল ঘোড়ার পিঠে চেপে। বাম দিকে মাথাটা একটু কাত করে চাইল দাগু উপর দিকে। বহুদূরে পর্বত চূড়াগুলোর পিছনে কিছুটা ঘোলাটে সাদা হয়ে এসেছে আকাশ। পুব আকাশে আলোর আভাস।

অধৈর্য দাগু ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিল ওর লোকদের দিকে। পুব দিকে আঙুল তুলে দেখাল, ভোর হয়ে আসছে। উপত্যকা দিয়ে দ্বিগুণ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পিউতী ইন্ডিয়ানের দল। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে গন্তব্যস্থানে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। প্রথমে ঘোলাটে দেখাল ছাদের নীলাভ ডিসটেম্পার। বার কয়েক মিট মিট করে পরিষ্কার করে নিল চোখ। মাথার উপর হাত দুটো উঠিয়ে দিয়ে টান টান হয়ে আড়মোড়া ভাঙল। বিচিত্র শব্দ করে হাই তুলল একটা। চিত হয়ে ছিল এতক্ষণ। কুকুরের মত কুঁই কুঁই করে গুটিসুটি মেরে কাত হয়ে ঘুরল ডানদিকে। হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে বিছানা থেকে। পরক্ষণেই শুয়ে পড়ে টেনে নিল চাদরটা আবার গায়ের উপর। একেবারে উলঙ্গ হয়ে আছে ও চাদরের নিচে।

আগাগোড়া ভড়কে গেছে আসলে রানা। কি করবে না করবে বুঝে উঠতে পারল না। রানার দিকে মুখ করে জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ। কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসির আভাস আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। রানার হতভম্ব ভাব দেখে খুক করে একটু কাশলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে।

'তাহলে যা শুনেছি সব সত্যি?' ধমকে উঠলেন বৃদ্ধ। মদের তীব্র গন্ধ সারাটা ঘরে। নাক কুঁচকালেন একটু।

শুয়ে শুয়েই যতটা সম্ভব কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে চেয়ে থাকল রানা বুড়োর দিকে। আর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে থাকল মনে মনে নিজের আর বুড়োর। রাত দুটো পর্যন্ত জেনিকে নিয়ে কাটিয়েছে সে বিছানায়, মদ খেয়েছে। তাও রক্ষে শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে বিদায় করেছিল ঘর থেকে। মাতাল অবস্থায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। এদিকে কোন এক সময় আজরাইলের মত ঘরে ঢুকে বসে আছে বুড়ো। বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয়ই একেবারে লোপ পেয়েছে ব্যাটার, নইলে বয়স্ক ছেলের ঘরে না বলে ঢুকতে নেই এ আক্কেলটুকু পর্যন্ত গুলে খেয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ এ ভাবে চোরের মত না জানিয়ে ঘরে ঢুকেছে কেন বুড়ো? ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্ক! খামোকা আসেনি—নিশ্চয়ই গুরুতর কোন ব্যাপার ঘটেছে কোথাও।

রানার অসহায় অবস্থা দেখে মনে মনে বোধ হয় দয়া হলো রাহাত খানের একটু।

'ঝটপট উঠে পড়ো বিছানা থেকে। মুখ হাত ধুয়ে এসো জলদি,' আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন বৃদ্ধ। জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন একটু।

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দৌড় দিল রানা বাথরুমের দিকে। যাওয়ার পথে হাত বাড়িয়ে মেঝে থেকে প্যান্টটা তুলে নিল এক হাতে। ঝট করে ঢুকে পড়েই দরজা বন্ধ করে দিল বাথরুমের।

চোখের কোণা দিয়ে রানাকে লক্ষ্য করছিলেন বৃদ্ধ। রানা বাথরুমে ঢুকে পড়তেই কঠোরতার মুখোশটা খসে গেল ওঁর মুখ থেকে। সস্নেহ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা। আশ্চর্য একটা মায়া অনুভব করলেন তিনি বুকের মধ্যে। এত লাজুক অসহায় ছেলেটা ওঁর একটা আঙুলের ইঙ্গিতে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না ভেবে গর্ব অনুভব করলেন তিনি। আর একটু বিস্তৃত হলো হাসি। টেরও পেলেন না বাথরুমের দরজার কী-হোলে চোখ রেখে দেখছে তাঁকে মাসুদ রানা।

মাথার উপর শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে ভিজতে লাগল রানা। দাঁতে ব্রাশ চালাচ্ছে আর ভাবছে শুধু ওর অবস্থা পরিদর্শন করতে বা ধমক মারতে নিশ্চয়ই এতদূর উড়ে আসেনি বুড়ো।

ছুটিতে আছে এখন ও। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর হয়ে সঙ্কেত এসেছিল ঢাকা থেকে। নিশ্চিন্ত মনে জুয়া খেলে টাকা কামিয়েছে আর হৈ-হুল্লোড় করেছে বেহায়া আমেরিকান মেয়েগুলোর সাথে। আর আজ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই এ কি ফ্যাসাদ! বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল রাহাত খান ওর হোটেল কামরায়! অবিশ্বাস্য ঘটনা। নিশ্চয়ই জটিল ফাঁদে আটকেছে এবার বুড়ো। ..

শাওয়ার বন্ধ করে গা মুছতে শুরু করল রানা। প্যান্ট পরে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে খালি গায়ে।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখল রানা বিরক্ত ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন মেজর জেনারেল ওর দিকে—যেন বমি করেছে বিড়াল, তাই দেখছেন। স্নেহ-মমতা কাকে বলে যেন জানা নেই তাঁর। একটা আঙুল নেড়ে বসার ইঙ্গিত করলেন রানাকে, তারপর মন দিলেন পাইপে। আধ মিনিট পর মুখ থেকে নামিয়ে বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইলেন পাইপটার দিকে। নিভে গেছে। খট্ করে রাখলেন ওটা পাশের ছোট্ট টিপয়ে। কেশে গলা পরিষ্কার করে ঝুঁকে এলেন রানার দিকে।

'তোমার ছুটিটা ক্যান্সেল করে দিতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, রানা,' দুঃখের চিহ্ন মাত্র নেই আসলে বুড়োর চেহারায়। আরেকবার গাল দিল রানা বুড়োর চোদ্দ পুরুষকে মনে মনে।

'রিজ সিটি আর ভার্জিনিয়া সিটির নাম শুনেছ?' মাথা ঝাঁকাল রানা। শুনেছে। গড় গড় করে বলে চললেন বৃদ্ধ, 'রিজ সিটি থেকে ফোর্ট হাম্বোল্ডে রিলিফ নিয়ে যাবে আগামী পরশু একটা রিলিফ ট্রেন। খবর এসেছে কলেরা লেগেছে ফোর্ট হাম্বোল্ডে। ডক্টর আশরাফ চৌধুরীর নাম শুনেছ? ভূতত্ত্বের অধ্যাপক? তিনিও রয়েছেন ফোর্টে। ওর মেয়ে স্বাতী চৌধুরী যাচ্ছে এই ট্রেনটায়। তোমাকেও যেতে হবে। সন্দেহ করা হচ্ছে...'

সংক্ষেপে জানালেন রাহাত খান সন্দেহের কথাটা।

কাঠ ঠাসা শেষ হতেই চার দিন আগের ঘটনার ছবিটা মন থেকে মুছে গেল রানার। ফায়ার-বক্সের কাছ থেকে সোজা হয়ে উঠে জানালা দিয়ে রানারও

চোখে পড়ল ভোরের আভাস। স্টীম গজটার দিকে মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্টচিত্তে। বন্ধ করে দিল ফায়ার-বক্সের মুখটা। কর্নেল আর স্বাতী দুজনই ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে ইঞ্জিনরুমের দুটো বাকেটের উপর। রানা নিজেও অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছে। কিন্তু জিরোবার সময় নেই। সজাগ থাকতে হবে ওকে প্রতিটি মুহূর্ত।

'হ্যাঁ, হর্স ওয়াগন। খুলে দিয়েছি আমি ওগুলো। কেন? পিউতী ইন্ডিয়ানরা দাগুর নেতৃত্বে আক্রমণ করতে যাচ্ছে ট্রেনটাকে সানরাইজ পাসের কাছে। জায়গাটা সম্পর্কে ধারণা আছে আমার কিছুটা। ওদেরকে ঘোড়া ফেলে প্রায় মাইলখানেক দূরে সরে যেতে হবে জানি আমি। কাজেই দ্বিতীয়বার ঘোড়ার মালিক হতে দিতে চাই না ওদের।'

অন্ধকার হাতড়াচ্ছেন এখনও কর্নেল, 'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম পেছনের ওই শুয়োরগুলোর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে ইন্ডিয়ানরা।'

'তাই করছে। শুয়োরগুলোকে মারতে আসছে না ওরা। আসছে ট্রুপ ট্রেনের মরে যাওয়া সিপাইদের শেষ করতে। কায়দা করে ইন্ডিয়ানগুলোকে ফোর্ট থেকে বের করে আনতে না পারলে জীবনে ঢুকতে পারতাম না ফোর্টে।'

অত্যন্ত সাবধানে বললেন কর্নেল, 'কিন্তু··· কিন্তু এখান থেকে কেমন করে যোগাযোগ করলে?'

'হারানো ট্রান্সমিটারটার সাহায্যে। হারিয়েছিল, কারণ আমিই লুকিয়ে রেখেছিলাম ওটাকে হর্স ওয়াগনের খড়ের গাদায়। যোগাযোগ করেছিলাম রাতে ফোর্টের সাথে। ওরা আমাকে জোনাথন মনে করেছে। আমি জানালাম ওদের—ট্রুপ ওয়াগন ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। ওরা আমাকে নির্দেশ দিল—তাহলে ট্রেনটা থামাতে হবে সানরাইজ পাসের কাছে। বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা?'

'কিন্তু কেন?' ধৈর্য হারিয়ে ফেলল স্বাতী। 'মাত্র কয়েক বাক্স রাইফেল কেড়ে নেয়ার জন্যে ইন্ডিয়ানরা ট্রেন আক্রমণ করতে আসছে? কেন এই হত্যাযজ্ঞ? কেন গভর্নর, জোনাথন, ডেভিড নিজেদের জীবন বাজি ধরেছে, নিজেদের ভবিষ্যৎ···'

'ওই কফিনগুলো ফোর্ট হাম্বোল্ডে খালি পৌঁছুবে না। তেমনি, ওখান থেকে খালি ফিরবেও না।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে ওখানে কলেরা···' বাধা পেয়ে থেমে গেলেন কর্নেল।

'কলেরার চিহ্নও নেই। কিন্তু এমন একটা জিনিস আছে ফোর্টে, যার জন্যে মৃত্যুকেও পরোয়া করে না মানুষ। কখনও মিকি, ফেরার আর ফ্লাড এর নাম শুনেছেন? স্বাতীর বাবা ডক্টর আশরাফ চৌধুরীর সাথে ছিল ওরা।'

ব্যান্ডেজ ভেদ করে চুইয়ে বেরুনো রক্তের দিকে তাকালেন কর্নেল, 'নামগুলো চেনা চেনা ঠেকছে।'

'এই চারজন সানরাইজ পাসের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে, দুর্গম পাহাড়ী

এলাকায় খুঁজে পায় ছোট্ট একটা সোনার খনি। ছোট্ট বললেও খুব ছোট নয়। আমেরিকান ডলারে এটুকুর দাম হবে প্রায় একশো কোটি ডলার। দলপতি ছিলেন আশরাফ চৌধুরী। ফোর্ট হাম্বোল্ডের কমান্ডার কর্নেল জ্যাকসন ছিলেন ডক্টর চৌধুরীর পুরানো বন্ধু। সোনাটা উঠিয়ে ফোর্ট হাম্বোল্ডে এনে রাখা হয়। এত গোপনে আনা হয় যে ওরা চারজন আর কর্নেল ছাড়া কেউ জানত না ব্যাপারটা। ফেডারেল গভর্নমেন্টকে গোপনে জানান কথাটা কর্নেল। ড. চৌধুরী ছাড়া ওঁর দলবলের বাকি তিনজন গায়েব হয়ে যায় একদিন ফোর্ট থেকে। তিন দিন পর পাওয়া যায় ওদেরকে সানরাইজ পাসের এক পাহাড়ের গুহায়। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অমানুষিক কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে ওদের। সিম্পসনের কাজ। একা এত কিছুর ব্যবস্থা সম্ভব নয় বলে এক হাত মিলাল সিম্পসন ইন্ডিয়ানদের সাথে, অপর হাত মিলাল জোনাথন, ডেভিড আর গভর্নরের সাথে। এবার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে না ব্যাপারটা?'

'তাহলে কফিনে করেই এই সোনার তাল বেরিয়ে যেত ফোর্ট থেকে?'

'এর চেয়ে সোজা নিরাপদ পথ আর কি আছে? কলেরায় মরা লাশের কফিন কেউ খুলতে যাবে না। যাবে কেউ, বলুন? দরকারও নেই খোলার। পুরো সামরিক কায়দায় সামরিক সম্মানে গোর দেয়া হবে কফিনগুলো। হয়তো সে রাতেই কবর খুঁড়ে বের করে নেয়া হবে সোনাগুলো। তারপর খালি কফিনগুলো আবার মাটি চাপা দিয়ে দেয়া হবে।'

হতাশভাবে মাথা নাড়লেন কর্নেল, 'যীশুই জানেন আরও ক'জন খুন হবে পিউতীদের হাতে! সিম্পসনও অপেক্ষা করে আছে হয়তো। আর পেছনের ওই শুয়োরগুলো...'

'ভাবনার কিচ্ছু নেই,' মৃদু হাসল রানা, 'চিন্তা করার একটু সময় দিন—কিছু একটা উপায় বেরিয়ে যাবেই।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল স্বাতী রানার দিকে। বাংলাদেশের এক অকুতোভয় যুবকের আত্মবিশ্বাসের নমুনা দেখে গর্বে ভরে উঠল ওর বুক। বাইরের দিকে চাইল স্বাতী। ভোর হচ্ছে।

পানিশূন্য একটা পাথুরে গিরিপথের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রেল লাইনটা। পূর্ব-দক্ষিণে খাড়া পর্বতচূড়া আর ডান পাশে অপেক্ষাকৃত নিচু পর্বতমালা ক্রমশ গিয়ে মিশে গেছে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া নদীটায়। পুরো এলাকাটাই ঘোড়া চালানোর অনুপযোগী। উপত্যকা থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে পাইনের বন ছাড়া লুকানোর জায়গা নেই কাছেপিঠে। এটাই সানরাইজ পাস। পাইনের বনটার শেষ সীমায় রাশ টেনে ঘোড়া থামাল দাণ্ড। একটা হাত তুলে সঙ্গীদের ইঙ্গিত করল দাঁড়াবার।

আঙুল তুলে দেখাল পাথুরে উপত্যকাটা, 'ওইখানে দাঁড়াবে ট্রেনটা। পায়ে হেঁটে পৌছুতে হবে আমাদের ওখানে।' দুজন লোককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ঘোড়াগুলোর সাথে থাকবে তোমরা। বনের আরও ভেতরে নিয়ে যাও ওগুলোকে, ট্রেন থেকে কোনমতেই যেন দেখা না যায়।'

*

ট্রেনের ডাইনিং কমপার্টমেন্টে স্টোভের পাশে বসে ঝিমুচ্ছে হেনরী। গভর্নর, জোনাথন আর ডেভিড চেয়ারে বসে আছে। টেবিলের উপর হাত বিছিয়ে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে সব কজন। ইঞ্জিনের ফুটপ্লেটে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা। ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই ওর চোখে। এখনও তুষার পড়ছে, দৃষ্টি পথ আচ্ছন্ন। পুরোপুরি জেগে আছে স্বাতীও। নতুন করে বেঁধে দিচ্ছে সে আবার কর্নেলের জখম হাতটা। কর্নেলের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা।

'এগিয়ে আসছে সানরাইজ পাস। বড়জোর দু'মাইল হবে আর। ওই যে বিরাট পাইনের বনটা দেখছেন?' মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'ওখানেই ঘোড়াগুলোকে লুকাবে ওরা। গিরিপথটার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে ইন্ডিয়ানগুলো।' রাফার্তীর রাইফেলটার দিকে দেখাল রানা। কর্নেলের হাতেই আছে অস্ত্রটা, 'ঘোড়ার পাহারায় লোক থাকবে নিশ্চয়ই। বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়া চলবে না।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। মুখে বললেন না কিছুই। মুখটা রানার মতই স্থির নিশ্চিন্ত এখন।

ডান পাশের খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা বিরাট পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে দাগু আর তার একজন সঙ্গী। পুব দিকের প্রবেশ মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরা। হালকা তুষার ভেদ করে যতদূর দেখা যায় জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। দাগুর দলবল পজিশন নিয়েছে লাইনের দুই পাশে। একটা হাত রাখল দাগু সঙ্গীর কাঁধে। ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল লোকটা, তারপর কান পেতে শোনার চেষ্টা করল কিছু। বহুদূর থেকে মৃদু কিন্তু পরিষ্কার লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসছে। মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা সাঙ্কেতিক শব্দ করল দাগু দলবলের উদ্দেশে।

সবাই প্রস্তুত।

কোটের পকেট থেকে বোমা দুটো বের করল রানা। এ দুটোই নিয়েছিল সে গত রাতে সাপ্লাই ওয়াগন থেকে। সাবধানে একটা রাখল টুল বক্সের ভিতরে আর একটা হাতের তালুতে। অন্য হাত দিয়ে আস্তে করে বন্ধ করে দিল থ্রটলটা, প্রায় সাথে সাথেই কমে যেতে থাকল ট্রেনের গতি।

লাফ মেরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল জোনাথন, ছুটে গেল জানালার কাছে। হাত দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে বাইরে তাকাল। প্রায় সাথে সাথেই ঘুরে দাঁড়াল ডেভিডের দিকে।

'ওঠো! জলদি! থামছে ট্রেন। বলতে পারো কোথায় আমরা?'

'সানরাইজ পাস!' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল দুজন দুজনের দিকে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল গভর্নর, তারপর উঠে এল জানালার কাছে। বিড় বিড় করে বলল সে, 'কি হবে এরপর?'

ট্রেনটা পুরোপুরি থেমে দাঁড়াতেই হাতের বোমাটার পিন খসিয়ে নিল রানা

কুউউ!

দাঁত দিয়ে।

একমুহূর্ত বিবেচনা করল কিছু, তারপর ডান পাশের দরজা দিয়ে সাঁই করে ছুঁড়ে দিল বাইরে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাম পাশের দরজাটার দিকে এগিয়ে গেছেন কর্নেল।

হঠাৎ জানালার পাশ থেকে লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়ল জোনাথন, ডেভিড আর গভর্নর; একই সাথে, চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানিটা দেখা যেতেই। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে থর থর করে কেঁপে উঠল কামরাটা। আধ মিনিট চুপচাপ পড়ে থেকে ফেটে যাওয়া কাঁচের জানালার ফাঁক দিয়ে আবার উঁকি দিল ওরা। কিন্তু ততক্ষণে ইঞ্জিন থেকে লাফিয়ে নেমে কায়দামত একটা পাহাড়ের ফাটলের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন কর্নেল। স্বাতীর বিছানার সাদা চাদরটায় আগাগোড়া শরীর মুড়ে নিয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন তিনি সাদা বরফের মধ্যে। স্থির হয়ে বসে থাকলেন তিনি সেখানেই। পুরোপুরি থ্রটলটা খুলে দিল আবার রানা।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে দাগু। কি হলো, কেন হলো, পরিষ্কার বুঝতে না পেরে অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'আসলে আমাদের বন্ধুরা সাবধান করে দিল আমাদেরকে। দেখো, চলতে শুরু করেছে আবার ওরা।'

'হ্যাঁ। তাইতো দেখা যাচ্ছে,' বলল একজন। হঠাৎ কয়েকজন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে আরম্ভ করল, 'ট্রুপ ওয়াগন! সোলজার ওয়াগন! নেই ওগুলো!'

'শুয়ে পড়ো! গর্দভের দল!' চেঁচিয়ে উঠল দাগু। নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে সে মুহূর্তেই। আত্মবিশ্বাসের ভাবটা চলে গেছে মুখ থেকে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সানরাইজ পাসে প্রবেশ করেছে ট্রেনটা। ইঞ্জিনের পিছনে রয়েছে মাত্র তিনটে বগী।

জোনাথনের অবস্থাও দাগুর মতই। কথা বলল সে অন্যজগৎ থেকে, 'কেমন করে জানব কি করছে লোকটা? পাগল হয়ে গেছে নাকি ব্যাটা?'

'জানা দরকার কি করতে চাইছে ও,' বলল গভর্নর।

হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা দিল ডেভিড গভর্নরের হাতে, 'নিজেই দেখুন না চেষ্টা করে, কারণটা বের করা যায় কিনা?'

খপ্ করে ধরল গভর্নর পিস্তলটা, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে যেন, 'তাই যাব! দাও। তাই যাব!'

পিস্তলটা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল সে প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে। শেষ মাথায় পৌঁছে একটু ফাঁক করল প্ল্যাটফর্মের দরজা। সাথে সাথেই মাথার আধ-হাত উপর দিয়ে চলে গেল গুলিটা। কান ফাটানো আওয়াজ হলো কোল্টের। ঝট্‌কা মেরে বন্ধ করে দিল গভর্নর দরজাটা। পড়িমরি করে দৌড় দিল পিছন দিকে, হাঁপাতে হাঁপাতে ডাইনিং রুমে ঢুকে ধপাস করে বসে পড়ল আগের জায়গায়।

'কি, কারণটা জেনে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

কিছুই বলল না গর্ভনর, পিস্তলটা টেবিলে রেখে দিয়ে ঢক ঢক করে মদ ঢালল গলায়।

ইঞ্জিনরুমে স্বাতীকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'চোর এসেছিল?'

'গভর্নর,' চোখের সামনে এনে ধূমায়মান কোল্টের নলটার দিকে চেয়ে থাকল স্বাতী।

'গুলি খেয়েছে?'

'না।'

'হাসালে!' হা হা করে হাসল রানা গলা ফাটিয়ে।

পুরোপুরি সাদা ক্যামোফ্লেজের আড়ালে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে থাকলেন কর্নেল উল্টো দিকে। সাবধানী দৃষ্টি রেখেছেন চারদিকের পাহাড়গুলোর মাথায়। প্রায় মাইল খানেক দূরে চলে গেছে ট্রেনটা ততক্ষণে, সানরাইজ পাসের একেবারে ভিতরে। সামনে ছড়িয়ে আছে মরা নদীটা। কিন্তু কোন নড়াচড়ার আভাস নেই কোথাও। উপত্যকাটা ছাড়িয়ে পাইনের বনের দিকে তাকালেন কর্নেল। রানা বলেছে ঘোড়াগুলোকে লুকিয়ে রাখা হবে ওখানেই। রানার জাজমেন্টের উপর কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেননি কর্নেল। ভুল হবে না রানার, বুঝে গেছেন তিনি। নদীটার পাশ দিয়েই চলে গেছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। যদি কোনমতে ওখানটায় পৌঁছতে পারেন তাহলে পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে চলে যেতে পারবেন পাইনের বন পর্যন্ত। রেল লাইনটা পার হওয়াই সবচেয়ে বিপজ্জনক। হাজার হলেও সৈনিক তিনি। কারও চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে সরে পড়া যায় জানা আছে ওঁর। ঘোড়ার কাছে লোক আছে, ওরাও হয়তো তাকিয়ে আছে এদিককার ঘটনাবলীর দিকে। অবশ্য ওদের মনোযোগ থাকার কথা ট্রেনের দিকে, ভাবলেন কর্নেল। সবচেয়ে বড় কথা, মাত্র ভোর হয়েছে এখন, আর বরফ পড়াও থামেনি। দ্বিধা করলেন না তিনি, বেশি দেরি হয়ে গেলে খোলা থাকবে না কোন পথ শেষ পর্যন্ত। হাঁটু আর কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে বিরাট একটা শ্বেত ভালুকের মত এগুতে শুরু করলেন।

হাত দিয়ে থ্রটল আর একটু নাড়ল রানা। কাঠের গুদামের উপরের অবজারভেশন পোস্ট থেকে ঘুরে চাইল ওর দিকে স্বাতী, 'থামাচ্ছ?'

'গতি কমাচ্ছি,' ডান পাশের দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করল ওকে রানা, 'ওখান থেকে নেমে এসে শুয়ে পড়ো।'

দ্বিধাগ্রস্তভাবে নেমে এল স্বাতী, 'গোলাগুলি চলতে পারে নাকি আরও?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলছে এখন ট্রেন, কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই। বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ব্যাপারটা দাগু, মুখটা কঠিন হয়ে গেছে রাগে।

'গর্দভ,' বলল সে, 'আস্ত গর্দভ ব্যাটারা। থামাচ্ছে না কেন ট্রেনটা?' হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়াল সে। কিন্তু ছুটতেই থাকল ট্রেনটা। নিজের

যোদ্ধাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল দাগু ওকে অনুসরণ করতে। খাড়া বরফ ঢাকা চড়াই-উৎরাইগুলোর উপর দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে এল ওরা। আরও দু'এক ডিগ্রী খুলল রানা থ্রটলটা।

আর একবার উত্তেজিতভাবে চাইল জানালা দিয়ে জোনাথন, ডেভিড, গভর্নর আর হেনরী। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড, 'ওই যে দাগু আর ওর দলবল! হতভাগাগুলো করছে কি এখানে?' ছুটে গেল সে প্ল্যাটফর্মটায়। বাকি সবাই গা ঘেঁষে এল ওর। আরও কমে যাচ্ছে ট্রেনের গতি।

গভর্নর বলল, 'আমরা লাফিয়ে নামতে পারি এখন। দাগু কভার দেবে আমাদের আর...'

'আমাদের দিয়ে তাই করাবার ইচ্ছে হারামজাদাটার,' বলল মার্শাল। 'অনেক, অনেক দূরের পথ এখান থেকে ফোর্ট হাম্বোল্ড।' কথা বলতে বলতে দাগুর উদ্দেশে আঙুল দিয়ে ইঞ্জিনের দিকে ইঙ্গিত করছে ডেভিড। চিনতে পেরেছে দাগু। মার্শালের ইঙ্গিতটা চোখে পড়েছে ওর, বুঝে গেছে সে ব্যাপারটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে আদেশ দিল সে সঙ্গীদের। প্রায় সাথে সাথেই নিশানা করে ফেলল কয়েকটা রাইফেল ইঞ্জিনরুমটার দিকে।

বিদ্যুৎ গতিতে শুয়ে পড়ল রানা মেঝেতে। মাথার উপর ছুটে বেড়াতে লাগল বুলেটগুলো। গুলির প্রথম ঝাঁকটা বেরিয়ে যেতেই সাবধানে মাথা উঁচু করল রানা। বোল্ট টেনে রাইফেলগুলোয় আবার গুলি ভরতে ভরতে এগিয়ে আসছে ইন্ডিয়ানরা। দৌড়ুতে শুরু করেছে গোটা দলটা। ট্রেনের গতি আর একটু কমিয়ে দিল রানা।

'অসহ্য!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল জোনাথন, 'বুঝতেই পারছি না ওর ইচ্ছেটা কি। সহজেই ইন্ডিয়ানদের পিছু ফেলে এগিয়ে যেতে পারে যদি...' থেমে গেল সে হঠাৎ।

নিরাপদে পৌঁছে গেলেন কর্নেল বনের ভিতর। দ্রুত কিন্তু চক্রাকারে ক্রমশ কমিয়ে আনতে থাকলেন ঘোড়াগুলো থেকে নিজের দূরত্ব। গার্ডগুলো তাকিয়ে আছে উপত্যকার খণ্ড যুদ্ধের দিকে ঘোড়াগুলোর দিকে পিছন ফিরে। সর্বমোট ষাটটার মত ঘোড়া জড় করা এক জায়গায়। সবগুলো মুক্ত। বাঁধবার কোন দরকারও নেই। ইউ.এস. ক্যাভালরির মতই শিক্ষিত ইন্ডিয়ানদের ঘোড়া। দূর থেকেই পছন্দ করে নিলেন কর্নেল তিনটে ঘোড়া। এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। একটুও নড়ল না ঘোড়াগুলো। ভারী কেশরগুলো ঢেকে আছে বরফে।

ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে এগিয়ে গেছে প্রহরীরা, দিন দুনিয়া সম্পূর্ণ ভুলে তাকিয়ে আছে উপত্যকার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেলেন কর্নেল ঘোড়াগুলোর। বিরাট একটা পাইনের গুঁড়ি বেছে নিয়ে আত্মগোপন করলেন ওটার আড়ালে। এত কম দূরত্ব থেকে রাইফেল ব্যবহার করাটা মনঃপূত হলো না ওঁর। গাছের কাণ্ডের সাথে সাবধানে রাইফেলটা ঠেস্ দিয়ে রেখে হাতে উঠিয়ে নিলেন রিভলভার।

*

ঘনঘন পিছন দিকে চাইছে জানালা দিয়ে জোনাথন আর ডেভিড। দাগু আর তার দলবলকে হাত দিয়ে বার বার দেখাচ্ছে পাইনের বনের দিকে। কয়েক গজ দৌড়ে এল ইন্ডিয়ান চীফ ট্রেনের পাশে পাশে। তারপর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিল ওর দলবলকে। নিজেও ছুটল বনের দিকে।

'ঘোড়াগুলো!' চেঁচিয়ে উঠল দাগু ছুটতে ছুটতেই। 'ফিরে যাও ঘোড়াগুলোর কাছে।' হঠাৎ থমকে দাঁড়াল দাগু। দূর থেকে পরিষ্কার ভেসে এল দুটো রিভলভারের গুলির আওয়াজ। ওর কাছের দুজন লোকের কাঁধে হাত রাখল দাগু। ইশারা করে দেখাল সামনের দিকে। দ্রুত ছুটে গেল লোক দুজন সেদিকে। দাগুর মুখে দেখা দিল দুশ্চিন্তার ছাপ। চলতে থাকল সে ঠিকই, কিন্তু আগের মত দ্রুত আর নয়। বুঝতে পেরেছে সে, তাড়াহুড়ো করেও লাভ নেই আর। গুলির আওয়াজ যখন হয়েছে, তখন ওখানেও ঝামেলা বেধেছে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড, 'আমি জানি কেন পাসে ঢোকার আগে ট্রেনের গতি কমিয়েছিল শয়তানটা। আর কেনই বা মিছেমিছি ফাটিয়েছিল বোমাটা। বোমার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্যদিক দিয়ে নিরাপদে কর্নেলকে নামিয়ে দেবার জন্যে।'

'দুটো জিনিস মাথায় ঢুকছে না আমার এখনও, দাগু এখানে কেন? আর দাগু যে থাকবে এখানে সে কথা রানা জানল কি করে?'

হাত থেকে রাইফেলগুলো নামিয়ে নিয়েছে ইন্ডিয়ানরা এখন। প্রায় তিনশো গজ পিছনে পড়ে গেছে ট্রেনের। পিছন দিকে তাকিয়ে আরও কমিয়ে দিল রানা ট্রেনের গতি।

'আবার থামছে! আবার থামছে ট্রেন!' মাথা খারাপ হয়ে গেছে গভর্নরের, পরিষ্কার বোঝা গেল ওর কথায়। 'দুদিক থেকে লাফিয়ে নেমে ধরে ফেলতে পারি আমরা ওকে। তারপর...'

'তারপর নামার সাথে সাথে যখন গতি বাড়িয়ে দেবে ও ট্রেনের? হাত নেড়ে গুড বাই জানাব? বুড়ো গর্দভ কোথাকার!' দাঁত খিঁচিয়ে বলল জোনাথন।

'সেজন্যেই গতি কমিয়েছে নাকি?'

'কি জন্যে তবে?'

একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে চলেছেন কর্নেল, লাগাম ধরে রেখেছেন আরও দুটো ঘোড়ার, বাকিগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন সামনে। বনের শেষ মাথায় এখন তিনি। একটা উপত্যকার উপর দিয়ে এগোচ্ছেন। সামনের পাহাড়টা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে দুদিকে। সেটার পর তিন মাইলেরও কম দূরত্বে আর একটা উপত্যকার মুখ। তুষার এখন নেই বললেই চলে। বেশ ক'মাইল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উপত্যকার মুখের কাছেই টেলিগ্রাফ পোলটা,

সেটাও দেখতে পাচ্ছেন তিনি। সানরাইজ পাস থেকে বেরুনোর পশ্চিম সীমানা ওটা।

হাতের ব্যথাটা নতুন করে অনুভব করে চোখের সামনে তুললেন কর্নেল হাতটা। রক্তে ভিজে গেছে ব্যান্ডেজটা। সেখান থেকে গড়িয়ে পৌঁছে গেছে রক্ত হাতে ধরা লাগাম পর্যন্ত। চোখ তুলে সামনের দিকে তাকালেন আবার তিনি। যাক। তাড়া খাওয়া ঘোড়াগুলো ছুটছে সামনের দিকে। বাঁক নিলেন কর্নেল শুধু তিনটে ঘোড়া নিয়ে।

আবার বেড়ে গেল ট্রেনের গতি। পিছিয়ে পড়তে শুরু করল ইন্ডিয়ান দলটা। শূন্য দৃষ্টি দাগুর চোখে। ব্যাপারটা কেমন হলো!

দু'জন লোক বেরিয়ে এল পাইন বন থেকে। মুখে কিছু না বলে দূর থেকেই হাত উঁচিয়ে তালুটা নাড়ল এদিক ওদিক। মাথাও দোলাল একই ভঙ্গিতে। তার মানে, ঘোড়াও নেই, ঘোড়া-রক্ষকরাও নেই। মাথা নেড়ে ঘুরে দাঁড়াল দাগু। ছুটতে শুরু করল সে লাইনের উপর দিয়ে। দলটা অনুসরণ করল তাকে।

পিছনের প্ল্যাটফর্মটার উপর দাঁড়িয়ে আছে গভর্নর, জোনাথন, মার্শাল আর হেনরী। দেখতে পাচ্ছে ওরা, ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে দাগু আর তার দলবল।

মোড় নিতে শুরু করেছে ট্রেন। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল ইন্ডিয়ানদের দলটা চোখের আড়ালে। ঠিক সেই সময় পরিষ্কার ভেসে এল গুলির শব্দ। পর পর দুটো। 'কোত্থেকে এল?'

'কর্নেল রুজভেল্টের কাছ থেকে।' গভর্নরের প্রশ্নের উত্তর দিল মার্শাল ভাঙা গলায়। 'রানাকে জানাচ্ছে কর্নেল, ঘোড়ার দলকে নরক পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। দাগু তার বীরপুরুষদের নিয়ে পায়ে হেঁটে যখন পোর্টে পৌঁছুবে, গিয়ে দেখবে সেখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে মাসুদ রানা।'

'কিন্তু সিম্পসন আছে ফোর্টে!' উৎসাহিত হয়ে উঠল হঠাৎ গভর্নর।

'তার থাকা না থাকায় কি এসে যায়? কচি খোকা সে রানার সামনে। তাছাড়া, সে মদকে নয়, মদ তাকে খেয়ে ফেলেছে এতক্ষণে, আমার বিশ্বাস। সোনার ভাগ পাবার আনন্দে মদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারেই না সে। তাকে চিনি আমি।'

হঠাৎ করে আরও বাড়ল ট্রেনের স্পীড।

'কি, বলেছিলাম আমি? ট্রেনের গতি বাড়াচ্ছে আরও রানা!' ঘড় ঘড়ে গলায় বলল মার্শাল।

'ভেবেছিল গতি কমালেই নেমে পড়ব আমরা,' বলল জোনাথন। 'নামিনি দেখে অন্য কোন ফন্দি এঁটেছে এখন।' সেফটি রেইলের উপর দিয়ে মাথা বাড়াল জোনাথন। সাথে সাথে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল সে। কাঁপা হাতে মাথা থেকে হ্যাটটা নামাতেই দেখল এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সবাই হ্যাটটার দিকে।

গলা শুকিয়ে গেছে মার্শালের, 'কোনাদকেই মনোযোগের অভাব নেই ওর। ব্যাটা শয়তানের গুরু!'

জানালা দিয়ে সামনে তাকাল রানা। বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি। সানরাইজ পাসের প্রবেশমুখ, পশ্চিমের উপত্যকাটা— সেখানে কর্নেলের হাজির থাকার কথা—আর মাত্র দুশো গজ দূরে। 'ধরো শক্ত করে,' বলল রানা। থ্রটল বন্ধ করে চেপে ধরল ব্রেকটা। কর্কশ শব্দ তুলে চাকার সাথে আটকে গেল ব্রেক।

ক্রিস্টোফারের পিস্তলটা স্বাতীর হাতে তুলে দিল রানা। দ্বিতীয় গ্রেনেডটা বের করে নিল টুল বক্স থেকে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন। চেঁচিয়ে হুকুম করল রানা, 'নামো!'

ফুটপ্লেটের উপর থেকে লাফ দিল স্বাতী। পিছলে গিয়ে আছাড় খেল তুষারের উপর। ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ। ব্রেকটা ছেড়ে দিল আবার রানা। ব্যাক গিয়ার দিয়েই পুরো খুলে দিল আবার থ্রটলটা। তারপর লাফ দিয়ে নামল স্বাতীর পাশে।

ট্রেনটা যে পিছন দিকে ছুটতে শুরু করেছে, বুঝতে বেশ সময় লেগে গেল ওদের চারজনের। ধাতস্থ হয়ে প্রথমে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল জোনাথন। অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখ দুটো যখন দেখল নিচে দাঁড়িয়ে ওর দিকে পিস্তল ধরে রেখেছে রানা। সবেগে নিজেকে ছুঁড়ে দিল জোনাথন এক পাশে, গুলির শব্দও হলো সেই সাথে। 'জেসাস! নেমে গেছে ওরা ট্রেন থেকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে উচ্চারণ করল জোনাথন কথাগুলো।

'কেউ নেই কন্ট্রোলে?' প্রায় কেঁদে ফেলল গভর্নর। 'দোহাই তোমাদের, লাফ দাও।'

একটা হাত তুলল জোনাথন, 'না!'

'লাইন থেকে পড়ে যাবে ট্রেন, তখন কি হবে? চিন্তা করে দেখো…!'

'ট্রেনটা দরকার আমাদের!' চিৎকার করে উঠল জোনাথন, ছুটল সামনে কোচের দরজার দিকে। 'চালাতে জানো, ডেভিড?'

মাথা দোলাল মার্শাল, জানে না।

'জানি না আমিও, তবে চেষ্টা করে দেখব,' ঝটকা মেরে আঙুল তুলে দেখাল জোনাথন। 'রানা!'

মাথা নাড়তে নাড়তে ঝুলে পড়ল মার্শাল ফুটপ্লেটের উপর। গতি বেড়ে গেছে ট্রেনের। লাফ দিয়ে পড়েই গড়াতে শুরু করল সে। বরফ ঢাকা ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে পৌঁছে গেল নিচে। খুব একটা ব্যথা লাগল না শরীরে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল চারদিকে।

গজ পঞ্চাশেক দূরে চলে গেছে ট্রেন। দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে আরও। বাম দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল রানার মাথা আর কাঁধ। স্বাতীকে ধরে রেখেছে ও।

'ব্যথা পেয়েছ কোথাও?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

'হাঁটুতে সামান্য।'

'দাঁড়াতে পারবে?'

'মনে হয় পারব।'

'ঠিক আছে। বসো দেখি একটু,' রেল লাইনের পাশে বসতে সাহায্য করল রানা স্বাতীকে। অদ্ভুত চোখে চেয়ে আছে রানার দিকে স্বাতী। পলক পড়ছে না চোখে। ভক্তি, বিশ্বাস ও সমর্পণের দৃষ্টি। কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেবার অবসর নেই রানার। চেয়ে আছে ও কোয়ার্টার মাইল দূরের ট্রেনটার দিকে। অতি কষ্টে ইঞ্জিনরুমে পৌঁছে গেছে জোনাথন। কিন্তু ট্রেনটাকে বাগে আনতে পারেনি এখনও।

হাত বোমাটা লাইনের নিচে রাখল রানা।

'উড়িয়ে দিতে চাও লাইনটা?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এজন্মে বোধহয় পারছ না!' পিছন থেকে উদ্যত কোল্ট হাতে বলল মার্শাল। 'পিস্তলটা ব্যারেল ধরে বের করে আনো কোটের তলা থেকে।'

কোটের তলায় হাত ঢোকাল রানা। সন্তর্পণে বের করে আনল পিস্তলটা। এগিয়ে আসছে মার্শাল। স্বাতীকে ছাড়িয়ে রানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। হাত বাড়াতে যাবে, এমন সময় খুক্ করে কাশল স্বাতী।

পিছন দিকে তাকাতে যাবে মার্শাল, কথা বলে উঠল স্বাতী, 'আমার কাছেও পিস্তল আছে একটা, ম্যর্শাল। মাথার উপর হাত তুলুন দয়া করে।'

ঘুরছে মার্শাল স্বাতীর দিকে। লাফিয়ে উঠল রানার হাতের পিস্তল। কিন্তু টের পেয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মার্শাল। পুরোপুরি লাগল না তার মাথায় পিস্তলের বাঁট, কিন্তু যেটুকু লাগল তাল হারিয়ে পড়ে গেল তাতেই। খসে গেছে হাতের পিস্তলটা। ডাইভ দিল সেটা ধরার জন্যে। লাথি মেরে সরিয়ে দিল সেটাকে রানা দূরে। দ্বিতীয় লাথিটা পড়ল মার্শালের মাথার পিছনে। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান হারাল সে।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে স্বাতী। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি যখন ওর মাথায় বাড়ি মারলে আমি···আমি···আমি···!'

'গুলি করার জন্যে ট্রিগার টেনেছিলে তুমি, এই তো? অথচ গুলি বেরোয়নি, কেমন?' বলল রানা ভর্ৎসনার সুরে। 'গুলি বেরুবে না, জানতাম। সেজন্যেই পিছন থেকে আক্রমণ করতে হলো ওকে আমার। এবার যখন কারও দিকে পিস্তল ধরবে, সেফটি ক্যাচটা অফ করে নিয়ো!'

রানার দিক থেকে চোখ নামিয়ে হাতের পিস্তলটার দিকে তাকাল স্বাতী। মাথা দোলাল, 'হুঁ!' অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর। 'অন্তত একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত ছিল তোমার!'

'কি?' হাহ্ হাহ্ করে হেসে উঠল রানা। 'প্রাপ্য বুঝি তোমার? তা বেশ তো, অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ।' লাইনের দিকে তাকাল রানা। দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ট্রেন পিছন দিকে। ঘাড় ফিরিয়েই দেখতে পেল দুটো ঘোড়া পিছনে নিয়ে এগিয়ে আসছেন কর্নেল রুজভেল্ট। হাত তুলে থামবার নির্দেশ দিল রানা। সাথে সাথে ঘোড়ার রাশ টানলেন কর্নেল।

লাইনের উপর থেকে টেনে সরিয়ে দিল রানা মার্শালকে বিপজ্জনক সীমানার বাইরে। গ্রেনেডের ইগনিশন খুলে ক্লিপটা আটকে রেখেছিল, নিচু হয়ে ঝুঁকে ছেড়ে দিল ক্লিপটা। তারপর স্বাতীকে নিয়ে ছুট দিল ঘোড়াগুলোর দিকে। বিশ গজ এগিয়েই শুয়ে পড়ল ওরা মাটিতে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল তীব্র আলোর ঝলকানিতে। বিকট শব্দে ফাটল বোমাটা। পিছন দিকে তাকাল রানা। কালো ধোঁয়া সরে যাচ্ছে বাতাসের সাথে। বাঁকাচোরা হয়ে গেছে বাম দিকের লাইনটা। স্বাতীকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, পৌঁছুল ঘোড়াগুলোর কাছে। একটার পিঠে স্বাতীকে উঠিয়ে দিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল লাগাম, আরেকটায় উঠে বসল নিজে।

কর্নেলকে মনক্ষুণ্ন মনে হলো। বললেন, 'লাইনটা সহজেই আবার ঠিক করে নিতে পারবে ওরা। বল্টু খুলে বাঁকা লাইনটা ফেলে দেবে, তারপর পিছন থেকে আরেকটা অংশ খুলে এনে বসিয়ে দেবে।'

'জানি। কিছুটা দেরি করাতে চাই—তার বেশি কিছু নয়। ইঞ্জিনটা নষ্ট করে দিলে পায়ে হেঁটে ফোর্টে পৌঁছুতে হত ওদের।'

'কি বললে?' বোঝেননি কর্নেল রানার কথা।

'পায়ে হাঁটা ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না ওদের, কর্নেল।'

হঠাৎ বুঝতে পেরে ঝট করে তাকাল স্বাতী রানার দিকে। আতঙ্ক ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে, 'তার মানে সবাইকে···সবাইকে···তুমি···!'

'বুঝেছ তাহলে?' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'এছাড়া উপায় নেই আমাদের।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল স্বাতী। নির্বিকার রানা, এতটুকু বদলাল না মুখের চেহারা। ঘোড়ার পেটে পায়ের গুঁতো মারল ও। রওনা হলো তিনজন।

নয়

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একহাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল জোনাথন। ট্রেন চালানোর কায়দাটা বের করে ফেলেছে সে। ফুটপ্লেটের উপর দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল। বড়জোর কোয়ার্টার মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে দাগু আর তার দলবলকে। হাত নাড়ল দাগু ট্রেনের উদ্দেশে। দু'মিনিটের ভিতর ইঞ্জিন রুমটাকে ঘিরে ফেলল পিউতী ইন্ডিয়ানের দল। চেঁচিয়ে আদেশ দিল সবাইকে জোনাথন ট্রেনে উঠে পড়ার জন্যে। লাফ মেরে ফুটপ্লেটে উঠে এল দাগু। এক মিনিটেই ট্রেনে উঠে পড়ল বাকি সবাই। থ্রটল খুলে দিতেই সামনে এগুতে শুরু করল ট্রেন।

'সবগুলো ঘোড়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল জোনাথন।

'সবগুলো। পাহারাদার দুজন গুলি খেয়েছে পিঠে। দীর্ঘ একটা হাঁটা থেকে বাঁচিয়েছে আমাদের, মেজর মার্শাল। ডেভিড—কোথায় ও, দেখছি না যে?'

'দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। জরুরী কিছু কাজ সারবার জন্যে নেমে

গেছে।'

সামনের দিকে তাকাল জোনাথন। সানরাইজ পাসের পশ্চিম দিকটা এগিয়ে আসছে ক্রমশ। হঠাৎ, ভাল করে দেখার জন্যে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। লাইনের পাশে পড়ে আছে দেহটা। পরিষ্কার চিনতে পারল জোনাথন, ডেভিড। বিশ্রী কয়েকটা গাল দিল সে রানার উদ্দেশে, চেপে ধরল ব্রেকটা।

ঝাঁকুনি খেয়ে থামল ট্রেন। লাফ দিয়ে নামল জোনাথন আর দাগু। দৌড়ে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল রক্তাক্ত ডেভিডের উপর। তারপর চোখ তুলে চাইল সামনের দিকে। ত্রিশ গজ দূরে বেঁকে পড়ে আছে এক পাশের লাইন। গর্ত হয়ে গেছে মাঝখানটায়। 'কাজটা রানার,' বলল জোনাথন দাগুকে।

'যেই হোক এই লোক, মরতে হবে ওকে এরজন্যে।' রুদ্ধ আক্রোশ দাগুর কণ্ঠে।

কয়েক মুহূর্ত দাগুর দিকে চেয়ে থাকল জোনাথন, 'চেনো না ওকে, তাই কথাটা বলতে পারলে।'

'কোন মানুষকে ভয় করে না দাগু।'

'শুধু এই একটা লোককে ভয় করতে হবে তোমার। আশ্চর্য এক লোক! শেয়ালের মত ধূর্ত আর শয়তানের মত কপট। রানার খুনের খাতায় নাম ছিল না মার্শাল ডেভিডের—বেঁচে গেছে তাই। এসো, লাইনটা রিপেয়ার করতে হবে তাড়াতাড়ি।'

জোনাথনের নির্দেশনায় বিশ মিনিট লাগল পিউতীদের লাইনটা রিপেয়ার করতে। ট্রেনের পিছন দিক থেকে লাইনের একটা অংশ খুলে এনে বসিয়ে দেয়া হলো ভাঙা জায়গাটায়। ভাঙাচোরা লাইনটা আগেই খুলে ফেলেছে কয়েকজনে। গর্তটা ভরা হলো পাথর দিয়ে। মার্শালের জ্ঞান ফিরে এসেছে লাইনের কাজ চলার সময়ই। হেনরীর সাহায্য নিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়েছে সে।

'আমাদের যেতে হবে এখন,' বলল জোনাথন। সবাই উঠে পড়ল ট্রেনের কামরায়।

থ্রটল টেনে ব্রেক ছেড়ে দিতেই গড়াতে থাকল চাকাগুলো। অত্যন্ত ধীরে ধীরে গড়িয়ে এসে ভাঙা জায়গাটায় চাকা পড়তেই কাত হয়ে গেল ইঞ্জিন। কাত হয়েই কোনমতে পার হয়ে গেল শেষ চাকাটা বিপজ্জনক জায়গা, পুরো খুলে দিল জোনাথন থ্রটলটা।

দাঁড় করাল ঘোড়াগুলোকে রানা। কর্নেলের জখমি হাতটা ব্যান্ডেজ করতে শুরু করল আবার নিজ হাতে।

'সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, রানা। কাজটা পরে করলেও চলত।'

'রক্তটা বন্ধ করতে না পারলে ফোর্ট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না, কর্নেল।' স্বাতীর দিকে চাইল রানা। বাম কব্জিটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে ডান হাতে। ব্যথায় চেপে রেখেছে ঠোঁট দুটো, 'তোমার কি অবস্থা?'

'ভাল।'

স্বাতীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ব্যান্ডেজে মন দিল আবার। কাজ শেষ করে হাঁটতে শুরু করার উপক্রম করেই থেমে গেল রানা। বেকায়দাভাবে বসে আছে স্বাতী ঘোড়ার উপর, মাথাটা নুয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল সে, 'খারাপ নাকি কজিটার অবস্থা?'

'কজি নয়, হাঁটু। পাদানিতে ঢোকাতে পারছি না পা'টা।' ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল রানা। স্বাতীর বাম পা'টা ঝুলে আছে পাদানির কাছে। সামনের দিকে তাকাল রানা একবার। তুষার পড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে নীল আকাশ। আবার চাইল রানা স্বাতীর দিকে। হাত আর পায়ের ব্যথায় বসতেই পারছে না সে ঘোড়ার পিঠে। নিজের ঘোড়ায় চড়ল রানা। নিয়ে গেল স্বাতীর ঘোড়াটার কাছে। হাত বাড়িয়ে উঠিয়ে নিয়ে এল ওকে নিজের ঘোড়ায়। লাগাম দুটো ধরল একহাতে, অন্য হাতে স্বাতীকে। এগোতে শুরু করল আস্তে আস্তে। খুব একটা ভাল অবস্থা নয় কর্নেলেরও। রেল লাইনের পাশ দিয়ে আবার রওনা হলো ওরা।

নির্দিষ্ট জায়গাতেই বসে আছে সিম্পসন। কর্নেলের ডেস্কের সামনে। হুইস্কি আর মোটা চুরুট আছেই হাতে। ওর সামনে বসে আছেন ফোর্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জ্যাকসন চেয়ারের হাতলে হাত বাঁধা অবস্থায়। ওরা দুজন ছাড়া কেউ নেই কামরায়। হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একজন ফ্যাকাসে চেহারার লোক।

কর্তৃত্বের সুরে সিম্পসন বলল, 'ঠিক আছে সব, ফার্মডী?'

'ফিক্সড। বাকি সবার সাথে তালা দিয়ে দিয়েছি টেলিগ্রাফিস্টদেরকেও। সবাইকে ঢোকানো হচ্ছে কিনা গুনে দেখছে হ্যারিস।'

'চমৎকার! ওরা সবাই এসে পৌঁছানোর আগেই শেষ করে ফেলতে বলো। এক ঘণ্টাও লাগবে না আর ওদের পৌঁছতে।' কৌতুক করল সিম্পসন কর্নেল জ্যাকসনের উদ্দেশে। 'সানরাইজ পাসের যুদ্ধটা ইতিহাস বিখ্যাত হতে যাচ্ছে, কর্নেল। আমার মনে হয় অধ্যায়টার নাম দেয়া যেতে পারে, "সানরাইজ-পাস হত্যাকাণ্ড"।' নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হাসল সিম্পসন।

কিছুটা সুস্থ বোধ করছে এখন ডেভিড। সাপ্লাই ওয়াগনে বসে রাইফেল আর এম্যুনিশন ভাগ করে দিচ্ছে সে ইন্ডিয়ানদের। ওদের মধ্যে এখন আর ইন্ডিয়ানদের স্বভাব-গাম্ভীর্য নেই। শিশুর মত হাসছে আর চেঁচাচ্ছে ওরা রাইফেলগুলো পেয়ে। একটা অটোমেটিক রাইফেল তুলে দিল ডেভিড দাগুর হাতে।

'তোমার জন্য যৎসামান্য পুরস্কার, দাগু।'

হাসল পিউতী সর্দার, 'আসলে কথা রাখতে জানো তুমি, মার্শাল ডেভিড।'

জোর করে হাসতে গিয়েই টন টন করে উঠল ডেভিডের ব্যথা পাওয়া চোয়াল, কাজেই ইচ্ছেটা ত্যাগ করল সে। তারপর বলল, 'বিশ মিনিট। আর

মাত্র বিশ মিনিট সময় লাগবে।'

মাত্র পনেরো মিনিট এগিয়ে আছে রানা ওদের থেকে। দাঁড়িয়ে পড়ে সামনের দিকে চাইল ও। আধ মাইলের বেশি হবে না এখান থেকে খালের উপরে রেল ব্রিজটা। ব্রিজের পর পরই শুরু হয়েছে ফোর্ট হাম্বোল্ডের কম্পাউন্ড। আস্তে করে স্বাতীর ঘোড়াটায় বসতে সাহায্য করল ওকে রানা। অনুসরণ করতে বলল। পিস্তলটা বের করে আনল হাতে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে তিনগুণ বড় ছায়া পড়ল শুকনো খালের মাটিতে তিনজন নেমে আসতেই। বোকা, নিষ্ঠুর চেহারার গার্ড বেনসন এগিয়ে এল ওদের দিকে রাইফেল হাতে।

'কে তোমরা?' মদের গন্ধ বেরুল ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে। 'কি দরকার তোমাদের ফোর্টে?'

'তোমার কাছে কোন দরকার নেই।' স্পষ্ট কর্তৃত্বের ছাপ রানার গলায়, 'সিম্পসনকে চাই। জলদি!'

'পেছনের দুজন কে?'

'কানে শুনতে পাচ্ছ না? প্রিজনার। ট্রেন থেকে।'

'ট্রেন থেকে?' অনিশ্চিতভাবে মাথা ঝাঁকাল বেনসন। মনস্থির করে উঠতে পারছে না সে। 'এসো।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওদেরকে বেনসন। কমান্ড্যান্টের অফিসের সামনে থেমে দাঁড়াতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল সিম্পসন। দুহাতে পিস্তল। কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কাদের ধরে এনেছ তুমি, বেনসন?'

'ট্রেন থেকে এসেছে বলছে ওরা, বস্।'

পাত্তাই দিল না রানা সিম্পসন আর বেনসনকে। রুজভেল্ট আর স্বাতীর দিকে পিস্তলটা তাক করে বলল, 'নামো! দুজনেই!'

সিম্পসনের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি সিম্পসন? ভেতরে চলো।'

দুটো পিস্তলই একসাথে তাক করল রানার দিকে সিম্পসন। 'আহ্-হা, ব্যাপার কি, মিস্টার! আস্তে! কে তুমি?'

'মাসুদ রানা। মার্শাল ডেভিড পাঠিয়েছে আমাকে।'

'ঠিক?'

'ঠিক।' নেমে দাঁড়ানো অসুস্থ স্বাতী আর কর্নেল রুজভেল্টের দিকে তাকাল রানা। 'ওরা দুজন আমার পাসপোর্ট, অথবা যা খুশি বলতে পারো, ডেভিড বলেছে প্রমাণ দেবার জন্যে দুজনকে সাথে নিয়ে আসতে।'

'এর চেয়ে ভাল পাসপোর্ট দেখা আছে আমার।'

'চালাকির চেষ্টা করেছিল ওরা।' সিম্পসনের কথার ধারে কাছেও গেল না রানা। 'কর্নেল রুজভেল্ট। রিলিফ কমান্ডার। আর ও হলো মিস স্বাতী চৌধুরী। আশরাফ চৌধুরীর মেয়ে।'

চোখ দুটো ছোটবড় হয়ে গেল সিম্পসনের। প্রায় হাঁ হয়ে গেল মুখ। পিস্তলের নিশানা সরে গেল। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই হজম করে ফেলল আশ্চর্য ভাবটা, 'অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে। এসো।'

হাঁ করে চেয়ে থাকলেন কর্নেল জ্যাকসন দরজা খুলতেই। হাত বাঁধা অবস্থায়ই বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন চেয়ার ছেড়ে।

'কে? কর্নেল রুজভেল্ট! আর মেয়েটা? চৌধুরীর মেয়ে নাকি? কি আশ্চর্য মিল বাপ আর মেয়ের চেহারায়।' চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল জ্যাকসন, 'আর তুমি, তুমি কে?'

'স্যাটিসফায়েড?' সিম্পসনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। কিন্তু জীবনে তোমার নাম শুনিনি কখনও।'

পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল রানা কোটের পকেটে। আরও নিশ্চিন্ত হলো সিম্পসন।

'চারশো উইনচেস্টার রাইফেল আরমারী থেকে কে চুরি করেছিল বলে মনে হয় তোমার?' হঠাৎ খেপে উঠল রানা। 'আল্লার ওয়াস্তে সন্দেহটা দূর করো, সিম্পসন। অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ। তোমার মহাবীর দাণ্ড সর্দার মারা গেছে। কাজটা শিকেয় তুলেছিল প্রায়। জোনাথনও মারা গেছে। মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে ডেভিড। যদি সিপাইরা আবার দখল করে নেয় ট্রেনটা…'

'দাণ্ড, জোনাথন, ডেভিড…'

কঠোর দৃষ্টিতে চাইল রানা বেনসনের দিকে, 'ওকে বলো বাইরে যেতে।'

'বাইরে যাবে?' বিস্মিত দেখাল সিম্পসনকে।

'হ্যাঁ। কথাটা তোমাকে বলা যাবে শুধু।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে যেতে নির্দেশ দিল বেনসনকে সিম্পসন। পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল বেনসন।

সিম্পসন জিজ্ঞেস করল, 'এমন কি কথা আছে যে…'

'আছে!' লাফ দিয়ে পিস্তলটা বেরিয়ে এল রানার হাতে। নলটা ঢুকে গেল সিম্পসনের হাঁ করা মুখের ফাঁকে। থাবা মেরে ছিনিয়ে নিল সিম্পসনের কোমর থেকে পিস্তল দুটো। এগিয়ে দিল কর্নেল রুজভেল্টের দিকে। বিনা-বাক্য-ব্যয়ে একটা পিস্তল ধরিয়ে দিলেন কর্নেল রুজভেল্ট হতভম্ব জ্যাকসনের বাঁধা হাতে, অপরটা তাক করে ধরলেন সোজা সিম্পসনের বুকের দিকে। সিম্পসনের মুখের ভিতর থেকে নলটা সরিয়ে নিল রানা। পকেট থেকে ছুরি বের করে কর্নেল জ্যাকসনের বাঁধন কেটে দিল। জ্যাকসনের চোখে মুখে সিম্পসনের মতই বিস্ময়। জিজ্ঞেস করল রানা জ্যাকসনকে, 'বেনসন ছাড়া সিম্পসনের দলে কজন লোক আছে আর?'

'কে তুমি? কেমন করে…'

'কজন লোক আছে?'

'দুজন। ফার্মডী আর হ্যারিস।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভয়ানক ভাবে পিস্তলের নল দিয়ে খোঁচা মারল রানা সিম্পসনের কিডনিতে। ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেল সিম্পসন। আবার মারল রানা ওকে। মৃদু হেসে বলল, 'ডজন ডজন মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী তুমি, সিম্পসন। বিশ্বাস করো, বিন্দুমাত্র সুযোগ দিলেই খুন করব আমি তোমাকে।'

সিম্পসনের মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল বিশ্বাস করেছে ও রানার কথা। 'বেনসনকে বলো, ফার্মডী আর হ্যারিসকে চাও তুমি এক্ষুণি।'

দরজাটা একটু ফাঁক করে সিম্পসনকে ঠেলে দিল রানা দরজার ফাঁকে। মাত্র কয়েক ফুট দূরে পায়চারি করছে বেনসন।

কর্কশ ভাবে সিম্পসন বলল, 'ফার্মডী আর হ্যারিসকে ডাকো। তুমিও এসো। এক্ষুণি।'

'হয়েছে কি, বস্? মড়ার মত দেখাচ্ছে তোমার মুখ?'

'কোন কথা নয়, বেনসন। জলদি।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে দৌড় দিল বেনসন।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আদেশ দিল রানা সিম্পসনকে, 'ঘুরে দাঁড়াও।'

আদেশ পালন করল সিম্পসন। প্রচণ্ড জোরে মারল রানা পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর কানের পাশে। মাটিতে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলল অজ্ঞান দেহটা। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে স্বাতী।

জ্যাকসনের দিকে ফিরে জানতে চাইল রানা, 'ক'জন লোক বেঁচে আছে আপনার দলের?'

'মাত্র দশজন হারিয়েছি আমি— তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি গেছে ওদের,' এখনও হাত ডলছেন কর্নেল। 'বাকিরা ধরা পড়েছে সিম্পসনের হাতে ঘুমন্ত অবস্থায়। রাতে কম্পাউন্ডে ঢুকে গেট খুলে দিয়েছিল সিম্পসন ইন্ডিয়ানদের।'

'কেমন বোধ করছেন এখন?'

'ভাল। মি. রানা? কি করতে হবে আমাকে?'

'আরমারী থেকে কিছু টি.এন.টি. এনে দেবেন। তাড়াতাড়ি করবেন, সেলগুলো কোথায়?'

আঙুল দিয়ে দেখালেন কর্নেল জ্যাকসন, 'কম্পাউন্ডের কোণার দিকে। ওখানে।'

'চাবি?'

ডেস্কের পিছনের বোর্ড থেকে একটা চাবি পেড়ে নিয়ে তুলে দিলেন রানার হাতে জ্যাকসন। ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে গেল রানা জানালার দিকে। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন জ্যাকসন।

কয়েক সেকেন্ড দেখল রানা জানালা দিয়ে। দৌড়ে ছুটে আসছে বেনসন, ফার্মডী আর হ্যারিস কম্পাউন্ড দিয়ে। রানার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে টেনে এক কোণে নিয়ে গেলেন সিম্পসনকে কর্নেল রুজভেল্ট। ঠিক সেই সময় খুলে গেল দরজাটা। ঘরে ঢুকেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল বেনসন, ফার্মডী আর হ্যারিস। রানা আর রুজভেল্টের হাতের পিস্তল দুটো তাক করা ওদের দিকে। কর্কশ গলায় ওদের নির্দেশ দিল রানা ঘুরে দাঁড়াবার। পিস্তল দেখিয়ে নিয়ে গেল তিনজনকে সেলের কাছে। পকেট থেকে চাবি বের করে দিল রুজভেল্টের হাতে। তিনজনকে সেলে ঢুকিয়ে তালা আটকে দিল। ফিরে এসে হাত-পা কষে বাঁধল অজ্ঞান সিম্পসনের। ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন জ্যাকসন টি.এন.টি-

র বাক্স নিয়ে। টিউবগুলো পকেটে ঢুকিয়ে হাতে ইগনিশন বক্স নিয়ে বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেল ফোর্টের গেট দিয়ে ব্রিজটার উদ্দেশে। ইঞ্জিনরুমের বাঁ দিকের দরজা দিয়ে উঁকি দিল মার্শাল ডেভিড। রাইফেল বিতরণ শেষ হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ট্রেন থামিয়ে সাপ্লাই ওয়াগন থেকে ইঞ্জিনরুমে চলে এসেছে মার্শাল আর দাগু।

'পৌঁছে গেছি,' খুশির আমেজ মার্শালের গলায়। 'প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা।'

এগিয়ে এল দরজার কাছে দাগুও। ব্রিজটা এখন এক মাইলের চেয়েও কাছে। আদর করে টোকা দিল দাগু উইনচেস্টারটার গায়ে। হাত বুলাতে লাগল সেটায়।

মাঝখানের থামের গোড়ায় টি.এন.টিগুলো ফিট করা শেষ করেছে ইতোমধ্যে রানা। মাথা তুলতেই দেখল, প্রায় পৌঁছে গেছে ট্রেনটা। ইগনিশন অয়্যার দুটো লাগাল ব্যস্ত হাতে। ছুটল তারপর সুইচটার দিকে।

ব্রিজের কাছে রানার ছুটন্ত দেহটা পরিষ্কার দেখতে পেল মার্শাল আর দাগু ফুটপ্লেটের উপর থেকে। পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল ওরা কয়েক সেকেন্ড। তারপর একযোগে দু'জনেই তুলে নিল দুটো রাইফেল।

রানার আশপাশে পড়তে লাগল শিলাবৃষ্টির মত বুলেটগুলো। ছুটন্ত লোকোমোটিভের দোদুল্যমান পাদানি থেকে লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না ওরা, কিন্তু খুব বেশিদূর দিয়েও যাচ্ছে না গুলিগুলো।

ঝাঁপ দিল রানা, অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের আড়ালে।

কর্নেল জ্যাকসন ও রুজভেল্ট রানার কাছ থেকে দুশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন দৃশ্যটা। ওদের সাথেই রয়েছে স্বাতী। ব্রিজের উপর উঠে গেছে ইঞ্জিনের অর্ধেকটা। এখনও ফাটছে না কেন ডিনামাইট?

ইগনিশন সুইচটার কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে শুয়ে আছে রানা। এগোতে পারছে না সুইচটার কাছে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন। ভুলটা খানিক পরই টের পেয়ে গেল জোনাথন। বুঝতে পারল, গুলির ভয়ে সুইচটার কাছে যেতে পারছে না রানা। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে থ্রটলটা পুরো খুলে ব্রেকটা ছেড়ে দিল আবার। দিয়েই বুঝল, আর একটা ভুল করে ফেলেছে।

জোনাথনের পাশ থেকেই গুলি করতে শুরু করেছে আবার দাগু আর ডেভিড। তার মানে, আবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা। কিন্তু বুঝেও কিছু করার নেই এখন আর জোনাথনের। আলোর ঝিলিকটা যখন দেখা গেল ব্রিজ পেরিয়ে এসেছে তখন ইঞ্জিন। তিনটে বগী ব্রিজের উপর। বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথেই লাফ দিল ডেভিড, জোনাথন আর দাগু। শক্ত পাথুরে মাটিতে গড়ান খেতে খেতে নেমে যেতে লাগল দেহগুলো। তিনটে বগীসহ ভেঙে পড়ে গেল ব্রিজটা। সাথে টেনে নিয়ে গেল ইঞ্জিনটাকে। খানিকক্ষণ ধরে কাঠ আর লোহালক্কড় ভাঙার আওয়াজ হতে লাগল। একটানা

পর একটা ফাটতে লাগল সাপ্লাই ওয়াগনের ভিতরের শেলগুলো।

উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা তিনজন টলতে টলতে। তিনটে রাইফেলের নল স্থির করার চেষ্টা করছে ইগনিশন সুইচটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসা রানার উপর।

ডাইভ দিয়ে সরে গেল রানা। থ্যাবড়া একটা পাথরের উপর পড়ল বুকটা। বুকের হাড় ক'খানা গুঁড়ো হয়ে গেল যেন। ব্যথাটা বেশিক্ষণ অনুভব করল না রানা। জ্ঞান হারাল ও। কিন্তু জ্ঞান ফিরে এল দশ সেকেন্ড পরই। চোখ মেলে চাইল। সামনের কিছুই পরিষ্কার হলো না। দু'হাত দিয়ে মাথাটা ঝাঁকাল জোরে জোরে। ধমক দিচ্ছে ও নিজেকে। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে সামনে থেকে ধূসর পর্দাটা।

এগিয়ে আসছে দ্রুত তিনটে রাইফেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল রানা। নির্জীব হয়ে গেল হাতটা, বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে বাইরে। খালি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ফেলে এসেছে ওর পিস্তলটা কমান্ড্যান্টের অফিসে।

মাত্র আড়াই হাত দূরে তিনটে রাইফেল। মার্শালের ব্যান্ডেজ বাঁধা বীভৎস মুখটা ভরে গেছে কুৎসিত হাসিতে। 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে!' ভুরু জোড়া কত রকম বিচিত্র ভঙ্গিতে ওঠানামা, নাচানাচি করছে তার। মার্শালকে ঠিক যেন চেনা চেনা লাগছে না, আগে এ লোককে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না যেন রানা। কিন্তু এর বর্তমান চেহারা দেখে আসল পরিচয় জানতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ওর। সাক্ষাৎ মৃত্যুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুর চেহারা এই রকমই বীভৎস হবার কথা, জানা আছে যেন রানার।

হেরে গেছি! হেরে গেছি! হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল তিনটের নলের দিকে অপলক চোখ রেখে ভাবছে রানা, এত করেও শেষ রক্ষা হলো না। সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়াল ও ধীরে ধীরে। কিছুই ঘটছে না, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছে দ্রুত ঘটে যাচ্ছে কত কিছু ঘটনা। আরও একটা ঘটনা এগুলোর সাথে এক্ষুণি ঘটে যাবে। মরতেই যদি হয়, চেষ্টা করে ঘটনাটা ঘটিয়ে মরাই ভাল।

খট্ করে শব্দ হলো এক যোগে তিনটে রাইফেল কক্ করার। আওয়াজটা বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই মাথা নিচু করে ডাইভ দিল রানা। গর্জে উঠল রাইফেলগুলো এক সাথে।

ছিটকে পড়ল দাগু মাটিতে রানার মাথার গুঁতো পেটে লাগতেই। দাগুর রাইফেলটা পর মুহূর্তে দেখা গেল রানার হাতে শোভা পাচ্ছে। দাগু ধরাশায়ী হতে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব দেখাল মার্শাল আর জোনাথনকে। সেই মূল্যবান মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করল রানা। দু'হাত দিয়ে রাইফেল ধরে বিদ্যুৎবেগে চালাল সেটা। জোনাথনের হাতের রাইফেল পাখি হয়ে উড়ে গেল দূরে। মার্শালের রাইফেলের নল অন্য দিকে ফেরানো।

'সাবধান! তুলো না ওটা!' কঠিন কণ্ঠে বলল রানা। 'ফেলে দাও।' তবু মার্শাল বিদ্যুৎবেগে রাইফেল তুলছে দেখে গুলি করল রানা, কথা শেষ করেই। তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মার্শাল। হাত দুটো দু'পাশে

ঝুলছে। ঝাঁকুনির সাথেই খসে পড়েছে রাইফেলটা হাত থেকে। বুকের গর্তটা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই যেন মার্শালের। বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে বিস্ফারিত দু'চোখ, চেয়ে রইল রানার দিকে ঝাড়া তিন সেকেন্ড। বিশ্রী একটা শব্দ তুলে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসছে বুক থেকে। পড়ে গেল মার্শাল রানার পায়ের কাছে।

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে তখনও জোনাথন। রানার রাইফেলের বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে তার ডান হাতের চারটে আঙুল, তালুর উল্টো দিকের চামড়া মাংস নিয়ে উড়ে গেছে। 'আমাকে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করালে তোমরা, তাই মনে হচ্ছে না?'

কথা বলল না জোনাথন। তাকাল না রানার দিকে ভয়ে। দাগু উঠে দাঁড়িয়েছে টলতে টলতে। হাবাগোবা দেখাচ্ছে তাকে। এদিক ওদিক চাইছে গাধার মত। ছুটে পালানো যায় কিনা ভাবছে সম্ভবত।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন কর্নেল জ্যাকসন ও রুজভেল্ট। স্বাতী সরাসরি চলে এল ওর সামনে। 'কোথায় লেগেছে?'

কর্নেল রুজভেল্ট ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিলেন রানার কাছ থেকে রাইফেলটা। তাক করলেন দাগু আর জোনাথনের দিকে, 'কুইক মার্চ!' গমগম করে উঠল তাঁর গম্ভীর আদেশ।

ঘুরে দাঁড়াল ওরা। স্বাতীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকাতে রানা দেখল রাইফেল তুলে লক্ষ্যস্থির রেখেছেন বৃদ্ধ কর্নেল জোনাথন আর দাগুর পিঠের দিকে। ধীরে ধীরে ফোর্টের দিকে এগোচ্ছে দলটা। অত্যন্ত জাঁদরেল দেখাচ্ছে কর্নেলকে। কাজ দেখাবার সুযোগ পেয়ে বীরদর্পে ফেলছেন পা। হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল কর্নেলের শিরদাঁড়া, রাইফেল থেকে নেমে এল একটা হাত কোমরে, দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। পিছন ফিরে তাকাতে দেখলেন রানা হাসছে ওঁর দিকে চেয়ে। ব্যথায় বিকৃত মুখটা সরল করে তুললেন সাথে সাথে, জলদগম্ভীর স্বরে হাঁক ছাড়লেন, 'খবরদার! আমাকে দেখে হাসবে না! দেখছ না, ওস্তাদের মার কেমন দেখাচ্ছি শেষ রাতে?'

রাইফেল দিয়ে গুঁতো মারলেন তিনি দাগুর পিঠে।

কোন প্রতিক্রিয়া নেই বন্দীদের। মাথায় পরাজয়ের ভারী বোঝা নিয়ে দেহ দুটোকে টেনে নিয়ে চলেছে ওরা দুর্গের দিকে।

ব্রিজের উপর উঠে এল ওরা সবাই ঘণ্টাখানেক পর। কর্নেল রুজভেল্ট ফোর্টে আছেন। রানার সাথে এসেছেন আশরাফ চৌধুরী, কর্নেল জ্যাকসন। স্বাতী তো একদণ্ডও কাছ ছাড়া করেনি রানাকে।

উল্টেপাল্টে পড়ে আছে ভাঙাচোরা বগিগুলো। ধ্বংসস্তূপের উপর বসে আছে তোবড়ানো ইঞ্জিনটা। আশপাশে এতটুকু স্পন্দন নেই। বগিগুলোর ভিতর বেঁচে নেই কেউ।

রুদ্ধ কণ্ঠটাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন কর্নেল জ্যাকসন। বললেন, 'শুধু একজনের কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে আমার, রানা…'

কর্নেলের দিকে ফিরল রানা, 'আপনার বন্ধু...জনসন...জানতেন আপনি ব্যাপারটা?'

'জানতাম না কিছুই,' বললেন কর্নেল জ্যাকসন। 'কিন্তু সব সময় সন্দেহ ছিল আমার। ও-ই কি রিঙ লীডার ছিল?'

'না,' বলল রানা। 'জোনাথন। লোভ আর দুর্বল চরিত্রই খেয়েছে আপনার বন্ধুকে।'

'কিন্তু লোভ মানুষের কি পরিণতি এনে দেয় তা যদি জানত ও।' শুকনো খাঁড়ির দিকে তাকালেন কর্নেল জ্যাকসন। 'তাহলে ওখানে ওভাবে পড়ে থাকতে হত না ওকে।' প্রায় কেঁদে ফেললেন তিনি। 'ওর আত্মার জন্যে প্রার্থনা করব কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন ছিল ও।'

বন্ধুকে প্রবোধ দেয়ার জন্যে কথা বলতে বলতে সরে গেলেন ড. আশরাফ চৌধুরী ব্রিজের কাছ থেকে অন্য দিকে।

'কি হবে এখন, রানা?' খানিকপর চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল স্বাতী, একটা হাত রাখল রানার বুকে। 'এখনও ব্যথাটা কমেনি তোমার?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'তবে না কমাই ভাল, ব্যথাটা থাকলে তবু তো কারও হাতের স্পর্শ পাই!'

ঘুসি তুলল স্বাতী, 'দেখাব মজা?'

কাজের কথা শুরু করল রানা, 'কি হবে জিজ্ঞেস করছিলে, না? কি আর হবে! লোক পাঠিয়ে টেলিগ্রাফের তার রিপেয়ার করাবেন কর্নেল, ব্যস। ডেকে পাঠাব আমরা এক ট্রেন ভর্তি সৈন্য আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের দলকে। ব্রিজটা ঠিক করে ফেলবে ওরা।'

'এখন কি তুমি রিজ সিটিতে ফিরে যাবে?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?' বলল রানা। 'ফিরে যেতে দেরি হবে আমার। ব্রিজ রিপেয়ার হোক, সোনার তালগুলো স্পেশাল ট্রেন এসে নিয়ে যাক ফোর্ট হাম্বোল্ড থেকে, তারপর ফিরে যাবার কথা।'

'ওহ্ হো! সোনা! ভুলেই গিয়েছিলাম!' কেউ আশেপাশে না থাকলেও গলা খাদে নামাল স্বাতী। 'রানা, আমরা কি...মানে, আমাদের কোন লাভ হলো না, না?'

'একেবারে হলো না বলি কি করে? একশো কোটি টাকা কি কম হলো?'

'একশো কোটি টাকা?'

'সোনার দামের বিনিময় মূল্য। বাংলাদেশ সরকারের কাছে চেকটা পৌঁছে যাবে। কি জানো, তোমার বাবা খুঁজে পেলেও সোনাটা তিনি দেশে নিয়ে যেতে পারতেন না আমেরিকা থেকে।'

'টাকাটা আমরা পাচ্ছি কেন তাহলে?'

'উপার্জন করে নিয়েছি আমি বাংলাদেশের তরফ থেকে।'

'বুঝলাম না!'

রানা বলল, 'বহুদিন ধরে রিজ সিটি থেকে ভার্জিনিয়া সিটি পর্যন্ত জঘন্য

সব কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল জোনাথন, ডেভিড, দাগু আর সিম্পসন। এই চতুঃশক্তিকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল এখানকার সরকার। তারা দাগু আর সিম্পসনকে চিনে ফেলেছিল। ধরতেও পারত ইচ্ছা করলে। কিন্তু মাটের গুরু ডেভিড আর জোনাথনকে ঘুণাক্ষরেও চিনতে পারেনি কেউ। রিজ সিটির মার্শাল আর ইউ.এস.সি-র মেজরকে সন্দেহ করতে যাবে কে?'

'কিন্তু তুমি এসবের মধ্যে জড়ালে কিভাবে?'

'ডেভিড আর জোনাথন আগে থেকেই আঁচ করতে পারে, সি.আই.এ লোক পাঠাবে সোনা উদ্ধারের জন্যে। তারা হুঁশিয়ার ছিল। কিন্তু দেশী লোক আসবে, এটাই ভেবেছিল তারা। সি.আই.এ-র ডিপার্টমেন্টাল চীফ উইলিয়াম ভয়ঙ্কর ঘুঘু লোক, দেশী মানুষ না পাঠিয়ে বিদেশী কাউকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে শত্রু পক্ষ তাকে দেখামাত্র সন্দেহ করতে না পারে। বিদেশী লোক—কাকে বেছে নেয়া যায়? মাসুদ রানাকে।'

'কেন?'

'বাংলাদেশী একজনের অবদান রয়েছে সোনার খনি আবিষ্কারে, এক। দুই, আমি এর আগেও এদের একাধিক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। তিন, ঠিক উপযুক্ত সময়ে ছুটি কাটাচ্ছিলাম আমি এদেশে।'

'বুঝেছি। তারপর?'

'তারপর আর কি, দলটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে বা ধ্বংস করে দিতে পারলে সোনার তাল উদ্ধার হবে, বাংলাদেশ পাবে সমুদয় সোনার ন্যায্য অংশ। এই শর্তে প্রস্তাব দেয়া হয় আমার বসকে। এমনিতেই সোনা খুঁজে বের করেছেন যে চারজন তার মধ্যে একজন বাংলাদেশী। তোমার বাবা। এক চতুর্থাংশ পাওনা হয় ওঁর। কথা হয়েছে, অতিরিক্ত এক কোটি টাকা জমা করে দেবে আমেরিকা সরকার তোমার বাবার একাউন্টে।'

চুপ করে রইল স্বাতী। সোনা বা টাকার কথা ভাবছে না ও। বলল, 'কিন্তু ব্রিজটা শেষ হতে কতদিন লাগবে? সময় লাগবে অনেক, না?'

'লাগুক।'

উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল স্বাতীর মুখ, 'মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক শীত পড়বে এবার।'

মুচকি হাসল রানা, 'পড়ুক।'

'আচ্ছা রানা, রিজ সিটি থেকে ফিরে যাবে না তুমি বাংলাদেশে?'

'ঠিক নেই,' বলল রানা। 'ইতিমধ্যে আর কোথাও যদি বিপদে জড়িয়ে না পড়ি।'

'বিপদ?'

'বিপদকে নিয়েই আমার কাজ, কাজ মানেই বিপদ।'

'যদি দেশে ফেরো, ফিরবেই তো একসময়, দেখা হবে তোমার সাথে?'

'না। নিয়ম নেই।'

দপ করে নিভে গেল স্বাতীর উজ্জ্বল হাসি।

খানিক চুপ করে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে আবার হাসি ফুটল ওর

ঠোঁটে।

'এ একদিক থেকে ভালই হলো, রানা। চলার পথে হঠাৎ পরিচয়, বিদায় নিলেই শেষ। পিছু টান নেই কোন। দাবি নেই। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও...'

হাত পাতল রানা।

'দাও।'

এপাশ-ওপাশ চাইল স্বাতী। সরে এল রানার বুকের কাছে। মুখটা তুলল উপরে। সামান্য একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে ঠোঁট দুটো। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র এক টুকরো হাসি।

* * *